রাধার চোখে আগুন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বড়দি শ্রীমতী নীহারকণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

রক্ত আগুন প্রেম ✓

সাবরমতী

সংসার

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি

রাগশর

স্বনির্বাচিত গল্প

মুখোমুখি

কুমারী মাতা

পাশের বাড়ির দোতলার বাসিন্দাটির জন্য মন খারাপ হয়ে গেল। এ-দিনের বাড়িঅলা এমন চট করে ভাড়াটে তুলতে পারে এ বড় দেখা যায় না। আজ সাত আট বছর পাশাপাশি আছি। খুব একটা হৃদ্যতা না থাক মোটামুটি সদ্ভাব ছিল। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেই ভাবসাব বেশি ছিল, পাশাপাশি বারান্দায় বা রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা হলে সবিনয়ে কুশল প্রশ্ন করতেন। তেমন দরকার হলে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে পরামর্শও নিতে আসতেন।

কোর্ট-কাচারি নয়, তিন মাসের মৌখিক নোটিসে এমন দোতলা-খানা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন শুনে অবাকই হয়েছিলাম। সামাজিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণে এই দোতলার ফ্ল্যাটে এক-আধবার গেছি। মস্ত বড় দুখানা শোবার ঘর, অ্যাটাচড্ বাথ, সামনে বড়সড় ডাইনিং কাম সিটিং স্পেস। সংসার একটু বড় হবার দরুন হোক বা কিছুটা রুচির অভাবের কারণে হোক শেষেরটার মালপত্র বোঝাই গুদামঘরের হাল। সুন্দর বড়সড় কিচেন কাম স্টোর রুমেরও একই দৃশ্য। এক কথায় ভদ্রলোকের প্রয়োজন অনুযায়ী দোতলার এই পরিসরটুকু আদৌ যথেষ্ট ছিল না।

তবু ভদ্রলোক বেশ সুখেই বসবাস করছিলেন। নিজেই আফসোস করে বলেছিলেন, জলের দরের ভাড়ায় এখানে ছিলেন, তিন মাইল দূরে এর চারগুণ ভাড়ায় যে ফ্ল্যাটে যাচ্ছেন সেটা আরো ছোট তো বটেই, এই ফ্ল্যাটের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না।

আমার স্বাভাবিক প্রশ্ন তাহলে তিনি এত সহজে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে যেতে রাজি হলেন কেন?

কারণ যা শুনলাম সেটুকু একেবারে পাশের 'পড়শী হিসেবে আমারও খুব বাঞ্ছিত মনে হল না। এ বাড়ি যাঁর তিনি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার র‍্যাঙ্কের লোক। জাঁদরেল অফিসার এবং রাশভারী মানুষ। সদ্য রিটায়ার করেছেন। তিন মাসের মধ্যে সরকারি ফ্ল্যাট

ছেড়ে দিতে হবে। অতএব রিটায়ারমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁর ভাড়াটেকে নোটিস দিয়েছেন তিন মাসের মধ্যে দোতলার এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে। ভদ্রলোক ওই পুলিশ অফিসারের বোনের দেওর, সেই সুবাদেই এত সস্তায় এই ফ্ল্যাটখানা সহজে পেয়ে গেছলেন তিনি। এত বছর ধরে আছেন, এক পয়সা ভাড়া বাড়ানোর তাগিদও কখনো আসেনি। একেবারে এই বাড়ি ছাড়ার নোটিস। ভদ্রলোকের বউদি অর্থাৎ পুলিশ অফিসারের সেই বোনও আর বেঁচে নেই যে তাঁর শরণাপন্ন হবেন। অতএব বাড়ির মালিকের কাছেই ছুটে গেছিলেন। একটাই আরজি, দু'বছর আগে একতলায় যে মাদ্রাজী ভাড়াটে এসেছেন তাঁকে তোলা হোক, একতলার এখন যা ভাড়া তিনি তাই দেবেন এবং একতলার ফ্ল্যাটে নেমে যাবেন।

বাড়ির পুলিশ অফিসার মালিক এটুকু শুনেই নাকি বিরক্ত, বলেছেন, সেটা করতে হলে কেসের ব্যাপারে দাঁড়াবে, তাছাড়া এক-তলার ফ্ল্যাটে স্বামী-স্ত্রী দুজনের মাত্র ফ্যামিলি, তিনি নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চান—ওই ফ্যামিলি চলে গেলে একতলাও আর ভাড়া দেবেন না। অনুনয়ের জবাবে তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, আমার দরকারে ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবে এই কড়ারে তুমি ঢুকেছিলে, এখন সেই মতো ব্যবস্থা করো।

একে আত্মীয়, আর এই রকম কথাই হয়েছিল বটে। অনেকে ফ্ল্যাট আঁকড়ে থাকতে পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু ভদ্রলোক আর ঝামেলার মধ্যে যেতে চান না। সদ্য রিটায়ারড্ জাঁদরেল পুলিশ অফিসার, তাঁর প্রতিপত্তি কম হবার কথা নয়। ফ্ল্যাট ছেড়েই দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর ক্ষোভটুকু স্পষ্ট। বলেছেন তাঁর দোতলার দখল চাই, আর আমাকে একতলাটা দেবেন না, এটাই কথা—তাঁর তো দোতলায় ওঠার সিঁড়িও আলাদা, আমার বড় ফ্যামিলিতে তাঁর কি অসুবিধে হত বলুন তো? তাছাড়া নিজের বউ নেই, এক ছেলে তার বউ নিয়ে কোম্পানির দেওয়া ফ্ল্যাটে থাকে, আর এক মেয়ে, তারও বড় ঘরে বিয়ে হয়ে গেছে, দুজনেই তারা বাপকে মাথায় করে রাখার জন্য তৈরি

তবু আমাকে উচ্ছেদ করে তাঁর এখানেই এসে ওঠা চাই—থাকার মধ্যে সঙ্গে থাকবে পুরনো একজন কমবাইনড্ হ্যাণ্ড আর বড়জোর একটা চাকর।

ভদ্রলোকের এই ক্ষোভ আমার মনে অবশ্য দাগ কাটেনি। রাশ-ভারী মানুষ, নিজের সঙ্গতি থাকলে অবসর নিয়েই ছেলে বা মেয়ের আশ্রিত হতে যাবেন কেন? ঘরে স্ত্রী না থাকার অভাবটা কত বড় এ-ও তাঁরই সমস্যা। কি লোক কেমন লোক কিছুই জানি না, পাশাপাশি দু-বাড়ির দোতলার দুই সামনের বারান্দার মধ্যে বড়জোর সাত গজ ফারাক। দু-বাড়ির মহিলারা তো যে যার বারান্দায় দাঁড়িয়েই কথাবার্তা চালান। সকালে বিকেলে এই সামনের বারান্দায় আমার অনেকক্ষণ পায়চারি করা অভ্যেস। লাগোয়া বারান্দায় চলতে ফিরতে একজন দাপটের রিটায়ারড্ পুলিশ অফিসারের মুখ দেখতে হবে এটা পছন্দ না হওয়া নিজেরই মনের প্রসারতার অভাব হয়তো। আমাদের দেশের পুলিশদের আপনার জন ভাবাটা নীতির কথা আর কেতাবি কথা। কিন্তু কতজনে তা ভাবেন সে প্রসঙ্গ থাক।

একজন বড় ফ্যামিলি নিয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেলেন দেখলাম। আর একজনের আসার তোড়জোড়ও দেখছি। দোতলার ফ্ল্যাটের সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গেছে। মনে হল ভাড়াটে কনট্রাক্টর আর মিস্ত্রীই যা করার করছে। মাঝে মাঝে গাড়ি হাঁকিয়ে দু'জোড়া অল্প-বয়সী দম্পতীকে তদারকে আসতে দেখি। মনে হয় তারা রিটায়ারড্ পুলিশ অফিসারের ছেলে-ছেলের বউ আর মেয়ে-জামাই হবে। আর একটি মাঝবয়সী লোককেও দেখি মাঝে মাঝে। সে ঠিক চাকর পর্যায়ের না, আবার ঠিক বাবু-মানুষও না। দুইয়ের মাঝামাঝি গোছের একজন।

সংস্কার কেবল দোতলার ফ্ল্যাটেরই হল। আর রং যখন হল গোটা বাড়িটাতেই রঙের পালিশ পড়বে জানা কথা।

প্রথমে একটা লরি এলো, তাতে মালপত্র খুব বেশি নয়। চকচকে বড় খাটের খোলা পার্টস, জাজিম তোষক বালিশ ইত্যাদি, ফ্রিজ,

সুন্দর সোফাসেট, টিভি সেট, কাচ বসানো স্টিলের আলমারি, ড্রেসিং টেবিল আলনা খোলা ডাইনিং টেবিল কাটলারি ইত্যাদি। আমার ধারণা এর আটগুণ মাল অন্তত ওই দোতলা থেকে বেরিয়েছে, আর সে মাল একটা লরিতে কুলোয়নি. এই মাল দেখে অন্তত মনে হল যিনি আসছেন তিনি ছিমছাম থাকতে ভালবাসেন। গৃহিণীশূন্য সংসারে এটাই স্বাভাবিক। লরিতে মালের সঙ্গে এলো সেই মাঝবয়সী না-বাবু না-চাকর গোছের লোকটি।

সেটা ছিল এক শুক্রবারের সকাল ভাবলাম দুপুর বা বিকেলের মধ্যে বাড়ির মালিকের শুভাগমন হবে। কিন্তু রাতের মধ্যেও তাঁকে বা অন্য কোনো লোককে দোতলার ফ্ল্যাটে দেখা গেল না।

পরদিন শনিবার। সপ্তাহের এই দিনটিতে বাঙালিকে গৃহপ্রবেশ বা বাড়ি-বদল করতে কমই দেখা যায়। সকাল আটটা নাগাদ আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। পর পর তিনখানা গাড়ি পাশের বাড়ির ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ালো। তার মধ্যে সামনের আর পিছনের চকচকে ফিয়েট গাড়ি দুটো আমার আগেই দেখা। সেলফ্ড্রিভ্ন্, পাশে যার-যার স্ত্রী—যাদের এক-জোড়া মেয়ে-জামাই অন্য জোড়া ছেলে-ছেলের বউ হবে বলে বিশ্বাস। মাঝের ডাভ্-গ্রেরঙের চকচকে অ্যামবাসাডারখানাও সেলফ্ড্রিভ্ন্ চালকের আসন থেকে যিনি নামলেন সকলেরই অনুমান তিনিই ছোট্ট এই নতুন রং-পালিশ করা বাড়ির মালিক হবেন। সকলের অনুমান বলতে আশপাশের প্রত্যেক বাড়িরই একতলা দোতলায় দুই একজন করে নবাগত পড়শীর মুখখানা দেখার আগ্রহে দাঁড়িয়ে গেছল। পাড়ার সকলের সঙ্গেই সকলের মৌখিক ভাব-সাব, তার মধ্যে রিটায়ার করলেও পদস্থ পুলিশ অফিসারের ছাপ থাকায় এই একজন পাড়াগোত্রীয় হবেন না, সকলেরই হয়তো এই ধারণা। তাই প্রথম দর্শনে চোখে মেপে নেওয়ার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন, পাশে সেই না-বাবু না-চাকর মানুষটি।

ভদ্রলোক সৌম্যদর্শন এবং ভারিক্কি চালের মানুষই বটে।

পাকা হাতে ফুটপাথ-ঘেঁষে গাড়ি থামিয়ে নামলেন। পরনে পাট-ভাঙা সাদা পা-জামা, গায়ে নেটের গেঞ্জির ওপর দুধ-সাদা ফিনফিনে বুক-খোলা পাঞ্জাবি, বোতামের জায়গায় সোনার চেনে আটকানো সোনার বোতাম, ডান হাতের এক আঙুলে বড়সড় একটা হীরের আঙটিই হবে, অন্য হাতের রিস্টওয়াচ আর ব্যাণ্ড দুইই স্টেনলেস স্টিলের। পায়ে হরিণের চামড়ার শৌখিন চপ্পল। গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা, পরিমিত লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। চুল ছোট করে ছাঁটলে ব্যক্তিত্বের ছাপ বাড়ে এমন একটা ধারণা পুলিশ অফিসারদের আছে কিনা জানি না। তবে এঁকে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক দেখাচ্ছে সন্দেহ নেই।

গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট চোখে নিজের বাড়ি-খানা দেখলেন। ততক্ষণে সামনে-পিছনে দুই ফিয়াটের দু-জোড়া দম্পতীও তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের দেখামাত্র কোন্ জোড়া ছেলে-ছেলের বউ আর কোন্ জোড়া মেয়ে-জামাই সেটা এক-নজরেই বোঝা গেল। ভাইবোনের মুখের আদল বাপের সঙ্গে মেলে। ভদ্রলোক প্রসন্ন মুখেই ফ্ল্যাট বা বাড়ি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করলেন বোধহয়, কারণ বাকি চারজনকেই হৃষ্টমুখে মাথা নাড়তে দেখা গেল। নিজের বাড়ি পর্যবেক্ষণের পর ভদ্রলোক পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে চাক্ষুষ বিবেচনার আশাতেই সম্ভবত একবার চারদিকে ঘুরে দেখলেন। আমার সঙ্গে এবং অনেকের সঙ্গেই চোখাচোখি হল বটে, কিন্তু সেটা বিচ্ছিন্ন-ভাবে কারো সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়।

গ্যারাজের পাশের সিঁড়ি ধরে একে একে সকলে চোখের আড়াল হলেন। সকলের কি ধারণা হল সেটা একজনের অভিব্যক্তি থেকেই আঁচ করা যেতে পারে। রাস্তার উল্টো দিকে আমার মুখোমুখি বাড়ির দোতলার সমবয়সী ভদ্রলোকটি ব্যঙ্গোচ্ছল মুখে দুদিকে দুই বাহু প্রসারিত করলেন। অর্থাৎ নাগালের বাইরে একজন মস্ত মানুষ এলেন। গাড়ি তিনটেই হয়তো এ-রকম মূল্যায়নের কারণ। নিজের গাড়ি, ছেলের গাড়ি আবার মেয়ের গাড়ি। পুলিশ

অফিসারের এমন সৌভাগ্য সকলে সাদা চোখে দেখে না। আমার কেবল মনে হল একজন অভিজাত পুরুষ একেবারে কাঁধ-ঘেঁষে কায়েম হয়ে বসলেন। তা বসুন। আমার আর কি যায় আসে। আগের বাসিন্দাকে নিয়েও আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না, এঁর বেলায় হয়তো সেটুকু আরো কমবে।

দিন-পনেরো যেতে এটুকু বোঝা গেল নবাগত পড়শীটি যতই রাশভারী পুলিশ অফিসার হয়ে থাকুন, নিজেকে খুব জাহির করার লোক নন। লোকজনের আনা-গোনা নেই বললেই চলে। সন্ধ্যার দিকে কেবল তু'জোড়া মুখই আসতে যেতে দেখি। মেয়ে-জামাই আর ছেলে-ছেলের বউ। না-বাবু না-চাকর লোকটি কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড। তাকে হাট-বাজার করতে দেখি, আবার গাড়ি চালাতেও দেখি। কোথাও যাবার দরকার না থাকলেও রোজই সে-গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে, স্টার্ট দেয়, তু-চার মিনিট চালিয়ে আবার গ্যারাজ করে। একটা অল্পবয়সী চাকর আছে, বাড়ির কাজের সঙ্গে গাড়ি ধোয়া-মোছাও তার ডিউটির মধ্যে পড়ে হয়তো। কিন্তু তাদের প্রভু অর্থাৎ আমার কাঁধ-ছোঁয়া পড়শীটির অস্তিত্ব প্রায় চক্ষু-কর্ণের অগোচর।

গত পনেরো দিনের মধ্যে বড় জোর পাঁচ-সাতবার তাঁকে বারান্দায় দেখেছি। তুই-একবার হাঁটেন, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে খানিক রাস্তা দেখেন, ভিতরে চলে যান। ইদানীং আমিও সকালে বেরুতে পারছি না। শারীরিক অসুস্থতাই বড় কারণ, তার ওপর লেখার চাপ। সকালে বিকেলে বারান্দাতেই খানিক পায়চারি করি। তখন চোখাচোখি হয়। তিনিও নিস্পৃহ, আমিও। খবরের কাগজ এলে বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারে বসেই অনেকক্ষণ ধরে পড়েন। তখন মুখ দেখা যায় না। দিন সাত-আট বাদে একদিনই কেবল তু-চারটে কথা হয়েছিল। সকালে তিনি তাঁর ছোট্ট বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। আমার দোতলার বারান্দা তাঁর ডবল হবে। নিজের অগোচরে আমি হয়তো একটু জোরেই হাঁটছিলাম। একবার তুই বারান্দা-প্রান্তে মুখোমুখি হতে মৃদু হেসে পরিচিত জনের মতোই বললেন, আপনি তো ভালই

মর্নিংওয়াক সেরে নিচ্ছেন দেখছি—

গলা সেই প্রথম শুনলাম। বেশ ভারী পুষ্ট কণ্ঠস্বর। আমি সৌজন্যের দায়ে একটু হেসে দাঁড়িয়ে গেলাম।

—লেক তো কাছেই, লেকে যান না কেন ?

সবিনয়ে জবাব দিলাম সেটাই অভ্যাস, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না তাই বাদ পড়ছে।

বললেন, আমারও সেই অবস্থা, এখানে আসার আগেই ছকে রেখেছিলাম রোজ সকালে লেকে হাঁটব, আসতে না আসতে কি-রকম একটা গলার ট্রাবল্ শুরু হয়ে গেল।

ব্যস আর কোনো কথা নয়, তাঁর কাগজ এলো, সেটা নিয়ে তিনি ইজিচেয়ারে বসে গেলেন।

এ-ধরনের আলাপের মধ্যেও একটু আভিজাত্যের গন্ধ পেলাম। কোনো কারণ নেই, তবু মনে হল দু-হাত কপালে তোলার প্রাথমিক সৌজন্যও বাতিল করে তিনি যেন দুটো কথা বলে আমাকে একটু অনুগ্রহ করলেন।

এ-রকম ভাবার একটু কারণও ছিল। রাস্তার উল্টোদিকে মুখো-মুখি বাড়ির সমবয়সী ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে গল্প করতে আসেন। নিন্দে না করেও বলা যায় বয়েস অনুযায়ী ভদ্রলোক একটু বেশি রসিক এবং প্রতুলভাষী। নাম অমর গাঙ্গুলী, কাজের সময় এসে বসলে তাঁকে বিদায় করতে বেগ পেতে হয়। দিন তিনেক আগে এসেই তিনি জিগ্যেস করেছিলেন, কি মশাই জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের ঘর থেকে সন্ধ্যার পর বেশ হুইস্কির গন্ধটন্ধ পাচ্ছেন তো ?

—না তো—কেন ?

—সে কি মশাই, সকালেই চলে আর রাতে চলে না ? লেখক হয়েও আপনি এমন বে-রসিক !

তারপরেই এ উচ্ছলতার কারণ ব্যক্ত করলেন। রাস্তার কোণের দত্ত বাড়ির কন্ট্রাক্টর দত্ত সাহেব দুদিন আগে সকাল দশটায় কর্তব্যের খাতিরে নতুন পড়শীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে এসেছিলেন

(আমরা জানি বিনা স্বার্থে এটুকু তিনি করেন না), তা আপনার নতুন নেকসট ডোর নেবার ঘোষ সাহেব (ঘোষ যে এই প্রথম শুনলাম) তখন গরম জলে ব্রাণ্ডি মিশিয়ে সিপ করছিলেন, দত্ত সাহেবকে জানালেন গলার ট্রাবলের জন্য খাচ্ছেন, আর এ-ও জানিয়ে দিলেন বেশি কথা বলা ডাক্তারের বারণ। সাদা কথায় দু-পাঁচ কথার পরেই বিদায় করলেন, বুঝতে পারছেন ?

বুঝেও আমি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিনি বা কথা বাড়াইনি।

এই কারণেই হয়তো ঘোষ সাহেবের ও-ভাবে যেচে কথা বলার মধ্যে আমি অনুগ্রহের আভাস আবিষ্কার করেছিলাম।

কিন্তু পরের সন্ধ্যায় একটা ব্যাপার দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। আমি সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। নিজেব বারান্দায় ঘোষ সাহেবও। আমাদের ঠাকুর ঘরে নারায়ণের সন্ধ্যারতি শুরু হল। শঙ্খ কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। এটা নৈমিত্তিক ব্যাপার ও-বারান্দায় ঘোষ সাহেবের মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু রাস্তাব আলোয তাঁর অবয়ব ঠিকই দেখা যাচ্ছে। দেখলাম তাঁর হাত দুটি যুক্ত হয়ে কপালে উঠল। তারপর যতক্ষণ এদিকে শয়ন আরতি চলল, (কম করে সাত আট মিনিট হবে) ততক্ষণ ওই দুই হাত কপালে যুক্ত হয়েই রইলো।

অভ্যাসে হাত আমাদেরও কপালে ওঠে, সেটা পাঁচ-সাত সেকেণ্ডের জন্য। এতক্ষণ ধরে এই নিবিষ্ট প্রণাম বা শরণ দেখব এ আমার কাছে কেন যেন প্রত্যাশিত ছিল না। বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন বলেই এই প্রণাম দেখে যা প্রথমে মনে এলো সেটাকে সুস্থ চিন্তা বলা যাবে না। সে কথা থাক।

সন্ধ্যা থেকে রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বেশির ভাগ সময় আমার এই সামনের বারান্দায় বসে বা পায়চারি করে কাটে। ভক্তির ব্যাপারটা আরো দুই-একদিন লক্ষ্য করলাম। ও-সময়ে সব-দিন অবশ্য ভদ্রলোক বারান্দায় থাকেন না। সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি রেলিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে। ফুটপাথ ঘেঁষে ঘোষ সাহেবের অ্যামবাসাডার গাড়িটা থামলো। না-বাবু না-চাকর লোকটি চালকের আসনে।

সে নেমে এসে পিছনের দরজা খুলে দিতে আটপৌরে বেশ-বাসের একটি রমণী গাড়ি থেকে নামল। খুবই সাধারণ বেশ। গায়ে কোনো গয়না নেই। মাথায় ছোট ঘোমটা। সন্ধ্যায় না হোক দিনের আলোয় বেশ টান ধরেছে। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি নেই ঠাওর হল না। পায়ে রাবারের চপ্পল। গাড়ি থেকে না নামলে বাড়ির কাজ-করা ভদ্রগোছের মেয়েও ভাবা যেত। যতটুকু নজরে এলো, কালোর ওপর বেশ সুশ্রী আর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী মনে হল। লম্বা গড়ন। বয়েস বছর আঠাশ-তিরিশ হতে পারে।

দিন কুড়ির মধ্যে মেয়ে আর পুত্রবধূকে অনেক বারই দেখেছি। একে আর কোনদিন দেখিনি।

সামনে তাকিয়ে দেখি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অমর গাঙ্গুলীও ঝুঁকে আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করছেন। রমণীটি চোখের আড়াল হতে আমার সঙ্গে চোখাচোখি। মাথা ওপর দিকে উঁচিয়ে ইশারায় যে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, তার একটাই অর্থ, কে হতে পারে?

ঠোঁট উল্টে ভিতরে চলে এলাম। এ ধরনের কৌতূহল কারোরই ভালো লাগার কথা নয়। আত্মীয় পরিজন কেউ হতে পারে, ছেলে বা মেয়ের বাড়ির কেউ হতে পারে। এমন কি সদ্য নিযুক্ত কোনো রাঁধুনী-টাঁধুনি হতে পারে যে বাড়ি চেনে না বলে গাড়ি করে নিয়ে আসা হল।

আধ-ঘণ্টাখানেক বাদে মনে হল ওই দোতলার ফ্ল্যাট থেকে গানের গলা কানে আসছে। পায়ে পায়ে কোণের ঘরের জানলায় এসে দাঁড়ালাম। সামনের ঘর নয়। রাস্তার দিকের ঘর থেকেই গান ভেসে আসছে। মেয়ের গলা যখন, যে খানিক আগে এলো সে ছাড়া আর কে হতে পারে। বাজনা-টাজনা নেই, খালি গলার গান। গানের কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না, তবে গলা চড়লে ভক্তিমূলকই মনে হচ্ছে। দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার মতো খুব উঁচুদরেরও মনে হল না আমার। তবে গলাটি বেশ নিটোল মিষ্টি। ভাবের আবেগও একটু-আধটু আঁচ করা যাচ্ছিল।

ঠায় দাঁড়িয়ে শুনিনি, খান তিন-চার গান হল বোধহয়। মাঝে মাঝে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াচ্ছিলাম। ভদ্রলোকের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, গ্যারাজ করা হয়নি। গান শেষ হবার পনেরো বিশ মিনিট বাদে মেয়েটিকে আবার গাড়িতে এসে উঠতে দেখলাম। ভদ্রলোক তখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

এবারে আমার কৌতূহল একেবারে হয়নি বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু সেটা অস্বাস্থ্যকর বা অশোভন কিছু নয়। কৌতূহল একটু ভদ্রলোকটিকে নিয়েই। ওই ফ্ল্যাটের আগের বাসিন্দাটি বলে গেছলেন, যিনি আসছেন তিনি রাশভারী মানুষ, জাঁদরেল পুলিশ অফিসার ছিলেন, নিরিবিলি-নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চান বলেই দূর সম্পর্কের বড় সংসারের আত্মীয়টির নিচের তলাতেও ঠাঁই হয়নি। সবই মিলছে।—সকালে গরম জলের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি চলে, পাড়ার কেউ সৌজন্যের আলাপ করতে এলে তু'কথায় তাকে বিদায় করে দেওয়া হয়—আবার রাতে এ-বাড়িতে যতক্ষণ ঠাকুরের শয়ন আরতি চলে ততক্ষণ ভদ্রলোকের প্রণামের জোড়হাত কপাল থেকে নেমে আসে না, একলা বাড়িতে এই বয়সের একটা মেয়ে এসে তাঁকে গান (যদিও ভক্তিমূলক) শুনিয়ে যায়, তাকে গাড়ি করে নিয়ে আসা হয়, পৌঁছে দেওয়া হয়—এরকম মানুষ সম্পর্কে লেখকের কৌতূহল তার পেশার অঙ্গ।

আরো দিন তিন-চার বাদে অন্তরঙ্গ আলাপের অভিনব সূত্রপাত ঘটল। দোতলার কোণের ঘরে বসে আমি লিখি। সামনের দরজার পর্দা তখন তোলাই থাকে। কারণ লিখতে লিখতে মুখ তুললে আকাশের অনেকটা দেখা যায়। সেটা ভালো লাগে। আবার ও-দিকে ফালি বারান্দার এ-মাথায় কেউ এসে দাঁড়ালে এ-ঘর তখন বে-আবরু। ঘরের সবটাই দেখা যায়। কিন্তু সে-রকম ইচ্ছে না থাকলে কেউ আর ওখানে এসে দাঁড়াবে কেন? তাই আমার লেখার ব্যাঘাত বড় একটা ঘটে না। সেদিন নিবিষ্ট মনেই লিখছিলাম। হঠাৎ মুখ তুলে দেখি ও-দিকের রাশভারি পুলিশ অফিসারটি তাঁর

বারান্দার কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এই ঘরের দিকেই চেয়ে আছেন। চোখাচোখি হতে সামান্য অপ্রস্তুত। হাসি-হাসি মুখ করে ডান হাত তুলে সামনের দিকে একটু নাড়লেন, অর্থাৎ, ডিসটার্ব করে ফেললাম, বসুন বসুন, উঠতে হবে না। তাড়াতাড়ি সরে গেলেন।

কলম রেখে আমি উঠতেই যাচ্ছিলাম বটে।

সেই সন্ধ্যার খানিক আগে আমি বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই উনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন। মনে হল আমার দেখা পাওয়ার অপেক্ষাতেই ছিলেন। আমিও এগোলাম।

—ফ্রি আছেন? একটু আসব?

ব্যস্ত হয়ে বললাম, আসুন আসুন—

—আপনি হার্ট পেশেণ্ট শুনেছি, আপনি নিচে না নেমে আমি ওপরে উঠলে অসুবিধে হবে না তো?

—কিছু না, আসুন।

আমি সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালাম। প্রায় এক মাস বাদে এই আলাপের আগ্রহ, আবার আমি হার্ট পেশেণ্ট এ-ও শুনেছেন।

নিচে পায়ের শব্দ শুনে আমি দু-ধাপ নেমে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম, আসুন—

বেশ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উঠে আসতে আসতে বললেন, একটু বাদেই হয়তো লিখতে বসবেন, এসে ডিসটার্ব করলাম না তো?

হেসে বললাম, খুব চাপ না থাকলে রাতে আমি লিখি না—কিন্তু আমি লিখি, আমি হার্ট পেশেণ্ট, এসব খবর আপনাকে কানে কে দিলে?

আমার লেখার ঘরে তাঁকে এনে বসালাম। একটু জোরেই হেসে তিনি আমার কথার জবাব দিলেন, আরে মশাই আর বলবেন না, আপনার জন্য কাল রাতে আমার মেয়ে আর বউমার কাছে বে-ইজ্জত হয়ে গেছি! আমি হলাম গিয়ে চোর-ডাকাত ঠেঙানো আর মিনিস্টার সেক্রেটারি ওপরওয়ালাকে তেল-দেওয়া পুলিশ—আমার নাকের ডগায় কে গুণী লোক বাস করছেন না করছেন পরিচয় জানলেও তাঁর

মর্ম বুঝব কি করে বলুন তো? গত রাতে মেয়ে হুকুম করে গেছে, তুমি কালই অবশ্য গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করবে, পরে আমরাও যাব।

ভদ্রলোকের মধ্যে নিজের অপরাধ স্বীকার আর স্তুতি-বচনের সহজ সরলতাটুকু ভালো লাগল। হেসে বললাম, আপনি সত্যিকারের ব্যস্ত মানুষ, আমার মতো লেখক চেনার প্রত্যাশা নিজেরও নেই—আপনার বে-ইজ্জত হবার কোনো কারণ নেই, কিন্তু আপনার মেয়ে আমার ইজ্জত প্রাপ্য থেকেও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে আর আপনার বউমাকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

মুখখানা একটু গম্ভীর করে মাথা নাড়লেন।—উঁহু, এতগুলো ভালো-ভালো কথা তো আমার মনে থাকবে না।

এরপর হাসিমুখে যেটুকু সমাচার শোনালেন তার সার, এর মধ্যে সামনের দোতলার অমর গাঙ্গুলী আর তাঁর পাশের বাড়ির একতলা দোতলার দুই ভদ্রলোক একসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেছলেন। কথায় কথায় পড়শীদের প্রসঙ্গ উঠেছে, আমার নাম পরিচয় আর হার্টের কথাও অমর গাঙ্গুলী বলেছেন। তিনি শুনে গেছেন এই পর্যন্ত, কারো সম্পর্কেই তেমন আগ্রহ ছিল না। গেল রাতে মেয়ে-জামাই আর ছেলে-ছেলের বউ এসেছিল। কথায় কথায় মেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল পাশের বাড়িতে কে থাকে। জবাবে তিনি বলেছিলেন ওমুক নামের একজন লেখক থাকে শুনেছি। শুনেই তারা যেমন অবাক তেমনি খুশি। তারপর মেয়ের ওই অনুযোগ, চোর-ডাকাত আর ওপরওয়ালা ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকে তুমি চিনলেই না। ওদের হুকুম কালকের মধ্যে এসে যেন আলাপ করে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নেন।

লজ্জা পাচ্ছিলাম। কিন্তু ভালও লাগছিল। লেখক মানেই এ-ধরনের পুরস্কারের আশা তার রক্তের মধ্যে। এরপর নিজের পরিচয় দিলেন। এবং আমার প্রশ্নে প্রশ্নে সেটুকু বিস্তৃত হল। নাম অংশুমান ঘোষ, তাঁর বাবা দিল্লি পুলিশের বড় চাকুরে ছিলেন, একমাত্র ছেলেকে

আই-পি-এস পরীক্ষায় বসিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষার জোরে তিনি লাস্ট হয়েছিলেন কি দুই একজনের আগে ছিলেন সেটা জানা যায়নি। নিজের শরীর স্বাস্থ্যের গুণে কনস্টেবলের চাকরি একটা হতে পারত, বাবার সুপারিশের জোরে কলকাতায়পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে চাকরি জীবন শুরু। তাঁর পিতৃদেবের বিবেচনায় পুলিশের চাকরিই সর্বোত্তম, পরে সুযোগ সুবিধে মতো ছেলেকে দিল্লিতে টেনে নিতে পারবেন এমন আশা হয়তো মনে ছিল। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। তাঁর ওপরে তিনটি বোন। বাবা তাঁদের প্রত্যেককে বেশ বড় ঘরে বিয়ে দিতে পেরে নিশ্চিন্ত। তাঁর একমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল এই অপদার্থ ছেলের জন্য। অতএব তাঁর এই বাড়ি আর সঞ্চিত বিত্তের বেশির ভাগই ছেলের ভাগ্যে এসেছে। শেষবয়সে বাবার কলকাতায় এসে বসবাসের ইচ্ছে ছিল বলেই এই বাড়ি। কিন্তু কেবল গৃহ-প্রবেশই করেছিলেন, বাস করার সময় মেলেনি। ছেলের চাকরির সময় বাড়িটা বারো না চৌদ্দ বছরের লিজ দেওয়া ছিল। লিজ খালাস হবার পরেও এখানে বাসের সুযোগ হয়নি, কারণ তখন বেশির ভাগ সময়ই তিনি বাইরে পোস্টেড। মাঝ-বয়েস পর্যন্ত তো ও-সি' গিরিই করেছেন, কোয়ার্টার্স-এ থেকেছেন। তারপর তাঁকে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে টেনে নেওয়া হয়েছিল, যখন যেখানে ছিলেন ভালো আস্তানাই জুটেছে। শেষের বছর দুই-আড়াই আরো একটু উচ্চ-পদস্থ হতে পেরেছিলেন, রিটায়ারমেণ্টের পরে তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের ভাড়াটেকে বুকে দাগা দিয়ে এই ফ্ল্যাট থেকে তুলে নিজে এই প্রথম পৈতৃক বাড়িতে স্থিতি লাভ করেছেন। বছর পাঁচ-সাত হল স্ত্রী মারা গেছেন। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। জামাই মস্ত বড় কোম্পানির বড় দরের এনজিনিয়ার, ছেলেও এনজিনিয়ার, জামাই-ই তাকে নিজের কোম্পানিতে টেনেছে এবং পদস্থ করেছে।

ভদ্রলোকের কথাবার্তা গম্ভীর গোছের, কিন্তু বেশ সরস।

হেসে বললাম, ছেলে জামাই দুজনেই এনজিনিয়ার, আপনার তাহলে পুলিশের চাকরির ওপর তেমন টান নেই?

—কি যে বলেন, এ-দেশের মানুষ পুলিশকে কি চোখে দেখে আমার জানতে বাকি। আমার নিজের বিয়ের ব্যাপারে মশাই বাবা-মায়ের পছন্দের তিন-তিনটি মেয়ের বাপ ছেলের পুলিশে চাকরি শুনে পিছু হটে গেছল। পুলিশের মেয়ে শুনে আমার এই জামাইয়ের বাপও পিছু হঠার মতলবে ছিল, মেয়েটাকে দেখে জামাই বাছাধন একটু মজে না গেলে এ-বিয়ে হত কিনা সন্দেহ।

আমি হেসে উঠেছিলাম। তিনিও হেসেই বললেন, সত্যি যা তা সত্যি, আর ছেলের বিয়েও কি পুলিশ বাপ দেখে হয়েছে—হয়েছে তার বিত্তের ছাপ আর বড় কোম্পানির ভালো চাকরি দেখে। বউমাকে একদিন সে-কথা বলতে সে তো লজ্জায় বাঁচে না।

যতটুকু দেখেছি ভদ্রলোকের বউমাটি বেশ সুশ্রী, আর মেয়েটিকে সুন্দরীই বলা চলে। চাকরি ক্ষেত্রে আমি মোটামুটি পদস্থ সাংবাদিক ছিলাম, সেই সুবাদে কিছু পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও আছে। তাঁদের বিনয় এবং শিষ্টাচার নিয়ে কটাক্ষপাত করছি না, কিন্তু ভদ্রলোকের অন্তরঙ্গ হবার মতো একটু বিশেষ গুণ আছে। এখন অন্তত এঁকে রাশভারী বা জাঁদরেল পুলিস অফিসার বলে মনে হচ্ছে না। হতে পারে কর্মক্ষেত্রে তাই ছিলেন, কিন্তু ভিতর সরস না হলে প্রথম আলাপে সৌজন্যের পালিশই বেশি চোখে পড়ত।

গল্প থামিয়ে জিগ্যেস করলাম, চা হবে কি কফি আগে বলুন?

—দুটোর একটা হবেই? তাহলে চা-ই বলুন, আর সেটা আসার আগে আপনার এই পর্দাটা ফেলে দিন, আমার বারান্দা থেকে হীরু ব্যাটার আবার চোখে না পড়ে। হাসছেন।

—হীরু কে?

—হীরু হল হীরেন্দ্রচন্দ্র দাস, ছেলেবেলায় ছিল চাকর, প্রমোশন পেতে পেতে রান্নার ঠাকুর হয়েছে, বাজার সরকার হয়েছে, ড্রাইভার হয়েছে, আর হালে মেয়ের আস্কারা পেয়ে এখন আমার গার্জেন হয়ে বসছে—দিনে কত পেয়ালা চা খাই মেয়ের কাছে রিপোর্ট করে।

বুঝলাম এ সেই না-বাবু না-চাকর গোছের লোকটি। জিগ্যেস

করলাম, খুব বেশি খান নাকি ?

—কোথায় বেশি, দিনে রাতে পাঁচ-ছ কাপ—তবে ইদানীং গলার ট্রাবলের অজুহাতে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছিল—

চা বলে এলাম। প্রথম বাক্যালাপে গলার ট্রাবলের দরুন লেকে বেড়াতে যেতে পারছেন না বলেছিলেন মনে পড়ল। আর সামনের বাড়ির অমর গাঙ্গুলীর ভাষায় সেই অজুহাতে সকালেই গরম জল সহযোগে ব্রাণ্ডি চলছিল—এ নাকি কোণের বাড়ির কনট্রাক্টর দত্ত সাহেব স্বচক্ষে দেখে গেছেন। জিগ্যেস করলাম, আপনার গলার কি ট্রাবল ?

—কে জানে, গলার স্বর মাঝে মাঝে কেমন ফ্যাসফেসে হয়ে যায়, আর ভিতরে কি-রকম চাপ চাপ লাগে—মেয়ে শুনে থ্রোট স্পেশালিস্টের কাছে টেনে নিয়ে গেল, তিনি দেখেশুনে বললেন কিছুই না, ফ্রিজের জল বা ঠাণ্ডা জিনিস কম খাবেন। একটু যত্নটত্ন করলে অবশ্য কমে যায়, তা আমি যত্নটা বেশির ভাগ চায়ের ওপর দিয়েই চালাচ্ছি।

চা বিস্কুট আসতে বিস্কুটের প্লেট সরিয়ে দিয়ে শুধু চায়ের পেয়ালাই টেনে নিলেন। প্রথম চুমুকের পরেই খুশির মন্তব্য, খাসা চা—আমার লুকিয়ে চা খাবার একটা জায়গা হল।

আমি হেসেই বললাম, খুব আনন্দের কথা, কিন্তু আপনার মেয়ের বেশি শত্রু হয়ে উঠতে আমি রাজি নই—

চা খেতে খেতে মাথা নাড়লেন, যা বলেছেন, যত বয়েস হচ্ছে মেয়েটার চোখে আমি ততো যেন খোকা হয়ে যাচ্ছি। আমার পেয়ালা অর্ধেক খালি হবার আগেই তাঁর পেয়ালা শেষ। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, যাক, এতক্ষণ তো কেবল নিজের কথাই হল, এবারে আপনার কথা শোনান, নইলে মেয়ে আর বউমাকে কি বলব ?

—কিছুই বলতে হবে না, কেবল তাঁরা এলে একদিন এখানে পাঠিয়ে দেবেন, বলবেন খুব খুশি হব।

—বাঃ, আমার দায়িত্ব শেষ।—তা আপনি হার্ট পেশেণ্ট বলতে কি—বয়েস তো তেমন বেশি মনে হয় না?

—বছর পাঁচেক আগে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে, তারপর থেকে একটু আধটু ধকল পোহাতে হচ্ছে। জবাব সেরে বললাম, আপনি সবে রিটায়ার করলেন, আপনার চোখেও বয়েস বেশি মনে হয় না?

হাসতে লাগলেন।—এই তো আবার জোচ্চুরি কবুল করিয়ে ছাড়লেন, তবে অপরাধটা আমার নয়, আমার পিতৃদেবের, য়ুনিভার্সিটির সার্টিফিকেটে বয়েস তিন বছর কমানো ছিল, অন্য দিকে কর্তারা এক বছর এক্সটেনশনে রেখেছিলেন, তাহলে আসল বয়েস আমার বাষট্টি পেরিয়ে গেল।

বললাম, তবু আমার থেকে পাঁচ বছর পিছিয়ে আছেন।

—বলেন কি! দেখে তো মনে হয় না, কি আর করা যাবে, সিনিয়রিটি মেনে নিলাম।—এবারে লেখার কথা শুনি, আপনার অনেক গল্প নাকি সিনেমা হয়েছে নাটক হয়েছে, তার মানে আপনি কেবল উপন্যাস আর গল্প লেখেন?

—অনেকটা তাই বলতে পারেন।

বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন।—আমার গল্প উপন্যাস পড়ার দৌড় শরৎবাবু পর্যন্ত। একবার বঙ্কিম ধরেছিলাম, বড় বড় শব্দ আর তার অলংকার ডিঙোতে পারলাম না—রবীন্দ্রনাথও চেষ্টা করেছিলাম, চোখ চোকে তো মন ঢোকে না, লজ্জার কথা আর বলবেন না।

বলার মধ্যে এতটুকু দম্ভ নেই বলেই ভালো লাগছে।

—এবারে আমার আর একটু আরজি আছে।

আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির জবাবে বললেন, বাড়ির কারো যদি অসুবিধে না হয় আপনাদের পুজোর ঘরখানা একবার দেখব।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম, অসুবিধের কি আছে, আসুন—

তিনিও উঠলেন।—রোজ রাতে কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ বাজে, ভারি ভালো লাগে—আপনাদের গৃহ দেবতা হলেন—?

—নৃ-সিংহ নারায়ণ, তিনশ' বছরের বিগ্রহ, দেশের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শুনেছি এককালে স্বপ্নাদিষ্ট মানুষ অনেক দূর থেকে পুজো দিতে আসত—পার্টিশনের গুঁতোয় দেবতাটিকেও ভিটে ছাড়া হতে হয়েছে। ঠাকুরঘরের দিকে যেতে যেতে হেসে জানান দিলাম, আমাদের দারুণ কিছু ভক্তি-নিষ্ঠা আছে ভাববেন না যেন—বাবা-মায়ের আমলে যা চলত এখনো সেটা চলে আসছে।

ছোট্ট মন্তব্য, তাই বা কম কি।

পুজোর ঘরের দু-হাত দূরে পায়ের শৌখিন চপ্পল খুললেন। সামনেই কল দেখে হাত ধুলেন, পায়ে জল দিলেন। তারপর দু-হাত যুক্ত করে পুজোর ঘরে ঢুকলেন। ভেবেছিলাম নারায়ণের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত দেখব, জোড় হাতে দাঁড়িয়ে খানিক দেখলেন, মনে হল প্রণামটুকু চোখেই সেরে নিলেন। তারপর এদিকে বড় কালীর পটের দিকে চোখ গেল। কাছে এগিয়ে এলেন, নিরীক্ষণ করে দেখলেন, মনে হল নারায়ণের থেকেও কালীর প্রতিই তাঁর আগ্রহ বেশি। এখানেও যুক্ত হাত আর চোখে প্রণাম। ভারি গলার স্বর খুব মৃদু, বললেন, যেমন সুন্দর তেমনি স্নিগ্ধ, এমনটি সচরাচর চোখে পড়ে না, কোথায় পেলেন ?

—ঠিক বলতে পারব না, মায়ের কালী, পঁয়ষট্টি বছর মা পুজো করে গেছেন, সেই পুজোই চলছে।

ফিরলেন। মুখখানা ভাব-গম্ভীর। চোখে দূরের তন্ময়তা। এই ভাবান্তরের সঙ্গে চাকরিগত কোনো পাপবোধ জমা দেওয়ার যোগ আছে আজ অন্তত তা মনে হল না।

আলাপ এরপর মন-খোলা হৃদ্যতার দিকে এগিয়েছে। মানুষটা বাইরে যত রাশভারী গম্ভীর, ভিতরে আদৌ তা নন। তাঁর চাকরির আমলের দাপটের খবর রাখি না, কিন্তু এখনকার গাম্ভীর্যটুকু নিজেকে আড়াল করার আবরণের মতো মনে হয়।

তিন চার দিনের মধ্যেই এক সন্ধ্যায় তাঁর মেয়ে-জামাই ছেলে ছেলের বউ এসে হাজির। মেয়ে বলল, আসার পাসপোর্ট পেয়ে

সকলেই এসে গেলাম।

শিক্ষার সহজাত বিনয়ের মাধুর্য দেখলাম আবার বেশ সপ্রতিভ হাসি খুশিও। ছেলে দুটোর বড় চাকরির দেমাক নেই, মেয়ে দুটিও নিরহঙ্কার। ছেলে-ছেলের বউয়ের নাম অমিতাভ আর উর্মিলা, মেয়ে-জামাইযের নাম শর্মী আর দেবব্রত। মেয়ের দুটি ছেলে, বয়েস এগার আর আট। ছেলের একটি মেয়ে, বয়েস সাত। আমি এদের চারজনকে অনেকবারই আসতে যেতে দেখেছি, এদের ছেলেমেয়েদের দেখিনি। শুনলাম, নাতি-নাতনীরা প্রত্যেক রবিবার সকালে দাদুর কাছে আসে আর বিকেলে ফেরে। সেই দিন আবার সকালে আমার ঘরে জোর আড্ডা বসে, আর দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত কনট্রাক্ট ব্রিজ চলে। তাই চোখে পড়েনি।

মেয়ে শর্মী আর বউ উর্মিলার যেটুকু উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করলাম তা কেবল সাহিত্য নিয়ে। এই কোণের ঘরে বসে লিখি শুনে আগ্রহ সহকারে চারদিক দেখে নিল। উঠে কাচের আলমারির বইগুলোও দেখল। তারপর প্রশ্ন, কখন লিখি, কতক্ষণ লিখি, কিভাবে প্লট সংগ্রহ করি ইত্যাদি। উর্মিলা বলেই ফেলল, সামনা সামনি একজন সাহিত্যিককে আমি এই প্রথম দেখলাম।

আমি যোগ করলাম, এবং খুব হতাশ হলে।

হাসি ছাড়া এর আর কি জবাব। ছেলে আর জামাইয়ের দিকে ফিরে বললাম, বড় কোম্পানির বড় এনজিনিয়ার—তোমরাও কি সাহিত্য রসিক নাকি?

সে হেসে সত্যি জবাবই দিল, ছাত্র জীবনে পড়তাম, এখন আর খুব সময় পাই না।

তার স্ত্রী অর্থাৎ মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে কটাক্ষপাত। মন্তব্য, এখন ওরা কেবল নাটক বা সিনেমা দেখে আপনার সাহিত্য বিচার করে।

আহত গোছের মুখ করে বললাম, সেটা কি সুবিচার হল?

বছর বত্রিশ হবে মেয়েটির বয়েস, কিন্তু বেশ প্রাণোচ্ছল। বলল, সেটা বোঝে কে! একটা বইয়ের নাম করে বিচারের সরস নমুনা দিল।

—বই পড়ে সিনেমাটা আমার ভালো লাগেনি, ওরও না, তাই বইটা লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে ওকে পড়তে দিয়েছিলাম। পড়া শেষ করে ও আপনার নায়কের তড়িঘড়ি অমন বাড়িটা করে ফেলার ব্যাপারে খুঁত ধরল, বলল, টেকনিকাল ভুল আছে।

এদের দেখে সত্যি ভালো লেগেছে আর অংশুমান ঘোষ ভদ্রলোক-টিকে ভাগ্যবান মনে হয়েছে। যাবার আগে মেয়ে মিনতি করে বলল, আপনি খুব ব্যস্ত জানি, তবু বাবার দিকে একটু চোখ রাখবেন, আপনাকে বাবার খুব ভালো লেগেছে আর আমরাও একজন নাম-করা জেঠু পেয়ে গেলাম—বাবা বরাবরই একটু একলা, কিন্তু মা চলে যাবার পর থেকে একেবারে নিঃসঙ্গ, মন খুলে কারো সঙ্গে মিশতেই চান না—আপনি বেড়াতে-টেডাতে বেরুলে একটু যদি ডেকে নেন খুব ভালো হয়। গলা নিয়ে এখন আবার অসুখ-অসুখ বাতিক হয়েছে, আমি ডাক্তার দেখিয়েছি—কিছুই না।

এরপর একদা জাঁদরেল পুলিশ অফিসার অংশুমান ঘোষের সঙ্গে যত মিশেছি, আমার মনে হয়েছে এ-রকম আরো বিশ-পঁচিশজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে যদি ঘনিষ্ঠ হতে পারতাম, দেশের পুলিশ সম্পর্কেই আমার ধারণা বদলে যেত। সকালে বা বিকেলে আমাকে বারান্দায় ঘুরতে দেখলেই সাদর আহ্বান জানান, হাত খালি নাকি, আসুন না একটু গল্প করি। হয়তো এর দু-আড়াই ঘণ্টা আগে দুজনে লেক থেকে মর্নিংওয়াক সেরে ফিরেছি। যাই। তাঁর সঙ্গ শুধু ভালো লাগে না, এক ধরনের আকর্ষণও অনুভব করি। আগের ভাড়াটের সাত-আট বছরের আমলে বিশেষ কোনো আমন্ত্রণে দুই একবার এসেছি। সামনের এতবড় ডাইনিং-কাম-সিটিং স্পেস মাল আর আসবাবপত্রে এমন বোঝাই থাকত যে পাঁচ মিনিটে হাঁপ ধরে যেত। ছাদে খেতে ওঠার জন্য অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য থাকত না। কিন্তু এখন দোতলায় এসে দাঁড়ালে মনেই হবে না এ সেই একই মস্ত হল্‌ঘর। সামনের আধখানাটায় শৌখিন গালচের ওপর দুটো তকতকে সোফা আর একটা সেটি পাতা, মাঝে সুন্দর সেন্টার টেবিল। সোফা সেটির কাঁধ-জোড়া

রং-মেলানো চারটে টারকিশ তোয়ালে পাতা। হল্-এর মাঝখান দিয়ে দু-মাথা জোড়া সুন্দর পর্দার পার্টিশন। বেশির ভাগ সময় ওটা গোটানোই থাকে। হল্-এর ও-মাথায় সুন্দর ডাইনিং টেবিলের চারদিকে ম্যাচ-করা ছ'টা চেয়ার পাতা। দুদিকের দেয়ালে একটা করে বড় অয়েল পেন্টিং। তার দুদিকে দুটো করে সাজের বাতির ছোট দেয়াল ঝাড়। দেখলেই বোঝা যায় ওগুলো এ রাজ্যের নয়, বাইরের জিনিস। টিভি এমন জায়গায় পাতা যে বসার জায়গা থেকে আবার খাবার জায়গা থেকেও দেখা যায়। এসে দাঁড়ালে পরিচ্ছন্ন রুচির প্রশংসা করতেই হয়। প্রথম দিন এসে আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, বাঃ!

খুশি হয়ে অংশুমান বলেছিলেন, এতে আমার কোনো কেরামতি নেই মশাই, আমি ঠাসাঠাসি জিনিস পছন্দ করি না জেনে এই হল্‌ঘর আর ঘর দুটো সাজানো নিয়ে আমার মেয়ে বউমা আর হীরু মাথা ঘামিয়েছে। সব ঠিক করে আমাকে যখন বলেছে, রেডি, চলো— আমি কষ্ট করে এসে হাজির।

বাইরে নয়, প্রথম দিনই আমাকে নিজের শোবার ঘরে এনে বসিয়েছেন। বলেছেন, অন্তরঙ্গ হতে হলে অন্দরে আসতে হয়, চলে আসুন। শোবার ঘর দুটো রীতিমতো বড় আগেই বাড়ির মেয়েদের মুখে শোনা ছিল। দেখেও খুব ভালো লাগল। এতবড় ঘরখানার বৈশিষ্ট্য সর্বরকমের বাহুল্য বর্জন। দেয়াল ঘেঁষে খাট পাতা, শৌখিন বেড-কভারে ঢাকা। রাস্তার দিকের দরজার পাশে একটা গদি-মোড়া ইজিচেয়ার। খাটের উল্টো দিকের দেয়ালে কালীর মস্ত একখানা বাঁধানো ছবি। তার নিচে দেয়ালে কাঠের তাক ফিট করা। তাতে হাতে-কাজ করা সুন্দর সরু রঙিন কাপড়ের ঢাকনা বিছানো। তাকের দুদিকে দুটো ধূপদানীতে তিনটে করে চন্দন ধূপকাঠি জ্বলছে। মাঝখানে স্টিলের রেকাবিতে কিছু পাঁচ-মিশেলি ফুল। ফোটোতে একশ আট জবার টাটকা মালা। পরে লক্ষ্য করেছি হীরুর ভোরের বাজারের সঙ্গে এরকম একটা করে জবার মালা রোজই আসে। পাশে আর

একটা ছোট্ট দেয়াল-তাকে কিছু বই। কি কি বই দেখলাম। স্বামী বিবেকানন্দর কর্মযোগ, গান্ধীজীর ট্রুথ ইজ গড, সংস্কৃত-বাংলা গীতা একখানা, পাশে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের থিইজ্‌ম্ অফ ভগবদগীতা, তার পাশে নিবেদিতার কালী, দি মাদার। শেষে পাঁচ খণ্ডের একসেট কথামৃত।

মন্তব্য করেছিলাম, শাক্ত-বৈষ্ণবের সহাবস্থান ঘটিয়েছেন দেখছি।

চার কোণে চারটে শান্তিনিকেতনী মোড়া। মেয়ে-জামাই আর ছেলে-ছেলের বউয়ের বসার জন্য ওগুলোর ঘরে ঠাঁই হয়েছে বোধহয়। ব্যস, এতবড় ঘরে আর কিছুই নেই। একটা আয়নাও না। মাঝের খোলা দরজা দিয়ে ও-ঘরে স্টিলের আলমারি, ড্রেসিং টেবিল আলনা ইত্যাদি সাজানো দেখা গেল। আমাকে খাটে বসতে দিয়ে নিজে ইজিচেয়ারটা টেনে বসেছেন। এর পরেও যত বার এসেছি, আমি খাটে উনি ইজিচেয়ারে।

প্রথম দিনে দু-দশ কথার পর আমি ইচ্ছে করেই ভক্তি প্রসঙ্গে এসে গেছলাম। জিগ্যেস করেছিলাম, ভক্ত পুলিশ অফিসার আপনি আর ক'জন দেখেছেন?

চোখ গোল করে আমার দিকে চেয়েছিলেন একটু।—আর ক'জন মানে? আমাকে আপনি ভক্ত ধরে নিয়েছেন?

—নন?

হাসতে লাগলেন।—না মশাই না, ভক্তের বিশ্বাস সম্বল, আমার সেই ঝুলিতে হাজার ফুটো, আমার থেকে হীরু ব্যাটা খাঁটি ভক্ত, তিরিশ বছর বয়সে ওর বউ মরে গেল, ছেলেপুলেও হয়নি, আমার স্ত্রী ঝোলাঝুলি করল আবার বিয়ে কর, ব্যাটা হাত জোড় করে বলে কি জানেন, সব মেয়েকেই ওর এখন মা ভাবতে ইচ্ছে করে, বিয়ে থা আর ওর দ্বারা হবে না। একজন আমাকে বলল, ঘরে দক্ষিণা কালী রাখো, ধূপ ধুনো ফুল জল দাও—ব্যস বাজার ঢুঁড়ে ও এই ছবি এনে এখানে টাঙিয়ে দিলে, রোজ মালা পরিয়ে ফুলজল ধূপধুনো দেওয়া এখন ওর ডিউটির মধ্যে—আমি বাধা দিইনে বলে আমার যেটুকু পুণ্যি।

এ নিয়ে আমি আর তর্কে এগোলাম না। রাশভারী মনিবের অনুমোদন ভিন্ন তাঁর শোবার ঘরে এ-ছবি টাঙিয়ে রোজ ধূপধুনো দেওয়া আর একশ আট জবার মালা পরানো কারো পক্ষেই সম্ভব হত না। হেসে আঙুল তুলে তাকের বই ক'টা দেখলাম।—ওগুলোও হীরুই পড়ে বোধ হয়?

আবার হেসে উঠেছেন। তারপর মনে হল তিনি যেন চোখের সামনে কিছু দেখছেন। মৃদু হেসে বললেন, ব্যাপার কি জানেন, মাঝ-বয়েস পর্যন্ত মনেপ্রাণে আমি পুলিশই ছিলাম, অনেক নিষ্ঠুর কাজ কত অনায়াসে না করেছি।—যে সময়ের কথা বলছি, তখন কর্তাদের অবিবেচনাতেও আমার মন মেজাজ খারাপ, প্রমোশন ডিউ অথচ বছরের পর বছর একটা অজ-জায়গায় পড়ে আছি—সেই সময় একটা ঘটনা আর বিশ্বাসের এক আশ্চর্য নজির দেখে আমার ভিতরে কি-রকম নাড়াচাড়া পড়ে গেল।···বুঝলেন, তার পর থেকেই মনে একটা জিজ্ঞাসার উৎপাত শুরু হল। যত ভাবি ততো অথৈ জলে। ওই বইটইগুলো উল্টেপাল্টে দেখি, যাঁরা লিখেছেন তাঁরা তো আর ফেলনা কেউ নন, পড়ে বুঝতে চেষ্টা করি, ভালোও লাগে অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু নিজের পায়ের তলায় সেই বিশ্বাসের জমির কোনো হদিসই নেই।···তবে একটু লাভ হয়েছে বলতে পারেন, অন্ধ ভক্তি বিশ্বাস বা আবেগে কাউকে কোথাও মাথা খুঁড়তে দেখলেও এখন বিজ্ঞের মতো হাসতে পারি না বা অশ্রদ্ধা করতে পারি না।

কান পেতে শুনেছিলাম। কিন্তু লেখকের নাকে রসদের গন্ধ। জিগ্যেস করলাম, যে ঘটনা আর বিশ্বাসের নজির দেখে আপনার এই পরিবর্তন, সেটা কি?

বিমনা ছিলেন, প্রশ্ন শুনে নিজের মধ্যে ফিরলেন আর আঁতকে উঠলেন।—কি সর্বনাশ! আপনার মতলবখানা কি মশাই? এ নিয়ে কলম ধরলে তো গেছি! দাস্ ফার অ্যাণ্ড নো ফারদার—ওরে হীরু, আর একটু চা-টা দিবি, না কি? মিটিমিটি হেসে মন্তব্য করলেন, পুলিশ অফিসার চাকরি থেকে রিটায়ার করার পরেও তার এক্সহিউমড্

হবার ভয় থাকে—বুঝলেন।

অর্থাৎ কবর খুঁড়ে মৃতদেহ টেনে তুলে আবার তত্ত্ব-তল্লাশী চলতে পারে।

এড়িয়ে গেলেও আমার মনের তলায় কৌতূহলের আঁচড় পড়ে থাকল।

পরের চার মাসের মধ্যে সেই রমণীটিকে আরো পাঁচ ছ'বার দেখলাম। সেই সাদাসিধে বেশবাসের কালো অথচ সুশ্রী দেখতে একজনকে। আমার অনুমানে বয়েস যার আঠাশ তিরিশের মধ্যে। দীর্ঘাঙ্গী, সুঠাম স্বাস্থ্য। হীরু দাস তাকে শেষ বিকেলে বা সন্ধ্যার মুখে কর্তার গাড়ি করে নিয়ে আসে, আবার এক-দেড ঘণ্টা বাদে গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসে। তাকে নিয়ে আসা, বাড়ির দরজায় গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসে দরজা খুলে দেওয়া, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সিঁড়ির দরজা দিয়ে ঢোকা—এটুকু তৎপরতার মধ্যেও হীরু দাসেব চোখে-মুখে বেশ একটু শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করেছি। সে এলে তাকে এদিকের ঘরে নিশ্চয় বসানো হয় না, তাহলে আমার কোণের ঘর থেকে স্পষ্টই টের পেতাম। ওখান থেকে কেউ জোরে কথা বললেই আমার ঘর থেকে কিছু কিছু শোনা যায়। হল্‌ঘরের বসার জায়গায় বসানো হলে সেখান থেকে গানের গলা আর একটু স্পষ্ট ভেসে আসার কথা। আমার ধারণা রমণীটিকে হীরুর মালিকের শোবার ঘরে নিয়েই তোলা হয়। কিন্তু খটকা বাধে অন্য কারণে। আমার সামনের বারান্দায় দাঁড়ালে ভদ্রলোকের শোবার ঘর তো এক সারিতেই পড়ে। সেখান থেকে গান তো আরো স্পষ্ট শুনতে পাওয়ার কথা। ঘরের দরজা-টরজা বন্ধ করলে যেমন অস্পষ্ট কিছু কিছু কানে আসে, তেমনি শুনি। তাও গলা চড়ালে। আবার, এলে যে গান হয়ই তা-ও না। পরের পাঁচ ছ'মাসের মধ্যে দিন তিনেক মাত্র গান হচ্ছে বোঝা গেছে। গান হলে কিছু তো কানে আসবেই। ঘণ্টা সোয়া ঘণ্টা বাদে তাকে আবার গাড়িতে গিয়ে উঠতে দেখি।

গাড়ি চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত অংশুমান ঘোষকে দোতলার রেলিংএ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। হীরু দাস পৌঁছে দেয় কিন্তু ফেরে কখন তা এখন পর্যন্ত টের পেলাম না।

গাড়িটা চলে গেলে ভদ্রলোক এক-আধ দিন ঘুরে আমাকেও বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। মুখ ভালো না দেখা গেলেও রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হয় না এমন নয়। কিন্তু ওই রমণীকে নিয়ে গাড়িটা চলে গেলেই তিনি সোজা নিজের ঘরে ঢুকে যান।

এক-আধদিন হয়তো বাদ পড়ে, নইলে রোজই ইদানীং একসঙ্গে লেকে মর্নিংওয়াকে যাই, একসঙ্গে ফিরি। আকাশের অবস্থা সুবিধে না বুঝলে তিনি গাড়ি বার করে আমাকে ডেকে নেন, এর ওপর আমি লিখছি না টের পেলে সকালেও ডাক পড়ে, বিকেলে বা সন্ধ্যার দিকে তো মাঝে মাঝেই পড়ে। সকালে গেলে হীরুর হাতের তৈরি গরম সিঙ্গাড়া বা গরম কচুরি জোটে, বিকেলে বা সন্ধ্যায় এক-এক দিন মাংস পরোটাও এসে যায়। খাওয়ার গল্প থেকে তখন অনেক গল্প অনেক কথা হয়। তাঁর চাকরি জীবনের অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা শুনি। তাই থেকে লেখার খোরাকও জোটে। জিজ্ঞেস করি লিখতে পারি না কপি-রাইট সিলড্? তিনি হেসে মাথা নাড়েন, বলেন সচ্ছন্দে—তবে আমাকে আড়ালে রেখে মশাই।

এ পর্যন্ত তাঁর মাল-মশলার নির্ভরে দুটো ছোট গল্প ছাপা হয়েছে। দেখে এবং পড়ে তিনি ছেলেমানুষের মত খুশি। দুবারই বলেছেন, এ থেকে এমন জিনিসও তৈরি হয় মশাই—অ্যাঁ?

—কিন্তু যে রমণীটিকে নিয়ে আমার কৌতূহল দানা বেঁধে উঠছে তার সম্পর্কে নিজে থেকে ভদ্রলোক একটি কথাও বলেন না। হীরু দাস যাকে গাড়ি করে নিয়ে আসে আর গাড়ি করে পৌঁছে দেয়। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে গেলে ভদ্রলোক নিজের বিগত স্ত্রীর গল্প করেন, ছেলে-ছেলের বউ বা মেয়ে-জামাই কবে কি কাণ্ড করে বসেছিল সেই গল্প করেন, চাকরি জীবনের কোলিগ আর উপর-

ওয়ালাদের নিয়ে কত মজার কথাই সিরিয়াস মুখ করে বলেন, তাঁর মেয়ে শমী তো আমার ওপর দারুণ খুশি—তার বাবা মন খুলে গল্প করার মতো একজন মানুষ পেয়েছেন এ নাকি নিজেই মেয়েকে বলেছেন। কিন্তু ওই একটি বিশেষ রমণীর সম্পর্কে ভদ্রলোক এ-যাবত একটি কথাও তোলেননি। গাড়ি করে তাকে নিয়ে আসা হয় আর পৌঁছে দেওয়া হয় এ-কারণেই বিশেষ বলছি। হতে পারে বলার মতো কেউ নয়, কিন্তু এমন যদি হয় ইচ্ছে করেই বলেন না তাহলে আমার কৌতূহল অশোভন গোছের হয়ে দাঁড়াবে।

তবু এক একবার মনে হয়েছে জিগ্যেস করে বসি। পারিনি অন্য কারণে। এই একই ব্যাপারে পড়শীদেরও কৌতূহল আমাকে একটু দুর্বল করেছে, সংযমীও করেছে। কেউ চোখ বুজে বসে থাকে না, আর রমণীঘটিত বাতাসের আমেজ সব বয়েসেরই মানুষের গায়ে লাগে বোধহয়। মাসে একবার দুবার ওই রমণীটিকে এই পুলিশ অফিসারের বাড়ি আসতে যেতে আশেপাশের বাড়ির অনেকেই দেখে। যতটুকু সম্ভব লক্ষ্যও করে মনে হয়। বিশেষ করে অমর গাঙ্গুলী, আর তাঁর পাশের বাড়ির একতলা দোতলার ভট্‌চায মশাই আর রায়মশাই। মানুষটাকে তাঁদের দাম্ভিক ভাবাই স্বাভাবিক, কারণ সৌজন্যের দায়েও ভদ্রলোক কারো বাড়িতে পাণ্টা দর্শন দিতে যাননি। ব্যতিক্রম কেবল আমি, মুখে সরাসরি না বললেও এটা কারো খুব পছন্দ হয়নি। যাতায়াত করতে দেখেন, একসঙ্গে মর্নিংওয়াক থেকে ফিরতে দেখেন, এমন কি তাঁর মেয়ে-বউয়েরও আমার বাড়িতে আনাগোনা দেখেন। এই সরাসরি না হোক মুখোমুখি বাড়ির দোতলার অমর গাঙ্গুলী ঠেস দিতে ছাড়েন না। সেদিন সন্ধ্যায় আমার এই কোণের ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। প্রথমেই চড়া অভিযোগ, সকাল-সন্ধ্যা আর যে আপনার দেখাই মেলে না, অবসর সময়ের সবটুকুই যে পুলিশ সাহেব নেবারটির দখলে দেখছি।

ছেঁড়া কাপড়ে তাপ্পি লাগানোর মতো করে জবাব দিয়েছি, নিজের স্বার্থে আমি বরং তাঁর অবসরের খানিকটা কাড়তে চেষ্টা করি।

—কি রকম? উৎসুক।—লেখার খোরাক-টোরাক পান নাকি?

—তাছাড়া আর কি, ভদ্রলোকের অনেক অভিজ্ঞতা, খোরাক পেয়ে এরই মধ্যে দুই একটা লেখা ভালো উতরেছে।

জলে বাস করে কুমীরের লেজের ঝাপটা কে না এড়াতে চায়। আমার স্বার্থের এ-দিকটা অমর গাঙ্গুলীর মাথায়ই আসেনি সেটা পরের কথায় বোঝা গেল।—তাই বলুন, আমরা আরো অবাক হচ্ছিলাম পাড়াসুদ্ধু লোকের মধ্যে কেবল আপনার সঙ্গেই পুলিশ সাহেবের এত ভাব-সাব কেন! উল্টে আপনার ওপরই একটু অভিমান হচ্ছিল, একবারই সেই কার্টসি ভিজিট দিয়ে গিয়ে তাঁর পাশের বাড়ির মানুষটি যে নামী লেখক সে সুখ্যাতি আমরাই করে এসেছিলাম—তার পরেই দেখি কিনা আমে-দুধে মিশে গেল আর আঁঠি, মানে আমরাই বাদ!

আমরা বলতে উনি একা নন। কার্টসি ভিজিট দিতে গেছলেন সঙ্গে আরো দুজন। ওঁর পাশের বাড়ির দোতলার রায়মশাই আর একতলার ভট্চায মশাই। পুলিশ সাহেবের এই অবহেলা তাঁদের চিনচিন করে লাগে এবং আলোচনা হয় বোঝা গেল। প্রসঙ্গ বিরক্তিকর। জবাবে শুধু হাসি।

—তা এই স্বার্থ তো আপনার পেশার অঙ্গ, কিন্তু সাহেবের তো এখনো পুলিশের মেজাজ দেখি—আপনার কাছে মুখ খোলেন?

—খোলাতে পারলে খোলেন।

—লেখকদেরই ভাগ্য মশাই—তা আপনাকে বলার স্বার্থ কি, ওঁকে গল্পের হিরো-টিরো বানাচ্ছেন নাকি?

এবার হাসি মুখেই সুর পাল্টালাম।—আপনি, গল্পের অ-আ জানেন না বোঝেন না পড়েন না—কি পেলে আমি কি বানাই আপনাকে কি করে বোঝাই বলুন তো?

নির্বোধ আদৌ নন। হেসে সামলে নিলেন।—তা যা বলেছেন, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজ—আর আপনার এত নাম-যশ কি এমনি এমনি! সঙ্গে সঙ্গে আবার উৎসুক এবং গলা খাটো।—আচ্ছা

ও-বাড়ির মেয়ে-বউয়ের সঙ্গেও তো আপনার আলাপ-সালাপ হয়েছে, তারা নিজেদের গাড়িতে আসে যায়—কিন্তু বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে পুলিশ সাহেবের গাড়িতে একটি মেয়ে আসে আর সন্ধ্যের পর ওই গাড়িতেই ফেরে—ভট্চায মশাই আর রায়মশাইও দেখেছেন—কে বলুন তো মেয়েটি ?

—জানি না।

সন্দিগ্ধ দু-চোখ আমার মুখের ওপব থমকালো—আপনি তাকে দেখেননি ?

—দেখেছি।

—আমরাও দেখেছি, তবে ও-ফুটে গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে চলে যায়, আর সন্ধ্যার পর ফেরে তাই ঠিক দেখতেও পাই না, বুঝতেও পারি না—

প্রতিবেশীদের আগ্রহ কোন্ পর্যন্ত চড়েছে জানার ইচ্ছেয় সাদা মুখ করেই জিগ্যেস করলাম, কি দেখতে বা বুঝতে চান ?

—ইয়ে মানে যতটুকু দেখেছি তাতে আত্মীয় বা বড়ঘরের মেয়ে মনে হয় না—অথচ গাড়ি করে নিয়ে আসা হয় দিয়ে আসা হয—তাই ভাবছিলাম কে হতে পারে। আপনার কি ধারণা ?

—আমি এ নিয়ে ভাবিও না, কোনো ধারণাও নেই। তবে মেয়েটি ভদ্রলোকের নিজের মেয়ের থেকেও বয়সে ছোট হবে বলে মনে হয়—সে এলে ভক্তিমূলক গান-টান কানে আসে—

অমর গাঙ্গুলী নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। মেজাজ চড়লে তাঁর কথাবার্তা বরাবরই একটু বেপরোয়া ধরনের। প্রসঙ্গ ধামা-চাপা দেবার চেষ্টা ভাবলেন। জেরার সুরেই জিগ্যেস করলেন, পুলিশ সাহেবের ছেলে-ছেলের বৌ বা মেয়ে-জামাই থাকতে মেয়েটিকে কখনো আসতে-যেতে দেখেছেন ?

একটু ভেবে জবাব দিলাম, ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় না—

—বোধহয় না, দেখেননি। সাহিত্যিক হয়ে আপনি বয়েসের সার্টিফিকেট দাখিল করবেন ভাবিনি—এবার বলুন, ভক্তিমূলক গান

শুনতে হলে মেয়েটিকে শোবার ঘরে এনে বসিয়ে পর্দা থাকা সত্ত্বেও সামনের দিকের দরজা বন্ধ করার দরকার হয়? ভক্তিমূলক গান যদি একটু-আধটু আমাদেরও কানে আসে তাতে আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে?

আমার কান গরম। প্রথমে ইচ্ছে করল ভদ্রলোককে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলি। কিন্তু নিজের স্বভাবে এটুকু জোরের অভাব। তাছাড়া থমকাতেও হল একটু।—গানের সময় সামনের দরজা বন্ধ না করা হলে বারান্দায় দাঁড়িয়েও আমি স্পষ্ট শুনতে পাই না কেন? এই লোকের সামনে বসে চিন্তার জট ছাড়াতে চেষ্টা করে লাভ নেই।

খানিক বাদে ভদ্রলোক বিজয়ী বীরের মতোই উঠে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, পাড়ায় পাঁচ রকম কথা ওঠে, আপনার ও-বাড়িতে যাতায়াত আছে তাই আপনাকে বলা—যাক, আপনি এ-সবের সাতে পাঁচে নেই যখন যেতে দিন।

এই ক'মাসের মধ্যে অংশুমান ঘোষের দোতলার শোবার ঘরে আমি কতোবার গিয়ে বসেছি এখন আর হিসেব নেই। বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না, যতক্ষণ থাকি যতক্ষণ বসি, একটা শুচিতার স্পর্শ আমায় ঘিরে থাকে। ধূপধুনো একশ-আট জবার মালা গলায় কালীর ছবি বা ওই ক'টা বইপত্র দেখে নয়। এ-সবই আমার নিজের বাড়িতেও আছে, আর পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠানও ঢের বেশিই হয়। কিন্তু এ-রকম একটা শুচিতার অনুভূতি ঠিক মনে আসে না। অমর গাঙ্গুলীর মুখে ও-রকম শোনার পরেও ওই ঘরে কোনোরকম ব্যভিচার কল্পনা ধিক্কারজনক মনে হয়। এরপর থেকে ওই মেয়েটির সম্পর্কে আমার নিজের কৌতূহল একেবারে ধামা-চাপা। অংশুমান ঘোষ আমার সঙ্গে যতই অন্তরঙ্গভাবে মিশুন, মানুষটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক সময় মনে হয়েছে ভদ্রলোক মুখের দিকে চেয়ে মনের অনেকখানি দেখতে পান। ও-প্রসঙ্গ তুলে কোন্ বিপাকে পড়ব কে জানে, তার থেকে মুখ সেলাই করে থাকাই ভালো।

সাত আট মাসের মাথায় ভদ্রলোককে নিয়ে আমার বড় রকমের দুর্ভাবনার কারণ ঘটল। তাঁর গলা নিয়ে অশান্তি বাড়ছেই। গলার স্বর সত্যিই কেমন ফ্যাসফেঁসে হয়ে যায়। তখন চাপ ধরে, স্বস্তিতে খেতেও পারেন না। অবশ্য ব্যথা বেদনা নেই। আমার আর তার নিজেরও ধারণা ঠাণ্ডা খাওয়ার থেকেই এ-রকমটা হয়। একটু ভালো থাকলেই ফ্রিজের জল ছাড়া মুখে রোচে না, দুধের গেলাস আগের দিন রাত থেকে ফ্রিজে ঠাণ্ডা হতে থাকে, পরদিন সকালে খান। ফলটলও ঠাণ্ডা খেতে ভালবাসেন। অস্বস্তি শুরু হলে এগুলো বন্ধ করেন, আর আনুষঙ্গিক চিকিৎসায় একটু ভালোও থাকেন। কিন্তু ইদানীং ট্রাবলটা একটু ঘনঘন হচ্ছে। তবু এজন্য তাঁর নিজের খুব একটা দুশ্চিন্তা হয়নি বলে আমিও মাথা ঘামাইনি।

কিন্তু সেদিন একটু ধাক্কা খেলাম। লেকে বেড়াতে বেড়াতে খুব নিস্পৃহ মুখে বললেন, আপনার কোনো থ্রোট স্পেশালিস্ট আর ভালো জেনারেল সার্জন জানাশোনা আছে?

মুখের দিকে চেয়ে দুশ্চিন্তার ছিটেফোঁটাও দেখলাম না। বললাম থ্রোট স্পেশালিস্ট তো দেখাচ্ছেন, সার্জন দিয়ে কি হবে?

—সেকেণ্ড ওপিনিয়নের জন্য আর একজন থ্রোট স্পেশালিস্টের কথা ভাবছি—তারপর দরকার হলে একজন সার্জনও দেখাবো।

হাঁটা থামিয়ে আমি থমকে তাকালাম। সামনে একটা খালি বেঞ্চ দেখে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসলাম, নিজেও বসলাম।—কি ব্যাপার বলুন তো, ট্রাবলটা খুব বেড়েছে?

তিনি হেসে উঠলেন।—এই জন্যেই মুখ খুলতে চাই না মশাই, ছেলে মেয়ে জামাইরা শুনলে ঘাবড়াবে বলে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—ট্রাবল তো বাড়েইনি, এখন বরং কম—

—তাহলে অন্য থ্রোট স্পেশালিস্ট আর সার্জন দেখানোর কথা কেন?

অল্প অল্প হাসতে লাগলেন। তারপর আমার দিকে একটু ঘুরে বসে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, কারো কারো মনে আগে থাকতে

ভালো-মন্দ বা আপদ-বিপদের ছায়া পড়ে এ আপনি বিশ্বাস করেন?

বললাম, এমন কথা শুনেছি কিন্তু এমন কাউকে চোখে দেখিনি।

—আমি দেখেছি—যত দেখেছি ততো অবাক হয়েছি—বিজ্ঞান মানি, কিন্তু এ মানা শক্ত, না মানা আরো শক্ত।

হঠাৎই একটি মুখ মনে পড়ল। অতি সাধারণ বেশবাসের এক রমণীর মুখ। এ-ই সুযোগ। দুশ্চিন্তার প্রসঙ্গ ভুলে জিগ্যেস করলাম, সেই একজন পুরুষ না মেয়েছেলে?

হাসতে লাগলেন। বললেন, কথাটা তুলে ভালো করলাম না, লেখকের নাক-কান সজাগ দেখছি। মেয়েছেলে মশাই মেয়েছেলে—আমার বাড়িতে তাকে আসতে-যেতে দেখেন না তা-ও মনে হয় না।

ইদানীং একটু বেশিই আসতে-যেতে দেখছি। স্নায়ুর উত্তেজনা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা আমার। স্বাভাবিক সুরে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি কোনো বিপদের ছায়া দেখছেন?

—দেখলেও তা কি বলবে! দেখতে ইচ্ছে করলে আমি তাকে গাড়ি পাঠিয়ে আনাই, কিছুদিন আগে এক দুপুরে হঠাৎ নিজে থেকে হাজির। বলল, দেখতে ইচ্ছা করল, খর-খর চলি এলাম। তা গলা লয়ে অত ভুগতেছ, এবারে এট্টু ভালো করে চিকিচ্ছেয় মন দাও দেখি! শুনে আমি একটু ধাক্কাই খেলাম, অমন ঠাণ্ডা মেয়েকে খুব সুস্থির মনে হল না, কিছু একটা উদ্‌বেগ নিয়ে ছুটে এসেছে বুঝতে পারছি। বললাম, ভালোই তো আছি, হঠাৎ এ কথা কেন, কিছু খারাপ-টারাপ চোখে পড়ছে নাকি?

উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছি।—তারপর?

জবাব দিলেন, কাউকে কিছু বললে মেয়েটা কেন কি জন্য এসব প্রশ্ন পছন্দ করে না। ঝাঁজি মেরে বললে, অত কথায় কাজ কি তোমার বড়বাবু, যা বললাম করো দিকিনি, করে আমাকে নিচিন্দি করো, আমি দৈবী জানি না গণা জানি যে আগে থাকতি ভালো-খারাপ বাখাই দিব? মনে ডাক দেছে যখন ছুটো একটা ভালো ডাক্তার দেখাও, তোমার তো অভাব কিছু নাই।

আরো কিছু শোনার আশায় ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে আছি। এঁর মতো রাশভারী লোককে এক গ্রাম্য মেয়ে ঝাঁজি মেরে তুমি তুমি করে কথা বলে, বড়বাবু বলে ডাকে। কিন্তু যা বলে উনি সেটা অবহেলা করতে পারেন না তা তাঁর পরের কথায় স্পষ্ট। বললেন, আপনার হয়তো হাসি পাচ্ছে, কিন্তু ওর মনে ডাক দেওয়াটা আমরা যারা জানি, তুচ্ছ করতে পারি না, বরং শোনার পর থেকে একটু দুশ্চিন্তাই হচ্ছে।

দুশ্চিন্তা আমারও হচ্ছে এটা প্রকাশ করলাম না। বললাম, দেখুন আমরা শিক্ষাদীক্ষার গর্ব করি, কিন্তু কত সময় একটা শিশুও বড় রকমের এক-একটা সহজ ভুল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যিনি বলেছেন আপনাকে তাঁর দৃষ্টি অন্তত খুব স্বচ্ছ এটা মানতেই হবে—আপনার এখানে আসা থেকেই শুনছি গলার ট্রাবল-এ ভুগছেন, থ্রোট স্পেশালিস্টের চিকিৎসায় সারছে না, কখনো কমছে, কখনো বাড়ছে, আমাদেরই সেকেণ্ড ওপিনিয়ন নেবার কথা বা সার্জন দেখানোর কথা ভাবা উচিত ছিল—অথচ এই রুটিন ব্যাপারটা আমার আপনার কারোই মনে আসেনি। যাক, আপনি উতলা হবেন না, যাকে দেখাচ্ছেন তিনি থ্রোট স্পেশালিস্টই, তার রিপোর্ট নিয়ে আপনাকে আমি আমার বিশেষ পরিচিত এ-লাইনেরই খুব নাম-করা এক সার্জনের কাছে নিয়ে যেতে চাই।

একটু চেয়ে থেকে হালকা সুরে জিগ্যেস করলেন, এ-লাইনের মানে সেই লাইনের?

অগত্যা জোর দিয়েই বললাম, হ্যাঁ সেই লাইনের, আপনার মনে কি ডাক দিচ্ছে সেটা নিজেদের মধ্যে গোপন করে লাভ কি, সোজা হাইকোর্টে গিয়ে হাজির হওয়া ভালো।

—ঠিকই বলেছেন।...আপনার এই ক্যানসার স্পেশালিস্ট সার্জনের চেম্বার কোথায়?

বললাম। কোন্ বড় হাসপাতাল আর কোন্ কোন্ নামী নার্সিং হোমের সঙ্গে অ্যাটাচড্ তাও বললাম। জানালাম, আজকের মধ্যেই

আমি ফোনে কনট্যাক্ট করতে চেষ্টা করব।

—করুন...তবে কাটা-ছেঁড়া মানে বায়োপসি করতে চাইলে ছেলেমেয়ে দুটো ভয়েই আধমরা হয়ে যাবে।

—করতে চাইলেই আপনি গলা পেতে দেবেন তার কি মানে, তখন হাইকোর্টের ওপরে সুপ্রিম কোর্ট আছে—আবার হয়তো এখানে গিয়েই দেখবেন কেস ডিসমিসড্, আপনার কিছুই হয়নি। তবে এটা ঠিক, আপনার ছেলে-মেয়েকে আপাতত কিছুই না জানানো ভালো।

—তা তো ভালো, কিন্তু হীরু ব্যাটাই বলে দেবে, কোথায় কোন্ ডাক্তারের কাছে গেছি—নিজে ড্রাইভ করলেও ও সঙ্গে থাকেই, নইলে মেয়েটা খুব রেগে যায়।

—ব্যস, ও-ভাবনাও শিকেয় তুলে রাখুন, এ ব্যাপারে আপনার গাড়ি বেরুবেই না, আপনি আমার সঙ্গে আমার গাড়িতে যাবেন, আর সেটা যে-কোনো অজুহাতে হতে পারে।

খুব খুশি।

ফেরার সময় জিগ্যেস করলাম, ওই যে-মেয়েটির কথা বললেন তাঁর বয়েস তো বেশি না—কোনো সাধিকা নাকি?

সকৌতুকে তাকালেন, বয়েস কত মনে হয় আপনার?

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকতে আর বাড়ি থেকে গাড়িতে উঠতে যেটুকু দেখা। তবু যা মনে হয়েছে তাই বললাম।—আঠাশ তিরিশের মধ্যে?

—ওর বয়েস এখন বিয়াল্লিশ, কিন্তু সাধিকা আপনি কাকে বলেন? সাধনা যোগ বিভূতি-টিভূতি আছে এমন তো? তার ধারে কাছেও না, দুতিন ক্লাস পড়া অজ গাঁয়ের মেয়ে, গ্রাম্য কথাবার্তা, জাতে জলচলও নয়—আর চরিত্র নিয়ে ওর গায়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িও খুব কম হয়নি। ঘোষ সাহেব হাসলেন একটু।—কালোর ওপর মুখখানা কেমন মিষ্টি আর এ বয়সেও কেমন সেক্সি ফিগার লক্ষ্য করেছেন তো? বয়স কালে অনেক হারামজাদার মুণ্ডু ঘুরেছে—

সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। গাঁয়ের লোক আর কত

পিছিয়ে, শহরের শিক্ষিত প্রতিবেশীরাও যে এই মেয়েকে নিয়ে এ-বয়সের পুলিশ সাহেবের মুণ্ডুটি ঘুরে আছে ভাবছেন আর রসের কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছেন এ-তো আর বলার কথা নয়।

কয়েক পা এগিয়ে ঘোষ সাহেব নিজে থেকেই বললেন, তবে একটা কথা আপনি ঠিক বলেছেন, মেয়েটার যেমন স্বচ্ছ দৃষ্টি তেমনি সহজ বুদ্ধি, ক্লেয়ারভয়েন্স বলে একটা কথা আছে না—দূরের জিনিস দেখতে পায়, দূরের কথা শুনতে পায়—সেই গোছের—হঠাৎ হঠাৎ জোরের সঙ্গে কিছু বলে বসে যখন মনে হবে কি হতে যাচ্ছে চোখে দেখতে পাচ্ছে বা কানে শুনতে পাচ্ছে—জিগ্যেস করলে বলে, ও কিছু না। কপালী বাবার জংলী কালী আর বিষ্টুপুর শ্মশান কালীর কাছে, বড় পীরের মাজারে বিবি মায়ের থানে, আর জয়চণ্ডীর মন্দিরে হাজার হাজার মানুষের কাতর প্রার্থনা মানত শুনতে শুনতে আর দুঃখ ব্যথা শোকের মুখগুলো দেখতে দেখতে এখন অনেকটা বুঝতে পারে কার ভিতরে কি যন্ত্রণা। যে মা ছেলেকে যম-দোর থেকে ফেরাবার প্রার্থনা বা মানত নিয়ে আসে আর যে লোক মামলা জেতার আরজি নিয়ে আসে—তাদের মুখের ভাব কি এক রকম হয়? আর ওর বিশ্বাস, মা-কালী বা বড়পীর বা বিবি-মা অথবা জয়চণ্ডী মা অনেক সময় ওকে চোখে আঙুল দিয়ে অনেক কিছু দেখিয়ে দেয় বা বলে দেয়—অবশ্য যখন ও খুব মন দিয়ে তাদের ডাকে। ওর বুদ্ধি পরামর্শগুলোও জল-ভাতের মতো সহজ সরল, তাইতেই উপকার পেয়ে অনেকের তাক লেগে যায়। ও বলে, অবাক হবার কি আছে, বুনো ওল খেয়ে গলা ফুললে তাকে তেঁতুল গুলে খেতে বলব না তো কি রসগোল্লা খেতে বলব?

মেয়েটির কথা বলতে বলতে ঘোষ সাহেব মুডে এসেছেন বুঝতে পারছি। আমার আগ্রহ বুঝলে পাছে নিজেকে গুটিয়ে নেন তাই একটু হেসে নির্লিপ্ত সুরে বললাম, আপনি এত বড় একজন পুলিশ অফিসার আর মেয়েটি আপনাকে বড়বাবু বলে ডাকেন?

—আর বলেন কেন, হেসেই জবাব দিলেন, আমি তখন জয়নগর থানার ও. সি—ও. সি-কে বড়বাবুই বলে সকলে, ওর ধারণা বড়বাবুর

থেকে বড় আর কে? অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার ডেপুটি কমিশনারের থেকে এখনো ওর কাছে বড়বাবুই বড়। আরো মজা, ওর মুখে বড়বাবু ডাকটাই আমার মিষ্টি লাগে। কোয়ার্টার্স-এ থাকতে আমার মেয়ে দুই একবার ওকে শুধরে দিতে চেষ্টা করে বলেছে, তুমি সেই বড়বাবু ধরে আছ কেন মাসি—আমার বাবা যে এখন বড়বাবুর থেকেও ঢের বড়। না বুঝে ও বোকার মতো আমার দিকে তাকাতো, আমার চোখ টেপা বা ইশারা থেকে ও বুঝে নিয়েছে মেয়ে ঠাট্টা করছে।

মেয়েও ওই একজনের পরিচিত এবং মাসি বলে ডাকে শুনে একটু স্বস্তি বোধ করতে চেষ্টা করলাম। শুনলে যদিও আমার উল্টোমুখো বাড়ির অমর গাঙ্গুলী আরো বেশি মুখ মচকাবেন, বলবেন, মেয়ের মাসি অর্থাৎ ভদ্রলোকের পাতানো শালী সম্পর্কটা আরো রসঘন হতে বাধা কোথায়?

বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি। আর কোনোরকম ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে বললাম, সার্জনের সঙ্গে কনট্যাক্ট করতে পারলে জানাবো। যে-মেয়ের তাগিদে সার্জন দেখাবার সংকল্প তার সম্পর্কে এখনো কিছুই জানি না। অথচ একটু উতলা যে হয়েছি নিজেই টের পাচ্ছি। এটা কোনো অন্ধবিশ্বাসের কারণে নয়।···অংশুমান ঘোষ বিজ্ঞানের ছাত্র, তার ওপর পুলিশের নার্ভ। তাঁর চাকরি জীবনের যে দুটো ঘটনা আমি গল্পে টেনে এনেছি তা অপরাধী জীবনের বুকের তলার ভিন্ন ছবি, কিন্তু ওই দুর্ধর্ষ চতুর অপরাধীদের নাগাল পাওয়া সম্ভব হয়েছিল কেবল তেমনি ইস্পাতকঠিন স্নায়ু আর প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির জোরে। সেটা নিজে তিনি জাহির করেননি, কিন্তু আমার অনুভব করতে অসুবিধে হয়নি। এই মানুষই একটি অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ের অঙ্গুলি নির্দেশ পেয়ে বিচলিত একটু হয়েছেন সন্দেহ নেই। নিজের ছেলেমেয়ে বা জামাই ও-কথা বললে তিনি কানেও নিতেন না হয়তো।

অংশুমান ঘোষের শোবার ঘরে বসে প্রথম দিনের আলাপের কিছু কথা আমার কানে লেগে আছে। বলেছিলেন, মাঝ বয়েস পর্যন্ত

মনেপ্রাণে উনি পুলিশই ছিলেন, অনেক নিষ্ঠুর কাজ অনায়াসে করে গেছেন, কর্তাদের অবিবেচনায় মন মেজাজ যখন খুব খারাপ সেই সময় একটা ঘটনা আর বিশ্বাসের এক আশ্চর্য নজির দেখে তাঁর ভিতরে কি-রকম নাড়াচাড়া পড়ে গেল আর সেই থেকেই মনে জিজ্ঞাসার উৎপাত শুরু হল। সেই ঘটনা আর বিশ্বাসের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে তৎক্ষণাৎ ধামা-চাপা দিয়েছিলেন আর রসিকতার সুরে বলেছিলেন পুলিশ অফিসার চাকরি থেকে রিটায়ার করলেও তার এক্সহিউমড্ হবার ভয় থাকে। এখন আমার বদ্ধ ধারণা সেই ঘটনা আর বিশ্বাসের আশ্চর্য নজিরের সঙ্গে এই গ্রাম্য মেয়েই যুক্ত, এরই কারণে অংশুমান ঘোষের মতো দাপটের পুলিশ অফিসারের এই পরিবর্তন, তাঁর মনে অনন্ত জিজ্ঞাসার তৃষ্ণা।

বাড়ি ফিরে কতগুলো শব্দ আমার মাথায় ঘুর পাক খেতে লাগল। কপালী বাবার জংলী কালী...শ্মশান কালী...বড় পীরের মাজার... বিবি মায়ের থান...জয়চণ্ডীর মন্দির। এগুলো সব কোথায়? জয়নগর বা তার কাছাকাছি কোথাও হতে পারে। কারণ ঘোষ সাহেব যখন জয়নগর থানার ও. সি. সকলে তাঁকে বড়বাবু ডাকত, আর সেটাই সব থেকে মর্যাদার ডাক জেনে এই মেয়েও তাই বলে।...সেই তল্লাটের মেয়ে হলে মোটরে কলকাতায় যাতায়াতে কম করে আড়াই ঘণ্টার পথ। হীরু ওকে সেখান থেকে নিয়ে আসে দিয়ে আসে।

সার্জনের সঙ্গে সেই সন্ধ্যাতেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলাম। গোপন রাখার তাগিদে নিজের ড্রাইভারও নিলাম না। কারণ দু'বাড়ির দুই ড্রাইভারের সঙ্গে ইতিমধ্যে ভাব-সাব হয়ে গেছে। আমি চালাচ্ছি, ঘোষ সাহেব পাশে। সার্জন সম্পর্কেই আবার একটু খোঁজ নিলেন তিনি, কত বয়েস কত দিনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। জবাব দিয়ে তাঁকে আরো একটু নিশ্চিন্ত করার জন্য জানালাম, ফরেনের ডিগ্রিটিগ্রির জন্য বলছি না, এঁর থেকে বেশি আস্থা আর আমার কারো ওপর নেই, আমার একটি নিকট আত্মীয়ের কাঁধ আর ঘাড়ের ক্যানসার ইনি অপারেশন করে ভালো করেছেন।

হেসে উঠলেন।—নিশ্চিন্ত হলাম, গলা কেটে বাদ দিলেও ক্যানসারটা অন্তত সারবে।

না বলাই ভালো ছিল মনে হল।

সার্জন খুব যত্ন করেই পরীক্ষা করলেন। গত এক বছরের রিপোর্ট নিলেন। থ্রোট স্পেশালিস্টের প্রেসক্রুপশনগুলো দেখলেন। তারপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক মস্ত ফর্দ দাখিল করলেন। এক বড় প্রতিষ্ঠানের নাম করে নির্দেশ দিলেন, এগুলো সব করিয়ে আনুন, সবগুলো টেস্ট হতে আট-দশ দিন লাগতে পারে, তারপর আসুন।

সোজাসুজি জিগ্যেস করলাম, আপনার কি মনে হয় বলুন?

জবাব দিলেন, ঘাবড়াবার মতো কিছু না-ও হতে পারে, আবার এ-ও বলা উচিত নেগলেক্ট করা কোনো মতেই উচিত হবে না—আগে এই টেস্টগুলো সব করিয়ে আনুন।

ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে কাউকে জানতে না দিয়ে এ-পর্বও নির্বিঘ্নে সারা হল। ঘোষ সাহেব বার বারই বলেছেন, আপনার সময় নষ্ট পেট্রল নষ্ট, বড় বেশি জুলুম করা হয়ে যাচ্ছে।

শেষে বাধ্য হয়ে বলেছি, আপনি আর একবার একথা বললে আপনার ছেলেময়েকে জানাবো, তারাই দায়িত্ব নেবে।

একটু থমকে গিয়ে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, আমার মতো পুলিশ অফিসারকেও বেশ কড়া কথা শোনাতে পারেন দেখছি!

সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে আবার সার্জনের কাছে হাজির হবার পর আমাদের দুশ্চিন্তা আরো বাড়ল বই কমল না। রিপোর্টগুলো থেকে তিনি একজনের নাম করলেন যিনি সার্জন নন, কিন্তু এ-লাইনের নাম করা স্পেশালিস্ট ডাক্তার। একটা চিঠি লিখে রিপোর্টগুলো নিয়ে তাঁর কাছে যেতে বললেন। অর্থাৎ যা করার দু'জনে কনসাল্ট করে করবেন।

ফেরার সময় ঘোষ সাহেব হেসেই বললেন, সেধে কি-রকম জড়িয়ে পড়েছেন বুঝতে পারছেন? ব্যাপারখানা বায়োপসির দিকে গড়াচ্ছে—

মনটা সত্যি দমে গেছে। তবু জোর দিয়েই বললাম, এটা

করতেই হবে মনে হলে সার্জন আপনাকে সে-কথাই বলতেন, অন্য স্পেশালিস্টের কাছে ওপিনিয়নের জন্য পাঠাতেন না।

গাড়ি চালাচ্ছি। সামনের দিকে চোখ। তবু মনে হল ভদ্রলোক নিজের মনে হাসছেন। হঠাৎ বললেন, দেখুন মশাই, ওপিনিয়ন আমি মোটামুটি পেয়েই গেছি, গাড়ি না পাঠাতে রাধা .যদিন নিজে থেকে চলে এলো আর বলল, দেখতে ইচ্ছা করল তাই খরখর (পা চালিয়ে) চলি এলাম, আর তার পরেই গলার জন্য অন্য ভালো ডাক্তার দেখাবার হুকুম করে গেল, সেদিনই বুঝেছি ব্যাপার সুবিধের নয়। তখন অবশ্য একটু ধাক্কা খেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, এখন আর খুব একটা উদ্‌বেগ নেই—যা হবার হবে।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তার ওপর যখন আপনার এত বিশ্বাস, সময়ে চিকিৎসা করলে আপনি সুস্থ হবেন বলেই তিনি যেচে এসে এই ফতোয়া দিয়ে গেছেন।

—তা হবে!

জিগ্যেস করলাম, মেয়েটির নাম বুঝি রাধা ?

—হুঁ।

সামনের দিকে চোখ রেখে আবার বললাম, তাঁর মাথায় কাপড় দেখেছি, কিন্তু সিঁদুর-টিঁদুর চোখে পড়েনি। সধবা না বিধবা ?

রসিকতার সুরে জবাব দিলেন, একবার নয়, দু' দুবারের বিধবা, প্রথম বারে তেইশ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার সাতাশ বছর বয়সে, অরুচি ধরে না গেলে আরো এক আধবার হতে পারত, শুনেছি যাদের সাধ ছিল তারা কপালী বাবার খাঁড়ার ভয়ে পিছু হটেছে, ওকে আর বেশি উত্যক্ত করেনি।

আমার কান-মন সজাগ। কপালী বাবা নামটা আগেও শুনেছি। বিয়াল্লিশের রাধা যদি এই হয়, সাতাশের চেহারাখানা কল্পনায় আনতে চেষ্টা করলাম। বললাম, আপনার মুখে শুনেছিলাম আপনার জয়নগর থানার বড়বাবু ডাকটাই উনি এখনো ধরে আছেন, তার মানে জয়নগরের মেয়ে আর সেখানেই থাকেন ?

—ও যেখানে থাকে সে জায়গাটার নাম ছিল মাতন, জয়নগর আর বিষ্টুপুরের মাঝামাঝি একটা জংলা জায়গা, এখন একটু এ-দিকে হলে জয়নগর, ও-দিকে হলে বিষ্টুপুর—আশপাশের ওই সব জায়গাই জয়নগর থানার জুরিসডিকশনে। তারপর গম্ভীর গলার রসিকতা, এখন আমার চিকিৎসার জন্য দ্বিতীয় স্পেশালিস্টের কাছে যাবেন কি মাতনের রাধার কাছে, বেশ করে ভেবে নিন।

দ্বিতীয় স্পেশালিস্ট ভদ্রলোক আরো প্রবীণ। সব শুনলেন, নিজে পরীক্ষা করলেন, রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে পড়লেন। তারপর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করলেন। যথা, গ্রোথ্ যা পাওয়া যাচ্ছে তা বিনাইন কি ম্যালিগন্যান্ট না ট্রানজিটারি সেটা এখন পর্যন্ত ধরা যাচ্ছে না। বিনাইন হলে ভয়ের কিছুই নেই, ম্যালিগন্যান্ট বলেও তিনি ধরে নিচ্ছেন না, কারণ এক বছরের ওপর হয়ে গেল উপসর্গগুলো মোটামুটি একই রকম আছে, চিকিৎসায় বা শুশ্রূষায় কমছে বাড়ছে, কিন্তু এ-জন্যই আবার ট্রানজিটারি অবস্থার আশঙ্কাটা বাতিল করা যাচ্ছে না।

সাদা কথায় এই অবস্থার পরিনামও মারাত্মক হতে পারে। তাঁর মত আপাতত কিছুদিন চিকিৎসা করে দেখবেন, তারপর এই টেস্টগুলোই আবার করানো হবে—ফলাফলের কোনো তারতম্য হয় কিনা দেখার পর তিনি যা বলার বলবেন।

চিকিৎসা বলতে ইনজেকশন আর ওষুধ। তাই চলতে লাগল। ছেলেমেয়ে জানল তাদের রাধা মাসির পরামর্শে বাবাকে অন্য ডাক্তার দেখছে এবং সাধারণ চিকিৎসাই চলছে।

এরই মধ্যে পুজো এসে গেল। পনেরো বিশ দিনের জন্য সপরিবারে আমার বাইরে বেরুনোর প্রোগ্রাম ছিল। ভিড় এড়ানোর জন্য পুজোর দিন সাতেক আগে টিকিট বুক করা ছিল। ডাক্তারের এই ট্রিট্‌মেন্টের কোর্স শেষ হতেও আরোও তিন সপ্তাহ বাকি। তার মধ্যে ফিরে আসা যাবে। মনে বেশ একটু অশান্তি নিয়েই বেরুলাম। সেটা

টের পেয়ে ঘোষ সাহেব ঠাট্টা করেছিলেন, বলেন তো রোজ আপনাকে একটা করে টেলিগ্রাম করতে পারি।

এই এক অসুখের ব্যাপার শুনে মনের দিক থেকে দুজনেই কত কাছাকাছি এসে গেছি সেটা অনুভবের বস্তু। দিল্লি হয়ে আমার হরিদ্বারে যাবার কথা। বিজয়ার পর হরিদ্বারে বসে ঘোষ সাহেবের ছোট্ট একখানা চিঠি পেলাম। শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, নিজের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ, মানুষ কত সহজে আপনার জন হয়ে উঠতে পারে এটুকুও আমার জানতে বাকি ছিল। আমি বহাল তবিয়তে আছি, কিচ্ছু ভাববেন না।

লক্ষ্মী পুজোর দিন পাঁচেক পরে ফিরেছি। গাড়ি থেকে নেমে দেখি ঘোষ সাহেব সহাস্য বদনে তাঁর বারান্দায় দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতেই সানন্দে দু'হাত মাথার ওপর তুললেন। অর্থাৎ কেবল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন নয়, আমাকে নিশ্চিন্তও করতে চাইলেন।

গাড়ি থেকে মাল-পত্র নামানোর ফাঁকটুকুর মধ্যে লোক-চরিত্রের একটু ছোট প্রহসনের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে উঠলাম। গাড়ি থেকে আমি আমার বাড়ির ফুটপাথে নেমেছি। উল্টো দিকের দুই বাড়ির ওঁরাও যে লক্ষ্য করছেন জানি না। প্রথমে দোতলার অমর গাঙ্গুলী একরকম ছুটেই রাস্তা পার হয়ে এসে আমাকে বুকে জাপটে ধরলেন। কোলাকুলির ঘটা শেষ না হতে হাসি মুখে ও-পাশের দোতলার ভট্চায মশাই আর এক তলার রায় মশাইও হাজির। আরো দু'দফা কোলাকুলির ঘটা। যেন আমার ফেরার অপেক্ষায় ওঁরা দিন গুনছিলেন। সাড়ম্বর কুশল বিনিময় সেরে ওঁরা বিদায় নিতে আমি আর একবার আমার পাশের দোতলার দিকে তাকালাম।

ঘোষ সাহেব তাঁর বারান্দায় দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।

এমন প্রহসনের একটাই অর্থ। নিজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে তিনি যাকে মর্যাদা দিলেন, সেই আমি ওঁর এই অবহেলিত তিন প্রতিবেশীর কত অন্তরঙ্গ আপনার জন সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল।

সন্ধ্যার পরে জানান না দিয়ে তাঁর বাড়ির দোতলায় উঠে এলাম। বারান্দায় বসে টিভি দেখছিলেন। আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন।—আসুন, প্রায় দু'দিন ট্রেনের ধকল গেছে ভেবে হীরুকে পাঠাইনি, তবু মনে মনে খুব আশা করেছিলাম—আপনি ছিলেন না পাড়া একেবারে অন্ধকার, মানে সকালে রাস্তায় কোলাকুলির ঘটা দেখে তাই মনে হল।

আমিও হাসছি।

দু'পা এগিয়ে এলেন।—আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ একটা প্রণাম করি?

বাধা দিয়ে কোলাকুলি সেরে নিলাম।

—ওরে হীরু, টিভি বন্ধ কর, পুজোর পরে এলেন, তোর স্পেশাল কিছু আছে নাকি বার কর।

হীরুকেই বললাম, আর একদিন হবে, আজ শরীরের যুত নেই, এক পেয়ালা চা কেবল দিতে পারো।

শোবার ঘরে এসে বসলাম। আমি খাটে ঘোষ সাহেব ইজিচেয়ারে। কালীর ফোটোতে একশ আট জবার মালা। ধূপ-ধুনোর সেই পরিচিত গন্ধ। বাতাসে শুচি স্পর্শ।

—কেমন বেড়ালেন আগে বলুন।

অনেক বারের দেখা জায়গায় বেড়ানো। দু'চার কথায় ও-প্রসঙ্গ সেরে তাঁর খবর জিগ্যেস করলাম।

উনি জানালেন নতুন করে কিছু বুঝছেন না, একই রকম আছেন। গত কাল ট্রিটমেণ্টের কোর্স শেষ হয়েছে, স্পেশালিস্ট ডাক্তারকেও কালই ফোন করেছিলেন। তিনি একবার দেখতে চেয়েছেন, কি কি টেস্ট করতে হবে তা-ও লিখে দেবেন।

—কালই চলুন তাহলে?

—অত তাড়ার কি আছে, দুই একদিন বিশ্রাম করে নিন ···

—বিশ্রাম নেবার মতো কোনো পরিশ্রম আমার হয়নি, কালই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট পান কিনা ফোন করে দেখুন।

—আচ্ছা করব। হাসছেন।—আমার চিঠি পেয়েছিলেন?

মাথা নাড়ালাম, পেয়েছি।···উনি লিখেছিলেন, নিজের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ, মানুষ কত সহজে আপনার জন হয়ে উঠতে পারে এটুকুও জানতে বাকি ছিল। হেসে এ-প্রশ্নটা করে সেই অনুভূতিটুকুই আবার ব্যক্ত করলেন। জিগ্যেস করলাম, সেই মেয়েটি মানে রাধা এর মধ্যে এসেছিলেন?

—গাড়ি পাঠিয়ে ছ'দিন আনিয়েছিলাম, সপ্তমীর দিন আর বিজয়ার দিন। ওই ছ'রাত এখানেই ছিল, ভিড়ে বিকেলে আর গাড়িই বার করা যায়নি।···তবে অসুখ নিয়ে কথা বলার ফুরসৎ মেলেনি, ওই ছ'রাত মেয়ে বউমা আর নাতি নাতনিরাও এখানেই ছিল, বাড়ি জমজমাট, কেবল যাবার আগে যা ছ'চার কথা হ'ল—

জম-জমাট বাড়িতে সেই মেয়ে এসে ছ'রাত ছিল শুনে আমিই যেন সামনের তিন প্রতিবেশীর আর এক দফা কাদা ছোঁড়ার হাত থেকে বাঁচলাম। কি ছ'চার কথা হল শোনার আগ্রহ। ঘোষ সাহেব হাসি মুখেই সেটুকু শোনালেন।···বউমা উর্মিলা আর মেয়ে শমী ছেলেমেয়ে নিয়ে তার খানিক আগেই চলে গেছে। যাবার জন্য তৈরি হয়ে রাধা তাঁর কাছে এসে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক প্রস্থ দেখে নিয়ে জিগ্যেস করল, এই চিকিচ্ছেয় একটু ভালো বোধ করছ? ঘোষ সাহেব বিশ্বাসযোগ্যভাবেই মাথা নেড়েছেন, ভালো বোধ করছেন। রাধা আরো এগিয়ে এসে নিজের হাত ছ'খানা তাঁর গলার চার দিকে বোলালো, তারপর সেই ছ'হাত মায়ের ছবির ওই পায়ে রেখে স্থির হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে রইলো। ব্যাপারখানা কি হল বুঝতে পেরেছেন?

—কি?

—আমার সব বালাই মায়ের পায়ে জমা করে দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, বেশি ভেব-টেবনি বড়বাবু—

ভাবলাম এটুকুতেই শেষ। কিন্তু ঘোষ সাহেব আমার দিকে চেয়ে যে-ভাবে টিপটিপ হাসছেন, মনে হল আরো কিছু শুনতে বাকি।

তাই। নিজে থেকেই বললেন, ওর মনে কি আছে বোঝবার জন্য হঠাৎ আপনাকেই টেনে আনলাম। বললাম, আমি খুব ভাবছি-

টাবছি না, কিন্তু বাইরে বেড়াতে বেরিয়েও আর এক ভদ্রলোক আমার জন্য ভেবে সারা হচ্ছেন।...তখন আপনার কথা এসেই গেল।

আমি উৎসুক।

—শুনেই মশাই বিরক্ত কেবল নয়, রাগ রাগ ভাব। বলল, চিকিচ্ছে করাতে বলেছিলাম করাচ্ছ—ফুরিয়ে গেল, পাঁচ কান করার কি দরকার ছেল তোমার?

চেয়ে আছি।

ঘোষ সাহেব তেমনি হাসছেন। তখন চিঠিতে আপনাকে যা লিখেছিলাম ওকেও তাই বলতে একেবারে ঠাণ্ডা। বলল, ভালো বন্ধু মেলা তো ভাগ্যের কথাই, কিন্তু মেলে কই।

ডাক্তারকে ফোন করার কথা আবার মনে করিয়ে দিয়ে নেমে এলাম। ভিতরের অস্বস্তি প্রকাশ করার নয়। মনে ডাক দিয়েছিল বলেই রাধা অন্য ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করানোর তাগিদ দিয়েছিল। আমরা কতদূর কি করেছি সে জানেও না। কেবল জানে অন্য ডাক্তার দেখানো হয়েছে, চিকিৎসাও হচ্ছে। কিন্তু সেটা পাঁচ কান হবার ব্যাপারে আপত্তির একটাই কারণ। কেউ কিছু না বললেও রোগ সম্পর্কে এখনো তার মনে কিছু জটিলতার আশংকা থিতিয়ে আছে।

একরকমই আছেন স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে ঘোষ সাহেব ফোনে আগেই জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফা পরীক্ষা করে তিনি ভরসা বা ভয়ের কোনো কথাই বললেন না। দুই একটা বাদ দিয়ে আগের টেস্টগুলোই আবার করিয়ে নেবার নির্দেশ লিখে দিলেন। তফাৎ কিছু হল কিনা এই রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে।

আট-দশ দিন বাদে সব রিপোর্ট নিয়ে আবার আমরা এক সন্ধ্যায় তাঁর কাছে উপস্থিত। আগের আর পরের রিপোর্ট মিলিয়ে ছোট মন্তব্য করলেন, না, একইরকম আছে দেখছি।

আমি আশান্বিত, তার মানে বিনাইন?

মাথা নাড়লেন।—মনে হয় ন, এ দু'মাসের চিকিৎসায় রিপোর্ট-গুলোর পিকচার ঠিক এক রকম হবার কথা নয়, আর উনিও আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো বোধ করতেন।

ঠাণ্ডা মুখে ঘোষ সাহেব জিগ্যেস করলেন, এখন তাহলে বায়োপসি ছাড়া আর কিছু করার নেই?

আবার মাথা নাড়লেন।—দেখুন আপনার কিছু টাকার জোর থাকলে আমি এখনই কাটা-ছেঁড়ার বা ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে যেতে রাজি নই…বম্বের টাটা জশলোক হসপিটাল থেকে বিনা বায়োপসিতে গ্রোথ টেস্ট করে আনতে পারেন, ওখানে ছাড়া এ-দেশে আর কোথাও ওই টেস্ট করার ব্যবস্থা নেই।

দু'জনেই উৎসুক আমরা। জিগ্যেস করলাম, কি টেস্ট ওটা?

—নাম বললে বুঝতে পারবেন না, বিরাট ল্যাটিন নাম—ধরুন অনেকটা ই. সি. জি'র মতো, হাইলি কম্পিউটারাইজড্ ইলেক্ট্রো-গ্রাফিক মেথডে এটা করা হয়, এর রিডিং থেকে বোঝা যায় গ্রোথ বিনাইন কি ম্যালিগন্যাণ্ট অথবা মাঝামাঝি কিছু।…আপনাদের বলেই দিই, রিডিং যদি একশ চল্লিশ ইউনিটের মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে ওটা বিনাইন—ভাবনার কিছু নেই, একশ পঁয়তাল্লিশ পর্যন্তও ইগনোর করা চলে, আবার একশ ষাট হলে ধরে নিতে হবে ডেফিনিটলি ম্যালিগন্যাণ্ট আর একশ পঁয়তাল্লিশ থেকে একশ উনষাট হল ট্র্যান-জিটারি স্টেজ—যত বাড়বে ততো ম্যালিগন্যানসির সম্ভাবনার দিকে যাচ্ছে ধরে নিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

ঘোষ সাহেব ঠাণ্ডা মুখেই জিগ্যেস করলেন, এটা সিওর টেস্ট?

—বায়োপসির থেকে বেশি ছাড়া কম সিওর নয়।

—বম্বে গিয়ে এই টেস্টের রেজাল্ট পেতে কিরকম সময় লাগবে?

—হসপিটালের দিক থেকে কোনো অসুবিধে না থাকলে আপনি দু'দিনের মধ্যেই রেজাল্ট নিয়ে চলে আসতে পারেন।…এখান থেকে অ্যাডভাইস আর টেস্ট রিপোর্টগুলো নিয়ে যেতে হবে, সেই সঙ্গে ওখানকার একজনকে একটা পারসোনাল চিঠিও দিতে পারি।

ঘোষ সাহেবকে একটু চিন্তাচ্ছন্ন মনে হল। জিগ্যেস করলেন, ধরুন আমি যদি দিন দশেক পরে যাই···তাহলে কি ক্ষতি হবার সম্ভাবনা?

—কিছু না কিছু না, এক বছরের ওপর এভাবে আছেন, দশ পনেরো দিনে আর কি ক্ষতি হবে।···তবে এ-সব ব্যাপারে খুব একটা দেরি না করাই ভালো।

ঘোষ সাহেব জানালেন তিনি ঠিক দশ দিন পরেই যাবেন, সেই অনুযায়ী উনি যেন অ্যাডভাইস আর চিঠিটা লিখে রাখেন।

চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছি। আমার ভিতরটা উদ্বেগে আচ্ছন্ন। একটু বাদে ঘোষ সাহেব বেশ হালকা গলায় বললেন, গোপনতার পাট শেষ তাহলে···কিন্তু আমি দমে যাচ্ছি কেবল মেয়েটার কথা ভেবে, একেবারে বাচ্চা বয়েস থেকে ও আমার মা হয়ে বসে আছে, ভয়ে দুশ্চিন্তায় আধ মরা হয়ে যাবে।

প্রায় আধা-আধি পথ পেরিয়ে এসে আমি মুখ খুললাম। বললাম, যদি চার আনা মিথ্যে আর বারো-চৌদ্দ আনা মিথ্যের মধ্যে কোনো তফাৎ না ধরেন আমার মনে হয় এখনো ওদের কিছু না বলাই ভালো, কাউকে কিছু না জানিয়ে আপনাকে বম্বে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমি নিতে পারি—

উৎসুক মুখে আধা-আধি ঘুরে বসলেন প্রায়।—কি করে?

কি করে বলতে উনি নির্বাক খানিক। কাউকে জানতে বুঝতে না দেবার এমন সহজ রাস্তাও থাকতে পারে সেটা তাঁর অবশ্য কল্পনা করার কথাও নয়। হাত তুলে আমার কাঁধে দু'বার মৃদু চাপ দিলেন। কৃতজ্ঞতা জানাবার আর কোনো ভাষা নেই। বললাম, কোন্ সময়ে ছেলেমেয়ের সামনে আপনি কথাটা তুলবেন সেটা পরে ঠিক করা যাবে, এখন বলুন তো আপনি মাঝখানে দশ-দশটা দিন সময় নিলেন কেন?

—আপনাকে বলা হয়নি, কাল পরশুর 'মধ্যেই বলতাম, আর ঠিক ছ'দিন বাদে কালীপুজো, আট বছর ধরে এই পুজোটি আমার বাড়িতে

হয়ে আসছে…আমি করছি বললে ঠিক হবে না, আমাকে দিয়ে করানো হচ্ছে।

আমি বেশ অবাক।—রাধা করাচ্ছেন?

—আর কে…। তবে আলাদা কোনো মূর্তি এনে পুজো নয়, আমার ঘরে কালীর যে বড ফোটোখানা দেখেন, তাকেই বেদিতে বসিয়ে পুজো—এও ওই মেয়েরই বিধান, বলে সবই এক, আলাদা মূর্তি গড়িয়ে কি হবে? আর অমুক সময় তমুক সময় বা মাঝ রাত্তির পুজো—এ সবও নেই, আমাদের পুজো রাত এগারোটার মধ্যেই শেষ—ও অবশ্য সমস্ত রাত ধরেই পুজো করে।

…আট বছর ধরে পুজো চলছে মানে অংশুমান ঘোষ তখন ও. সি'র থেকে বড় পোস্টে। এই মানুষকে কালীপুজোয় নামিয়েছে। মেয়েটার ক্ষমতা আছে বলতে হবে। আর এ-পুজো এখন ভদ্রলোকের কাছে এমনই ব্যাপার যে গলার রোগের সঙ্কটও তার পরের ভাবনা। আমার স্নায়ু জুড়ে সেই পুরনো কৌতূহল, এই মেয়ের কি ঘটনা আর বিশ্বাসের নজির দেখে ভদ্রলোকের এ-রকম পরিবর্তন।

জিগ্যেস করলাম, বেশ ঘটা করে পুজো নাকি?

—আগে তাই হত, রাধার আবার এ পুজোয় ঘটা পছন্দ…কিন্তু মুশকিল কি জানেন মশাই, লোকে ভাবে ব্যাটা পুলিশের চাকরিতে কত পাপ করেছে ঠিক নেই, যার ফলে এখন পুজো করে দোষ কাটানোর চেষ্টা—তবু লোকজন হয় কিছু, রাধার সঙ্গে দু'চারজন আসে, মেয়ে আর ছেলের শ্বশুর বাড়ির সব আসেন, ভক্তিশ্রদ্ধা আছে এমন আরো দু'পাঁচজনকে বলি, এবারে আপনি আছেন, আপনার বাড়ির সকলকেও আনতেই হবে—আমি নিজে গিয়ে বলে আসব। আমার মনে হয় আপনার ভালো লাগবে।

তাঁর অগোচরে গাড়ির গতি অনেকটাই কমিয়ে দিলাম। বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি, মনে যা আসছে ভদ্রলোকের মানসিক অশান্তির মধ্যে সেটা বলব কি বলব না সেই দ্বিধা। আঁড়চোখে এক-বার দেখে নিলাম। মনে হল কালীপুজোর নামে আপাতত রোগের

চিন্তা ভুলে গেছেন।

—ইয়ে, পাড়ার আর কাউকে বলবেন না?

ভদ্রলোক কত চতুর সেটা তাঁর পরের কথা থেকেই বোঝা গেল। আমার প্রশ্ন শুনে ঘুরে একটু দেখে নিলেন। তারপর হেসে বললেন, আপনার কাছে আমার ঋণের পাহাড় জমছে, আমাকে আর একটা ভুলের হাত থেকে বাঁচালেন। এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসার পর থেকে আপনার ওপর আমি যেভাবে দখল নিয়ে চলেছি তাতে প্রতিবেশীদের কাছে আপনাকে অপ্রস্তুত হতে হয় কিনা এ-চিন্তা আমার মাথায় আসা উচিত ছিল। নিশ্চয় করব। ভদ্রলোকদের নিজে গিয়ে কর্তাদের বলে আসব, আর বাড়ির সকলকেও নেমন্তন্ন করতে মেয়ে বা বউমাকে পাঠাবো—

তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম, অত দরকার নেই, শুধু ভদ্রলোক ক'জনকে বললেই হবে—

—থামুন তো মশাই, হেসেই দাবড়ানির সুরে বললেন, আপনার প্রেস্টিজ এখন আমার নিজের প্রেস্টিজের থেকেও ঢের বড়, আপনি একটুও ইতস্তত করবেন না।

এ-ভাবে বলা সত্ত্বেও বিব্রত বোধ করছি। যে-যে কারণে এ-ব্যাপারে আমার নাক গলানো তা ব্যক্ত করার নয়। বললাম, প্রেস্টিজের কোনো ব্যাপার নয়, এঁরা আপনাকে একটু দাম্ভিক ভাবেন সেটা আমার পছন্দ নয়।

—আপনার পছন্দ না হলে কি হবে, ঠিকই তো ভাবেন। এত মাস হয়ে গেল রিটার্ন ভিজিট দেবার ভদ্রতাটুকুও স্বীকার করিনি, আমাকে দাম্ভিক ভাববেন না তো কি বিনয়ী বোষ্টম ভাববেন?

হেসে ফেললাম।—তাহলে এমন জ্ঞানপাপীই বা হতে গেলেন কেন?

অসুখ-টসুখের চিন্তা আপাতত উবেই গেছে মনে হয়। হাসছেন। —তাহলে সত্যি কথাটাই আপনাকে বলি, পুলিশের লোক তো, এখানে আসার এক মাসের মধ্যে কে কি লোক আর কোন্ ভাবের

লোক ঘরে বসেই সেটা আমার জানা হয়ে গেছে—আর স্বভাবখানাও তেমনি হয়েছে এখন, মন না টানলে লোক-দেখানো গলাগলি আর করতে পারিনে।

কথাগুলো ভালো লাগছে, তাই আমার নাক গলানোটা আরো খারাপ লাগছে। বললাম, তাহলে এখনো বাদ দিন—

—ফের এই কথা! রাগত মুখ।—আমাব ভুলটা শুধরেছেন বলে আমি কত খুশি বুঝতে পারছেন না?

পরদিন সকালে হাঁক-ডাক করে সাড়া দিয়ে অংশুমান ঘোষ হাজির। আমার স্ত্রীকে ডাকিয়ে বাড়ির সকলকে এমন কি কাজের লোকদেরও নেমন্তন্ন করলেন। বললেন, আমি বলে গেলাম, এরপর মেয়ে এলে তাকেও পাঠাব—

জোরালো গাম্ভীর্যে বলে উঠলাম, তাহলে নেমন্তন্ন নট অ্যাক-সেপ্টেবল হয়ে যাবে, আপনি আপনার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডেকে নেমন্তন্ন করলেও আমরা দল বেঁধে যাব।

—থ্যাংক্ ইউ। বউঠান এবাব আমাদের চা পাঠান।

স্ত্রী চলে যেতে উনি পকেট থেকে এক গোছা একশ টাকার নোট বার করে বললেন, আমার দ্বারা তো হবে না, আপনি প্লেনের দু'খানা টিকিট কেটে ফেলুন—ডেট ওপেন রেখে রিটার্ন টিকিট করে নেওয়াই ভালো।

বিব্রত মুখে বললাম, বেড়ানো ছাড়া হয়তো সত্যি কিছু কাজও করে আসতে পারব—আপনার টিকিটের টাকাটাই শুধু দিন।

পুলিশের গরম চোখ দেখার সুযোগ কমই হয়েছে। ঠায় চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর বেশ ধীর মোটা গলায় বললেন, এসময় আপনাকে খোয়ানো মানে আমার দিক থেকে কতটা খোয়ানো সেটা জেনেও আপনি আমাকে সেই দিকে ঠেলবেন নাকি?…আপনি যাবেন কি যাবেন না সেটাই আগে ভেবে ঠিক করুন তাহলে।

তাড়াতাড়ি হাত বাড়ালাম।—ঠিক আছে দিন, কিন্তু অত খরচ

করে প্লেনে যাবার কি দরকার? তাড়া তো কিছু নেই, ট্রেনে ফার্স্টক্লাসে গেলেই তো হয়?

- না মশাই, এখন পুজোর মেজাজে আছি, তারপর আর সইবে না, তাছাড়া আপনার প্ল্যানেও ফাঁক থেকে যাবে···আপনার ফিল্ম প্রোডিউসাররা আপনার জন্য প্লেনের ভাড়া গোনে না ট্রেনের? হাসতে লাগলেন, আর একটা ব্যাপার কি জানেন, আমার লেট্ ফাদার তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য এতই জমিয়ে রেখে গেছেন যে পরের দু'পুরুষ কিছু না করেও পায়ের উপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারত···কিন্তু ভদ্রলোক যত বড় চাকরিই করুন সাদা রাস্তায় অত টাকা হয় না, আমরা দু'দশ বার প্লেনে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরলেও সেই বিত্ত খুব বেশি হালকা হবে না···তবু যতটুকু হয় ততটুকুই হালকা বোধ করব।

দিরুক্তি না করে টাকাগুলো নিলাম। হেসে বললাম, বাপ না পারুক ছেলে তো এ ব্যাপারে পুলিশের মুখ কিছুটা উজ্জ্বল করেছেন —

চা আসতে পর-পর কয়েকটা চুমুক দিলেন, কৌতুকে টুপুটুপু দুই চোখ আমার মুখের ওপর। যেন ভারি একটা মজার কথা শুনলেন। পেয়ালা রেখে জিগ্যেস করলেন, লেখকদের মতে অপ্রাপ্য প্রশংসা হজম করে গেলে কতটা অপরাধ হয়?

আমি অপ্রস্তুত একটু।

বাকি চাটুকু শেষ করে হৃষ্ট মুখেই বললেন, আমি যতটুকু সাধু এখন তার সবটাই গুঁতোর চোটে।···বাবার থেকে টাকার খাঁই আমার একটুও কম ছিল না, সুযোগ পেলে দু'হাতে টাকা খেয়েছি। তারপর কি যে হয়ে গেল, এই বিজ্ঞানের যুগে আপনি সেটা বিশ্বাস করবেন কি করে? টাকা চাইতে গেলে বা নিতে গেলে কোথা থেকে যে বাতাসে স্পষ্ট নিষেধ ভেসে আসত আপনি ভাবতে পারবেন না। বড়বাবু এটি কোরো না। বড়বাবু এটি ভালো হচ্ছে না। বড়বাবু লোভের আস্কারা দিও না, বিদেয় করো বিদেয় করো। এ এক

আশ্চর্য নিষেধ মশাই! তা সত্ত্বেও দুই একবার নিইনি এমন নয়, আর তারপরেই যেন দম-বন্ধ করা এক বিষাদের খুপরির মধ্যে ঢুকে গেছি, কাঁধ থেকে আঙুলের হাড় পর্যন্ত যন্ত্রণা—সবই সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার এ আমিও জানি, কিন্তু আমার তো এমন হবার কথা নয়! শেষে আমার স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে এমন টাকা আর ছোঁব না।...সেই মহিলা এই মেয়েটাকে কি চোখে যে দেখত, বদলি হয়ে অন্যত্র চলে আসার পরেও ছুটে ছুটে ওর কাছে চলে যেত, একবার ধরে আনতে পারলে সহজে ছাড়তে চাইতেন না। মৃত্যুর আগে আমাকে নয়, ওরই হাত ধরে বলে গেছল, সব রইলো, দেখিস—

এই মানুষ আমার চোখে আর জাঁদরেল পুলিশ অফিসার নন। ভাবের আবেগে মনের গ্লানি ধুয়ে ফেলতে পেরেছেন এমন একজন স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন মানুষ।

পরের দু'দিন কেবল হীরু দাসের ছোটাছুটি আর ব্যস্ততা লক্ষ্য করলাম। বাঁশ এলো, ত্রিপল এলো, ছাদে রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা। কেটারার নয়, ঠাকুর এসে রান্না করবে। বাজার করার দায়িত্ব দেবব্রত অর্থাৎ জামাইয়ের ওপর, সঙ্গে হীরু থাকবে। পাড়ার ইলেকট্রিসিয়ানের সঙ্গে আমিই যোগাযোগ করে দিলাম। দীপাবলীর রাত, দোতলার ছাদ পর্যন্ত আলো দিয়ে সাজানো হবে। বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘোষ সাহেবের মেয়ে শমী আর উর্মিলাকে প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি ঢুকতে আর বেরুতে দেখেছে। তার আগে ভদ্রলোকদের নেমন্তন্ন ঘোষ সাহেব সেরে এসেছেন নিশ্চয়। তাঁরা কতটা অবাক হয়েছেন বা কি ভাবছেন তা নিয়েও

তেমন আনন্দ বা উ

ভদ্রলোকের মাথার

কাঁটার মতো খচখচ কা

আগের সন্ধ্যায়

নাতনিরা সকালেই এ

কোন্ গল্প? ওরা তো আপনার ক'টা ভালো ভালো গল্পের সর্বনাশ করেছে, ট্র্যাজেডিকে কমেডিতে ঘুরিয়ে দিয়েছে—

ঢোঁক গিলে জবাব দিলাম, ওদের একটা আইডিয়া নিয়ে আলোচনা, পছন্দ হলে লিখে দেব।

বউমা উর্মিলার মন্তব্য, সে-ও ভালো, অমন সুন্দর গল্পগুলোকে উল্টেপাল্টে দিলে এতে খারাপ লাগে—

—আপনার প্লেনে আসা যাওয়া হোটেলে থাকা খাওয়া সব খরচ ওঁদের? শমীর জানার আগ্রহ।

বললাম, এ-সব খরচ ওঁদের কাছে কিছুই না।

—অন্য যে-সব ছবি হয়েছে, আপনাকে যেতে হয়েছে।

—একবার ছেড়ে দু'তিন বারও যেতে হয়েছে?

—বেশ মজা তো···কিন্তু ওদের আইডিয়া মানে তো মারামারি রক্তারক্তি কাণ্ড, আপনি কি সেই গল্প লিখবেন নাকি?

এ প্রসঙ্গ থামলে বাঁচি। বললাম, আমি কোন্ ধাঁচের লেখক ওরা জানে, সে-রকম আইডিয়া হলে আমাকে ডাকত না। কিছু মনে পড়তেই যেন ঘড়ি দেখলাম আর সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম, এক ভদ্রলোকের আসার কথা আছে, চলি—

সঙ্গ দেবার অছিলায় ঘোষ সাহেবও উঠলেন। নিচে নেমে ঠাট্টার সুরে বললেন, আপনি যে ফার্স্ট রাউণ্ডেই ঘেমে গেলেন দেখছি, ফাইন্যাল রাউণ্ডে কি করবেন?

হেসে জবাব দিলাম, আপনি যে জার্সিটা গায়ে চড়ানোরও সুযোগ দিলেন না···তা ছাড়া এমন সত্যি কথাগুলো একেবারে পুজোর ঘরের প্রতিমার সামনে বসে।

হাসতে লাগলেন।—আমি কে বলুন, সকলি তোমার ইচ্ছে, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি···আঃ, জাস্ট দি রাইট প্লেস ফর এ ভেরি ভেরি অনেস্ট লাই।

জয় হর, মনোরমা জয় শিবরানী
জয় দুর্গা জয় কালী মা ভবানী।
জয় মহাকালী তারা জয় মা ষোড়শী
জয় মা ভুবনেশ্বরী ত্রিতাপ নাশিনী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা
মাতঙ্গী কমলা দুর্গতিনাশিনী
জয় হর মনোরমা জয় শিবরানী।

দেয়াল ঘেঁষা বেদীর ওপর কালীর ফোটোখানা বসানো হয়েছে। তারপর এতবড় ঘরে তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে পূজার উপকরণ। ধূপ-ধুনো আর ফুলের গন্ধে বাতাস ভরপুর। পূজারীর আসনে রক্তাম্বর বসনে যে মানুষটি বসে তিনিই কপালী বাবা। রোগা লম্বা, বুক-পিঠ সমান কাঁচা পাকা চুল দাড়ি। বয়েস ষাট হতে পারে আশিও হতে পারে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, দুই বাহুতে রুদ্রাক্ষের বলয়, কপালে সিঁদুর লেপা। পুজোর আসনে পাথর মূর্তির মতো বসে আছেন। তাঁব বাঁ দিকের আসনে বসে রাধা, স্নান-সারা ভিজে চুল পিঠে ছড়ানো। পরনে গরদের থান, গায়ে শেমিজ। আসনে বসার আগে ঘণ্টাখানেক ধরে তাকে লক্ষ্য করছি। এত কাছ থেকে বয়েস আব সাতাস আঠাশ মনে হয় না, বিয়াল্লিশও মনে হয় না তা'বলে। তেত্রিশ চৌত্রিশ ভাবা যেতে পারে। কাছ থেকে দেখে সব থেকে ভালো লেগেছে তার চোখ দুটো। প্রথম যখন দেখি, স্বচ্ছ টলমলে। ঘোষ সাহেব আলাপ করিয়ে দিতে সোজা যখন মুখের দিকে তাকালো, মনে হল আমারও অজানা অন্তঃপুরে ঘুরে এলো। অথচ বড় স্নিগ্ধ আর ঠাণ্ডা সেই দৃষ্টি। তারপর যত দেখছি মনে হয়েছে সে যেন সকলের মধ্যে থেকেও নেই, ভাবের ঘোরে সকলের কাছ থেকেই দূরে সরে যাচ্ছে।

তার পাশে একটি মেয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে, ও-পাশে আর একটি মেয়ের হাতে দুটো কাঠের খঞ্জনি। হঠাৎ সকলকে চমকে কপালী বাবা তিন বার রব তুললেন, কালী! কালী! কালী!

হল্‌ঘর সামনের ঘর আর বারান্দা মেয়ে পুরুষে ঠাসা। কপালী বাবার ডান পাশের দুটি মেয়ের হাতে শাঁখ আর ঘণ্টা বেজে উঠল। তারা থামতেই দেখা গেল আসনে বসে রাধা অল্প অল্প ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। পাশের মেয়ে হারমোনিয়ামের রিড চেপে একটা টানা সুর ধরে রাখল, খঞ্জনির মৃদু ধ্বনি উঠল।

তারপর রাধার ওই গান, জয় হর-মনোরমা জয় শিবরানী, জয় দুর্গা জয় কালী জয় মা ভবানী···।

গানও নয়, টানা সুরের স্তবও নয়, কিন্তু এমন কিছু যা দেহের কণায় কণায় রোমাঞ্চ তুলে মনের গভীরে এসে স্থির হয়। নিটোল মিষ্টি গলা, সুরের কুশলী বিন্যাস নেই, আছে কেবল আবেগ-বিহ্বল বিশ্বাসের জয়ধ্বনি তুলে ঘরে বাইরে বারান্দায় যে-যেখানে আছে তাদের মনগুলোকে জড়ো করে এই ষড়ৈশ্বর্যের বেদীমূলে আকর্ষণ করার সহজ মহিমা।

এবারে রাধা নিশ্চল। কপালী বাবার দেবী-পূজা শুরু। তাঁর পূজায় কণ্ঠস্বর নেই, বাণী নেই, মন্ত্র নেই। থাকলেও সেটা দর্শকের কানে অশ্রুত। এক একরকমের হাতের মুদ্রা আঙুলের মুদ্রা, পটের পায়ে ফুল-চন্দন ছোঁড়া, কখনো ক্রুদ্ধ, কখনো সমর্পণে আনত। তারপর আবার স্থির নিশ্চল।

হারমোনিয়ামে সুর উঠল। খঞ্জনির মৃদুধ্বনি। রাধা অল্প অল্প দুলছে। সকলে আগ্রহে উন্মুখ আবার। এবারের গানে আর এক সুর, আর এক ভাব আর এক রস।

শ্মশান তো ভালবাসিস মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিকট শ্মশান আর তুই কোথা
পেলি?
দেখ্‌সে হেথা কি হয়েছে,
কোটি কোটি শব পড়ে আছে
কত ভূত বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে
কেলি।

ভূত পিশাচ তাল বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল, এটা ধরি ওটা ফেলি।
আয়না হেথা নাচবি শ্যামা
শব হবে শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজাবে দামা
দেখবে জগৎ নয়ন মেলি।
(এমন শ্মশান কেন মা ছেড়ে গেলি।)

অনুযোগের সঙ্গে করুণ বিদ্রূপের মিশেল, কিন্তু প্রাণের আকূতি আবেগে ভরপুর। আমার এ-পাশ ও-পাশে অমর গাঙ্গুলী, ভট্চায মশাই রায় মশাই আর কন্ট্রাকটর দত্ত সাহেব বসে। লক্ষ্য করছি তাঁরাও নির্বাক, অপলক।

কপালী বাবার আবার সেই নিঃশব্দ মন্ত্রহীন হাত আর কর-মুদ্রার পূজা। ত্রিশূল হাতে হঠাৎ একবার আসনে উঠে দাঁড়ালেন, প্রতিমা পটকেই বিদ্ধ করবেন এমন ভাব আর মূর্তি। তার পরেই ত্রিশূল ফেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আত্মসমর্পণ। উঠে বসতে সময় লাগল।

হারমোনিয়ামে সুর উঠল। খঞ্জনির মৃদু ঝুম ঝুনা রাধা দুলছে।

চিন্তামনি তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি?
নামে জগৎ-চিন্তাময়ী, ব্যাভারে কই তেমন দেখি।
প্রভাতে দাও বিষয় চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠর চিন্তে
ও মা শয়নে দাও সর্ব চিন্তে, বল মা তোরে কখন ডাকি।

পুজো সাঙ্গ কিনা বুঝলাম না, কারণ কপালী বাবা তাঁর আসনে স্থির বসে। রাধা থামছে, ভাবের ঘোরে দুলছে, আবার গান ধরছে। কোনোটা দু'লাইন কোনোটা চার লাইন, ভাবের আবেগেই আত্মবিস্মৃত হয়ে থেমে যাচ্ছে মনে হয়, ঘোর ভাঙতে নতুন গান ধরছে।

'জাননারে মন, পরম কারণ, শ্যামা তো শুধু মেয়ে নয়
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখনো কখনো পুরুষ হয়।

কভু বাঁধে ধরা কভু বাঁধে চূড়া ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়
কখনো পার্বতী কখনো শ্রীমতী, কখনো রামের জানকী হয়।
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দনুজদলে করে সভয়।

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস, শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে
তোর মায়ার জালে, মহামায়া, বিশ্বভুবন আছে ছেয়ে।

'দয়াময়ী মা যদি হইতে তুমি ;
শিব কেন নিলেন শ্মশান ভূমি।
কত যন্ত্রণা জ্বালা দাও তুমি মা
শ্মশানবাসিনী মা দিন তারিণী।

'মাতিয়ে দে মা আনন্দময়ী, একেবারে মেতে যাই,
তেমন করে মাতিয়ে দে মা, যেমন মেতেছিল রাই।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নাম সুধা পানে,
ও মা মাতৃক যত নরনারী দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই।'

'যে ভালো করেছ কালী, আর ভালোতে কাজ নাই,
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই।'

শেষ হল না, আর্ত রব তুলে পটের সামনে লুটিয়ে পড়ল। পড়েই থাকল। মেয়েরা কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমার মনে হল বড় শান্তি আর বড় আনন্দের কান্না। লক্ষ্য করলাম ভট্চায মশাই আর রায় মশাইরও চোখ ঝাপসা।

কপালী বাবা রাধার মাথায় পিঠে কমণ্ডলুর জল ছিটোতে লাগলেন। খানিক বাদে রাধা আস্তে আস্তে আবার উঠে বসল। আর দুলছে না। স্থির নিশ্চল।

কপালী বাবা প্রদীপ আর চামর দুলিয়ে সংক্ষেপে আরতি সারলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে শান্তি জল ছিটোলেন। হল্-এর

পাশের ঘরে আর বারান্দায় যারা তারাও তাঁকে ডেকে ডেকে শান্তি জল মাথায় নিল। উনি আবার আসনে ফিরে আসতে রাধা আস্তে আস্তে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর সকলকে সচকিত করে ডাকল, বড়বাবু এখানে এসো।

ঘোষ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে গরদের ধুতি, গায়ে হাফ-হাতা পশমী গেঞ্জি। গরদের ধুতির কোঁচা চাদরের মতো গায়ে জড়ানো। পটের সামনে গিয়ে জানু আসনে বসলেন। কপালী বাবা তাঁর কপালে লম্বা করে সিঁদুর টেনে দিলেন। কালীর পটের পা থেকে ফুল তুলে নিয়ে মাথায় রেখে কিছু মন্ত্র পড়লেন হয়তো। তারপর ওই ফুল গেঞ্জির গলার দিক টেনে বুকে রাখলেন। রাধা এবারে মঙ্গল প্রদীপ তুলে নিল। অন্য হাতের তালু প্রদীপের শিখার ওপর রেখে সেই তপ্ত হাত তাঁর মাথায় বোলালো। এ-রকম করে আগুনের তাপ নিয়ে নিয়ে তিন বার মাথায় কপালে, তিন বার বুকে আর তিন বার পিঠে বোলালো।

ঘোষ সাহেব উঠে আস্তে আস্তে ফিরে এলেন। ঘরের সকলের সেই মঙ্গল শিখার স্পর্শ মাথায় নেবার হিড়িক পড়ে গেল। রাধা প্রতিবার শিখার ওপর হাতের তালু রাখছে আর এক-জনের মাথায় সেই হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দেখলাম, নিঃশব্দে অমর গাঙ্গুলীও মাথা পেতে দিলেন। ঘরের সকলের শেষ হতে বারান্দায় ডাক পড়ল। সেখানে আশিস-তাপ নেওয়া শেষ হতে সামনের ঘরে। শেষে সামনের ঘর থেকে হলঘরে। সকলের মাথায় প্রদীপ শিখার তাপ বোলানো হতে হাসি-ছোঁয়া গম্ভীর মুখে অংশুমান ঘোষ তার সামনে এসে দাঁড়াল।—আগে তোর হাতখানা দেখা, কতটা পুড়ল দেখে নি।

রাধা হাত দেখালো না, মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে পুজোর ঘরের দিকে এগোতে গেল।

দাঁড়ারে মা, আগে, আমারটুকু সেরে নিই।

ঘোষ সাহেবের মুখে এই মা-ডাক আর 'তুই' বলে কথা আমিও

এই প্রথম শুনলাম। রাধা দাঁড়িয়ে গিয়ে আবার তাঁর দিকে তাকালো। স্থির হয়ে দাঁড়ালো। হাত দুই তফাতে এসে ঘোষ সাহেব আবার মাটিতে জানু আসনে বসলেন, তারপর উপুড় হয়ে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করলেন পনেরো বিশ সেকেণ্ড ধরে।

রাধা হাতের প্রদীপ পাশের একজনের হাতে দিল। ঘোষ সাহেব উঠে দাঁড়াতে শাড়ির আঁচল গলায় জড়িয়ে নিল। ঘোষ সাহেব মাটিতে মাথা রেখেছিলেন, কিন্তু রাধা এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে বসে তাঁর দু'পায়ের ওপর মাথা রাখল, দু'হাতে পা দুটি জড়িয়ে ধরে থাকল। ঘোষ সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, ওঠ্ রে মা ওঠ্—

উঠতে দেখলাম তাঁর দু'পাই চোখের জলে ভেজা।

আমি ভক্ত নই, বিশ্বাসের গর্বও নেই, কিন্তু অভিভূত হবার ব্যাপারে কোনো ইচ্ছে বা যুক্তির ব্যাপার নেই এটুকু অনুভব করতে হল। এরপর প্রণামের ঘটা। কোথা থেকে প্রথমেই হারু এসে রাধার পায়ে পড়ল। তার পিছনে ঘোষ সাহেবের ছেলেমেয়ে ছেলের বউ নাতিনাতনিরা আর প্রতিবেশিনীদেরও অনেকে দাঁড়িয়ে।—রাধা নিচু জাতের মেয়ে শুনেছিলাম। এখানে জাতের বিচার কেউ করছে না।

পায়ে পায়ে সামনের বারান্দায় চলে এলাম। কোণ ঘেঁষে চুপচাপ অমর গাঙ্গুলী ঘুরে দাঁড়িয়ে। আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। ধরা গলায় ফিসফিস করে বলে উঠলেন, আমার কি হবে মুখুজ্জে মশাই —ওদের দু'জনকে নিয়ে আমরা কি না বলেছি।

আমি হেসে বললাম, আপনারই সবার আগে গ্লানি ধুয়ে গেল, মুক্তি হয়ে গেল।

—আপনি ঠাট্টা করছেন…? কাঁদ কাঁদ মুখ।

আমি ঠাট্টা করছি না।

খানিক বাদে কপালী বাবাকে আর দেখলাম না। তাঁর পুজোর কিছু বুঝিওনি মুগ্ধও হইনি। তবু একটু আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। শুনলাম, তাঁর ফেরার জন্য ট্যাক্সি মজুত ছিল, চলে গেছেন। আগে নিজের ঘরের জংলী কালীর পুজো সারবেন, তারপর সমস্ত রাত

শ্মশান কালীর পুজো।

ঘোষ সাহেবের বাড়ির এই পুজো দেখে সকলেই অভিভূত, মুগ্ধ। বলা বাহুল্য, এটুকু, শুধু নাম গান আর পরিবেশ গুণে। পুজো কারো মন কাড়েনি, ওই পটের প্রতিমাও না। মন কেড়েছে রাধা, যাকে মায়ের মেয়েই ভাবছে সকলে।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব সেরে ঘরে ফিরতে রাত এগারোটা। ঘোষ সাহেব চুপি চুপি এক ফাঁকে বলে রাখলেন, আপনার কাল দুপুরেও নেমন্তন্ন, অবশ্য আসবেন···ফাইন্যাল রাউণ্ড এখনো বাকি ভুলে যাবেন না।

এক ঘুমে রাত কেটে গেল। সকাল থেকেই মন টানছিল। তবু সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে গিয়ে হাজির হলাম। সকলেই ওই পুজোর ঘরে জমায়েত তখন। সকলে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানালো। রাধা বেদীর কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। কালীর পট এরই মধ্যে আবার দেয়ালে উঠে গেছে। বেদীর ওপর একটা মঙ্গল ঘট, তাতে বিল্বপত্র। খাট সরানো হয়েছিল, সেটাও আবার যথাস্থানে।

ঘোষ সাহেব জিগ্যেস করলেন, রাধার পুজো কেমন লাগল আগে বলুন ?

সঙ্গে সঙ্গে মুখে একটু বিরক্তি ভাব এনে, রাধা বলল, বড়বাবু তুমি বড় দিক্ করো—।

ঘোষ সাহেবের পাশে বসে বললাম, আমি তো-পাপী-তাপী মানুষ, তবে ভালোই লাগলো···

রাধার ঠাণ্ডা দু'চোখ সঙ্গে সঙ্গে সোজা আমার মুখের ওপর। মনে হল কিছু দেখে নেবার ছিল দেখে নিল। তারপর মন্তব্যের সুরে বলল, মনে অহংকারের ঠাঁই রেখোনি বাপু।

সকলেরই সজাগ দৃষ্টি। একটু অপ্রস্তুত মুখে ঘোষ সাহেব জিগ্যেস করলেন, এঁর অহঙ্কারের কি দেখলি ?

জবাব, উনি পাপের কি জানেন তাপেরই বা কি জানেন? জগাই মাধাই পাপী ছেল? না তাপী ছেল? জাহির করাটাই অহংকার।

কে কি বুঝল জানি না, আমি অন্তত বুঝলাম না।—তার মানে জগাই মাধাই হলেও উদ্ধার পেয়ে যাব বলছেন?

হাঁ হয়ে চেয়ে রইলো একটু।—ও বড়বাবু তোমার বন্ধু যে আমাকে আপুনি আজ্ঞে করে কথা বলছেন গো! আমার দিকে ফিরল।—বলি, রাধা কত মানী, না ঘুঁটে-কুড়নি রানী! আপনি-টাপনি করে লাজ বাড়ায়ো না বাবু।

হেসে বললাম, তাই না হয় হল, কিন্তু আমার কথার জবাবটা কি?

—কি আর, পাপ করার খ্যামোতা নেই যাদের তারাই পাপী-পাপী বলে ডম্ফাই করে।

পিছনে লাগার সুরে ঘোষ সাহেব বললেন, সে ক্ষমতা ছিল বরং আমার—কি বলিস?

ঘরের সকলেই মজা পাচ্ছে, হাসছে। শমী বলল, বাবা তুমি কেন রাধা মাসিকে রাগাচ্ছ—

কালো মুখের শ্রীটুকু বড় সুন্দর, তার থেকেও সুন্দর টানা চোখের সরল চাওনি। কাল এই দু'চোখই ভাবে একেবারে অন্য-রকম দেখেছি। এখন কৌতুকের ছোঁয়া দেখছি। শমীর দিকে ফিরল, রাগব কেন, মিথ্যে তো নয়, তোর বাপের ছেল ক্ষ্যামতা বিসর্জন দেবার লড়াই, সে-লড়াইয়ে জিতেছে, ক্ষ্যামতা নাশের ক্ষ্যামতা কম কথা নাকি।

ঘোষ সাহেবের তৎক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দেবার মুখ। দোর গোড়ায় হীরুও সেই থেকে দাঁড়িয়ে। তাকেই তড়পে উঠলেন, গদগদ হয়ে কেবল তোর মা-কেই দেখবি না আমাদের খেতে-টেতে দেবার কথা ভাববি? সে ছুট লাগাতেই কিছু যেন মনে পড়ল, আমার দিকে ফিরলেন, ভালো কথা আপনি বোম্বাই উড়ছেন কবে?

দিন বললাম। মাঝে চার দিন বাকি।

—টিকিট করা হয়ে গেছে?

হয়ে গেছে তিনিও জানেন। বললাম, আজ বিকেলের মধ্যে করে.

নেব—পেয়ে যাব।

ঘোষ সাহেব ছেলেমেয়ে জামাইদের দিকে ফিরলেন। বললেন, উনি যাচ্ছেন বলেই বোধ হয়…আজ সকালেই মনে হচ্ছিল বছরের পর বছর একই জায়গায় পড়ে আছি, এই মওকায় ওঁর সঙ্গে একটু ঘুরে এলে কি হয়?

সকলেই ভেবাচাকা খেল, এমন প্রস্তাবের জন্য কেউ প্রস্তুত নয়। কি বলবে ভেবে না পেয়ে শমী তার রাধা মাসির দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষ সাহেব রাধাকেই জিগ্যেস করলেন, তুই কি বলিস…ইচ্ছে যখন হচ্ছে একবার ঘুরেই আসি? তারও জবাব পাবার আগে আমার দিকে ফিরলেন, আপনার অসুবিধে হবে না তো মশাই?

ঘাবড়ে যাওয়া মুখ করে বললাম, ইচ্ছেটা আপনার নিজের খরচে তো?… আমার যাতায়াতের ব্যাপারটা অন্যের ঘাড়ে…

ঘোষ সাহেব হাসিমুখে দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন, আপনার ঘাড়ে যেতে আমার বয়ে গেছে—রাধা কিছু বলছিস না যে, মত নেই নাকি?

রাধার শান্ত মুখ। তাঁকেই জিগ্যেস করলেন, বাবুটি কি কাজে যাচ্ছেন?

আমি নিষ্কৃতি পেলাম, শমীই সোৎসাহে তাকে বম্বে যাবার হেতু বোঝালো। শোনার পরেও নির্লিপ্ত। ঠাণ্ডা দু'চোখ এবারে আমার দিকে।—কত দিনের জন্য যাওয়া?

বললাম, কাজ এক দু'দিনেই হয়ে যেতে পারে, যাচ্ছি যখন পাঁচ সাত দিন কাটিয়ে আসার ইচ্ছে…তবে এঁর জন্য দুশ্চিন্তা করো যদি আগেও ফিরতে পারি—

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। —একটুও দুশ্চিন্তা নেই, এখেনে এক-ঘেয়ে লাগারই কথা, যাচ্ছ যখন ভালো করে দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে এসো, ফেরার তাড়া কোরো না—।

আমি মনে মনে হাঁপ ফেলে বাঁচলাম। এরপর মেয়ে-জামাই ছেলে-বউ সকলেই খুশি। তাদের প্রিয়জন অনেক কাল বাদে একটু

বাইরে ঘুরে আসতে যাচ্ছেন। খেতে বসে শমী তো তার বাবার অভ্যেস টভ্যেস সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাকে সমঝে দিতে চেষ্টা করল।

ঘোষ সাহেব গম্ভীর। —নাবালক নিয়ে যাচ্ছেন, ভালো করে শুনে রাখুন চোর ডাকাতের সঙ্গে বন্দুক আর রিভলবার নিয়ে মোকাবিলা করত সে হল অংশুমান ঘোষ··· কারো বাবা তো নয়।

মেয়ে হেসে ফেলল।—বেশ। তুমি আর সেই লোক আছ?

সকালের প্লেনে যাচ্ছি। বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে পৌঁছনোর কথা। কলকাতার স্পেশালিস্ট ডাক্তার যে ভদ্রলোকের কাছে চিঠি দিয়েছেন পারলে তাঁর সঙ্গে আজই যোগাযোগ করতে বলেছেন।

প্লেন আকাশে ওড়ার আধঘণ্টা খানেক বাদে ঘোষ সাহেব হাসি মুখে আমার দিকে ঘুরলেন।—আপনি সেই থেকে কি ভাবছেন বলে দেব?

—কি ভাবছি?

—যে টেস্ট করাতে যাচ্ছি তার রিডিংএ কি বেরুবে—একশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ইউনিট না একশ ষাট, বিনাইন না ম্যালিগন্যাণ্ট।

একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলাম, আপনি কি ভাবছেন?

—আমিও এ-ই ভাবছি, তবে একটু অন্যভাবে।

—কি রকম?

হাসছেন।—কালীপুজোর পরে রাধা বরাবরই আমার পায়ে ওই রকম মাথা রেখে প্রণাম করে···ভাবছি, কোনবার কাঁদে না, এবারে ও এত কাঁদল কেন?

ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বললাম, ভক্তি আবেগের ব্যাপার, বেশি-কম তো হতেই পারে।

—তা পারে। হাসছেন।—আবার টেস্ট-এর রেজাল্ট একশ ষাট বা তার বেশিও হতে পারে···আমি বিজ্ঞান-টিজ্ঞান ভুলে গেছি মশাই।

বেশ নাড়াচাড়া খেলাম। তারপর রাগত সুরেই বললাম, আমি

খুব আশা নিয়েই যাচ্ছি, এক বছরের ওপর হয়ে গেল আপনি একই রকম আছেন, আগে থাকতে আমার মেজাজ খারাপ করে দেবেন না।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। মুচকি হেসে তিনি জানলার দিকে মুখ ফেরালেন।

মুখে যা-ই বলি আমার মনটা দুশ্চিন্তায় ছেয়েই থাকল।

বম্বে পৌঁছে পরিচিত এক মাঝারি হোটেলে উঠলাম। পরিচ্ছন্ন, ব্যবস্থা-পত্র ভালো। পছন্দমতো ডবল-বেডের ঘরও পেলাম।

খাওয়া দাওয়া বিশ্রামের পর বিকেলের মধ্যে চিঠি আর রিপোর্ট-গুলো নিয়ে দু'জনে বেরুলাম। ট্যাক্সিঅলাকে ঠিকানা বলতে সে সহজেই পৌঁছে দিল।

ভদ্রলোক চিঠিটা ভালো করে পড়লেন। রিপোর্ট দেখলেন না। জানালেন তিনি ডাক্তার নন, ম্যানেজমেণ্টের একজন। অ্যাডভাইস আর রিপোর্টগুলো নিয়ে পরদিন সকালে যশলোক হাসপাতালের ওমুক ডিপার্টমেণ্টে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

পরদিন ঠিক সময়ে আমরা উপস্থিত। সেই ভদ্রলোক আমাদের যেখানে নিয়ে গেলেন সেখানে দু'জন ডাক্তার বসে। দু'জনেই অবাঙালী। অ্যাডভাইস দেখলেন কলকাতার যাবতীয় রিপোর্ট খুঁটিয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ ধরে গলাও পরীক্ষা করলেন। তারপর চার্ট দেখে দু'দিন পরের ডেট্ দিলেন, সকালে ওমুক সময় টেস্ট হবে।

এই দুটো দিন রোগ নিয়ে আমরা একটি কথাও বললাম না। এমন কি রাধা প্রসঙ্গেও কোনো কথা নয়। বম্বে শহর ঘোষ সাহেবের কাছে বলতে গেলে নতুন, চাকরি জীবনের শেষের দিকে একবার এসেছিলেন, যে ক'দিন ছিলেন কাজের চাপে নাওয়া খাওয়ার সময় মেলেনি। ঘুরে ঘুরে তাঁকে শহর আর শহরতলী দেখালাম।

যথা সময়ে টেস্ট হয়ে গেল। ঘোষ সাহেবের মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় নি, রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত আমারই সংকটের মধ্যে কেটেছে। রিপোর্ট আসার পর অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে, কিন্তু এতটুকু স্বস্তি বোধ করার কোনো হেতু নেই। ইলেক্ট্রোগ্রাফিক

রিডিং একশ পঞ্চান্ন ইউনিট। আর মাত্র পাঁচ বাড়লে ক্যানসার ধরেই নিতে হবে।

ডাক্তার দুটির সঙ্গে আলোচনা করে বোঝা গেল গ্রোথের পোজিশন 'হাইলি ট্র্যানজিটারি', তবে একশ পঞ্চান্নতে এসে দীর্ঘকাল থেমে আছে কিনা সেটা আগে আর এ টেস্ট করা হয়নি বলে বোঝা যাচ্ছে না। তাঁদের মতে যথাযথ চিকিৎসা করে মাস তিন চার বাদে আবার এই টেস্ট করা উচিত, তবে এর মধ্যে যদি গলার ট্রাবল বাড়ে তাহলে আরো আগেই আবার এ টেস্ট করা উচিত।

আমার প্রশ্ন, একশ পঞ্চান্নয় কত দিন থেমে থাকতে পারে?

তাঁদের জবাব, পাঁচ সাত দশ বছরও একই ভাবে থাকতে পারে আবার পাঁচ সাত মাসও না থাকতে পারে। এ কাউণ্ট কমতেও পারে না এমন নয়, তবে যাতে না বাড়ে সে চেষ্টাটাই একমাত্র চিকিৎসা এখন। কি করা উচিত কলকাতার ডাক্তার এই রিপোর্ট দেখে তিনিই স্থির করবেন।

আমার ইচ্ছে করছিল সেই বিকেলের ফ্লাইটেই কলকাতা ফিরে আসি। মন সত্যি বিগড়ে গেছে। কিন্তু ঘোষ সাহেবের অন্য মেজাজ। তিনি আরো দিন তিনেক থেকে যাওয়ার জন্য জোর করলেন। রাতে রসিকতার সুরে বললেন, এখন ফিরে গেলে আপনার মুখ দেখলেই লোকে কিছু একটা বিপদ আঁচ করবে। তারপর একটা বালিশ কোলের ওপর টেনে নিয়ে হাসি হাসি মুখে বলেছেন, আমার মনের কথা শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে?

চেয়ে আছি।

—কালীপুজোর রাতে রাধার সেই পায়ে মাথা রেখে কান্না দেখে আমি ধরেই নিয়েছিলাম এখানকার রিপোর্ট অবধারিত একশ ষাট দেখব। ভেবেছিলাম সে সমূহ কোনো বিপদ দেখছে।

চুপ করে আছি। সমূহ বিপদ নেই সেটা এখনো তো ভাবার মতো কোনো আশ্বাসই নেই। আমার মুখের দিকে চেয়ে ঘোষ সাহেব এটুকু বুঝে নিলেন বোধহয়। আস্তে আস্তে বললেন, সেই

রাতে আমার মনের দিক থেকে আরো কিছু ব্যাপার ঘটেছে যার কোনো কারণ নেই যুক্তি নেই ব্যাখ্যা নেই—এমন কি হেসে ওঠার ভয়ে কাউকে সেটা বলার কথাও নয়...মনের এই হঠাৎ ব্যাপারটা যে ঘটছে, ঘটেছে, সেটা অস্বীকার করি কি করে?

আমি আগ্রহ নিয়েই চেয়ে আছি। নিজে বিশ্বাস করি বা না করি, আমার জানার বাইরে, জ্ঞান বুদ্ধির বাইরে, বিশ্বাসের বাইরে পৃথিবীতে কত কি যে ঘটে যাচ্ছে সে-তো অস্বীকার করার নয়।

দুই শয্যায় দু'জনে মুখোমুখি বসে আছি। প্রসঙ্গ বদলে ঘোষ সাহেব জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা সেই কালীপুজোর রাতের পর থেকে আমাকে দেখে আপনার কেমন মনে হচ্ছে?

বললাম, আনন্দেই আছেন মনে হচ্ছে।

—আর সেটা মেকি বলেও মনে হচ্ছে তো?

অস্বীকার করতে পারলাম না। তাঁর এ ক'দিনের খোশ মেজাজ সত্যিই অকৃত্রিম ভাবিনি।

ঘোষ সাহেব রয়েসয়ে এরপর যা বলে গেলেন সেটা বিজ্ঞান-যুগের যুক্তিগ্রাহ্য কোনো ব্যাপার তো নয়ই, বিশ্লেষণ করতে বসলে নিছক ভাবাবেগ ছাড়া আর কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না।

...অংশুমান ঘোষের ধারণা, নিজে টের না পেলেও তাঁর এই গলার রোগটা দু'বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এ-ধারণাটা হয়েছে যেদিন হুট করে রাধা এক দুপুরে নিজে থেকে এ-বাড়িতে এসে নতুন ডাক্তার দেখানোর তাগিদ দিয়ে গেল।...মোটামুটি দু'বছরই হল (ঘোষ সাহেব তখন তাঁর কোয়ারটার্সএ থাকেন) রাধা থেকে থেকে তাঁর কাছে হাত জোড় করে অদ্ভুত একটা ভিক্ষে চায়। বলে, বড়বাবু, তোমার সব চিন্তা ভাবনা, সব বালাই আমাকে ভিক্ষে দাও। ভাবের কথা ধরে নিয়ে উনি তক্ষুনি হাসি মুখে মাথা নাড়েন, বলেন দিলাম।...একবার রাধা বেশ রাগ করেই বলল,-কেবল মুখেই বলো, দাও কোথায়? দিলে তোমাকে নিয়ে আমার মনে ভাবনা জমছে কেন? এ-কথার কোনো অর্থ হয় না, অর্থ নিয়ে ঘোষ সাহেব মাথাও ঘামাননি।...কিন্তু নতুন ডাক্তার·

দেখাবার কথা যেদিন বলতে এসেছিল রাধা সেদিন শুধু ওই কথাই বলেনি, দস্তুরমতো রাগ আর অভিমানও করেছিল। বলেছিল, চোখ বোজার আগে দিদি (ঘোষ সাহেবের স্ত্রী) বলে গেল রাধা সব রইলো দেখিস—কিন্তু কাকে দেখব কে আমার কথা শোনে, কতবার হাত জোড় করে ভিক্ষে চেয়েছি, তোমার সব বালাই সব ভাবনা-চিন্তা আমাকে ভিক্ষে দাও বড়বাবু—কিন্তু কে দেয়, রোগ-শোকের আমিটাও কে ছাড়তে চায় ?

সেদিন থেকেই বিজ্ঞান-পড়া মানুষটার মনে ডাক দিয়েছে গলার রাগটা সহজ ব্যাপার নয়।···সহজ যে নয় কলকাতার ডাক্তাররাই তা বলে দিয়েছেন। তারপর কালীপুজোর রাতে উনি দেখলেন অন্যান্য বারের তুলনায় রাধা অনেক বেশি ভাবের ঘোরে আছে, পুজোয় বসার আগে পর্যন্ত ছেলেমেয়ে জামাই বউ নাতি-নাতনির সঙ্গে কত-রকম ঠাট্টা মস্করা করে, এবারে একেবারে অন্যরকম। শেষে ঘোষ সাহেব সব থেকে বেশি ঝাঁকুনি খেলেন পুজোর পর তাঁর পায়ে মাথা রেখে রাধাকে ও ভাবে কাঁদতে দেখে।···মঙ্গল-প্রদীপের শিখা তাঁর কপালে মাথায় বুকে পিঠে বুলোচ্ছিল যখন তখনো অনুভব করছিলেন ওর ভিতরে কেউ কাঁদছে আর সব আপদ মুছে তুলে নেবার জন্য আকুল হয়ে উঠছে। কিন্তু তারপর পায়ে মাথা রেখে ও-ভাবে কাঁদল যখন, আর কোনো সন্দেহই থাকল না এখানকার টেস্টের ফলাফল কি পাবেন। একশ ষাটের বদলে একশ পঞ্চান্ন দেখেই তিনি বরং অবাক হয়েছেন।

···কিন্তু সেই কালীপুজোর রাতে যুক্তি বুদ্ধি ব্যাখ্যার বাইরে ঘোষ সাহেবের মনে যে ব্যাপারটা ঘটে গেছে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। রোগের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

···রোগের লক্ষণ যে আদৌ ভালো নয় সে তো কলকাতার সার্জন আর ডাক্তারের কথা থেকেই বোঝা গেছে।

রাধার কান্নার আসল অর্থটাই তখন তিনি বুঝতে পারেন নি। কিন্তু ওই রাতেই পেরেছেন।

· সেই রাতে ঘোষ সাহেবের সামনের ঘরে শোবার ব্যবস্থা। কারণ বরাবরই রাধা পুজোর ঘরেই থাকে কি করে, ঘুমোয় কি ঘুমোয় না সে-ই জানে। ঘোষ সাহেবের শুতে শুতে রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। বিছানায় গা দেবার দেড় দু'মিনিটের মধ্যে ঘুম।

…হঠাৎ দেখেন, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, রাধা তাঁর পায়ে মাথা রেখে ঠিক তেমনি করেই কাঁদছে। চোখের জলে দু'পা ভেসে যাচ্ছে। ঘোষ সাহেব বার বার বলছেন, ওঠ্ ওঠ্ রাধা ওঠ, যে ভিক্ষে চেয়ে আসছিস তা এবার আমি তোকে সত্যি দিলাম, আমার সব ভাবনা সব চিন্তা সব দায় সব বালাই সব-সব তোকে দিলাম. তুই আমাকে সেই শক্তি দে, নিজের বলে আর যেন কিচ্ছু না রাখি।

না, স্বপ্ন-টপ্ন বড় একটা দেখেন না ঘোষ সাহেব সেই রাতে এই এক স্বপ্ন দেখলেন। তখন ভোর-ভোর. একটা হাত আপন থেকেই চোখে উঠল। চোখে জল

ঘোষ সাহেব বলে উঠলেন, বিশ্বাস করবেন না মশাই, কি যে হয়ে গেল তার পর থেকে. আমার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা হিসেব-নিকেশ যেন এই দেহটার অস্তিত্ব ছেড়ে গেল। এখানকার রিপোর্ট ভালো পাব না ধরে নিয়েও বিশ্বাস করুন, তারপ থেকে আমার এতটুকু উদ্বেগ নেই, বিনাইন হলেও না ম্যালিগন্যাণ্ট হলেও না, বাঁচার চিন্তাও নেই মরার চিন্তাও নেই, আগে মেয়েটার কথা ভেবে মন খারাপ হত দুশ্চিন্তা হত, তাও গেল।

এই অনুভূতি আমার বোধের অতীত, কিন্তু আমি একটুও অবিশ্বাস করছি না।

জানান দিয়ে হোটেলের বয় আমাদের ডিনার দিয়ে গেল। একটু বেশি সারভিস চার্জ দিয়ে দু'বেলাই আমরা ঘরে বসে খাই। খেতে খেতে আর একটি কথাও হল না। দু'জনার মুখ ধোবার ফাঁকে বেয়ারা ডিশ-টিশ সরিয়ে টেবিল পরিষ্কার করে চলে গেল। জিগ্যেস করলাম, মন হাল্কা বলছেন. এবারে বেশ আরাম করে ঘুমোবেন বোধ হয়?

নিজের শয্যায় বসে পাশ বালিশটা কোলে টেনে নিয়ে অল্প অল্প হাসতে লাগলেন। বললেন, বোধহয় না, আপনার মনে যে সব প্রশ্ন জমে আছে তার জবাব সেরে না নিলে আপনার ঘুম হবে না।

শোনামাত্র আমি ভিতরে ভিতরে কত উদগ্রীব বুঝতে না দেবার চেষ্টা। হেসে বললাম, প্রশ্নতো এক দু'দিনের নয়, অনেক দিন ধরে অনেক প্রশ্ন জমা হচ্ছে···কিন্তু বলতে আপনারই আপত্তি ছিল, বলেছিলেন, কবর খুঁড়েও আবার তত্ত্ব-তল্লাসী হতে পারে।

ঘোড়ার ডিম পারে, আরে মশাই যখন বলেছিলাম তখন কি এই দিনের মতো আপনি এত কাছের কেউ ছিলেন? লেখার আগে আপনি কি হলপ করে নেবেন, যা লিখছি সত্যি লিখছি, সত্যি বই মিথ্যে লিখছি না—না কি আমি গলা বাড়িয়ে দিযে বলব, দেখো প্রভুরা, লেখক বানিয়ে কিছু লেখেনি, তোমরা আমাকে বিচারের কাঠগড়ায় এনে দাঁড করাতে পারো। আমার একটা চুলের ডগাও কেউ ছুঁতে পারবে না, আর এখানকার মনের অবস্থায় তো আমি যম-ব্যাটাকেও কেয়ার করি না।

স্পষ্টই মনে হল আমার শোনার আগ্রহ থেকে তাঁর বলার আগ্রহও কম নয়। আরব সাগরের কূলে হোটেলের দোতলার ঘরে মুখোমুখি বসে শোনার এমন সুযোগ বা পরিবেশ কলকাতায় পাব না।

ভূমিকা হিসেবে আমার প্রথম প্রশ্ন, আচ্ছা জয়নগরের যেখানে আপনি থানার ও সি ছিলেন সেখান থেকে মাতন···মানে যে জংলা গাঁয়ে রাধা থাকে বলেছিলেন, সেটা কত দূর?

—মাইল আড়াই তিন হবে।

···সেখানকার থানার ও সি মানে তো প্রবল দাপট আর প্রতি-পত্তির মানুষ, আড়াই তিন মাইল দূরের একটা গ্রাম্য মেয়ে আপনার নাগাল পেল কি করে?

ঘোষ সাহেব হেসে মন্তব্য করলেন, বেশ ধরে বেঁধেই শুরুটা করলেন। তারপর হেসে বললেন, ওর সঙ্গে আমার সত্যি আশ্চর্য-ভাবে যোগাযোগ আজ থেকে তেইশ বছর আগে, ওর বয়েস তখন

উনিশ···আর সেই বছরেই সবে আমি জয়নগর থানার চার্জ নিয়েছি। ···চৌষট্টি সালের মাঝামাঝি হবে সেটা। আমার তখন বছর চল্লিশ হবে বয়েস, কি কড়া মেজাজের মানুষ ছিলাম তখন আপনি ভাবতে পারবেন না, কিন্তু ওই মেজাজের মাথায় মেয়েটা প্রথম দিনেই একটা থাপ্পড় মেরে বসল।

শুনলাম। মনে দাগ ফেলার মতোই ছোট একটা প্রহসন বটে।

···থানার ও সি অংশুমান ঘোষের এগারো বছরের ছেলে দেবুর হঠাৎ ধুম জ্বর। একশ সাড়ে পাঁচ। রাত তখন প্রায় এগারোটা, গ্রাম দেশের মাঝ রাত। পাইক আর ডিউটির সাব ইনসপেক্টর ক'জন সাইকেল আর জিপ নিয়ে বরফ আর ডাক্তারের খোঁজে ছোটাছুটি করছে। ডাক্তারকে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি নাকি সাইকেলে চেপে পাশের গাঁয়ের এক রোগী দেখতে গেছেন। রাতে ফেরার কথা তখনো ফেরেননি। ডাক্তারের পরিবার কি উপলক্ষে ছেলেপুলে নিয়ে তখন বাপের বাড়ি। রাতে ডাক্তারের ফেরার কথা শুনে দু'জন পাইক সেখানে অপেক্ষা করছিল, সাব ইনসপেক্টর জিপ নিয়ে চলে গেছে সেখানে।

পাইক দুজন ফিরল, তাদের সঙ্গে মাঝবয়সী দু'টো লোক আর এই একটা মেয়ে। অংশুমান তখন ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ডাক্তারের আশায় থানার নিচের দাওয়ায় পায়চারি করছিলেন, আর এক-একবার ছুটে ওপরে গিয়ে ছেলেকে দেখে আসছিলেন।

এত রাতে দুই পাইকের সঙ্গে এই তিনজনকে দেখেই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। —এত রাতে কি ব্যাপার?

মাঝবয়সী লোক দুটো হাত জোড় করে যা নিবেদন করল তার সার, তারা অমুক গাঁয়ের লোক, হেঁটে বাড়ি ফিরছিল, কোথা থেকে এই মেয়েটা আলুথালু মূর্তিতে ছুটে এসে বলল, আমাকে বাঁচাও। শুনল তিনটে ডাকাত মুখ বেঁধে আর পিছমোড়া করে হাত বেঁধে ওকে কোন এক দূরে মাঠের ধারে চালা ঘরে নিয়ে গেছল, মা রক্ষা করবে বলেই ওকে ওমনি বেঁধে ফেলে রেখে ডাকাতরা ওকে ঘরের শিকল

তুলে দিয়ে মদ কিনতে গেছল। মা-কালী তখন এক বুড়ী সেজে পিদিম হাতে এসে শিকল খুলে ওকে বার করে দিয়ে বলেছে, শিগগীর পালা এসে দেখতে না পেলে ওরা আবার তোর পেছনে ছুটবে, বাঁচতে চাস তো মরণ ছোটা ছোট!

লোক দুটো এ শুনেই ভয় পেয়ে গেছে, ওকে নিয়ে যে পথে আসছিল সে-পথেই পা চালিয়ে দিল। তখন মেয়েটা বলল, এ-পথেই আধকোশ (ক্রোশ) এগোলে ডাক্তারবাবুর বাড়ি, খুব চেনা লোক, সেখেনে ছাড়ি দিয়ে চলে যাও। তার কথা মতো সেই বাড়ি এসে শোনে ডাক্তারবাবু ভিন গেরামে, তার পরিবারের সব বাপের বাড়ি— আর সেখানে এই দু'জন পাইক বসে সব শুনে তারা বলল তারা থানার লোক, বড়বাবুর ছেলের অসুখ তাই ডাক্তারের জন্য বসি আছে, এতক্ষণে ডাক্তারকে লিসপেক্টর বাবু জিপে তুলে নে চলে গেছে, ডাকাতের কেস বলছ এতে রেতে থানার জিম্মায় রেখে আসাই ভালো —তাই নে এসেছে।

অংশুমান এবার মেয়েটাকে ভালো করে দেখলেন। আঠেরো উনিশ বছরের সোমত্ত মেয়ে, কালোর ওপর মিষ্টি মুখ, ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছল বলছে, হাত মুখ বেঁধে ফেলে রেখে গেছল—কিন্তু তার চোখে মুখে এখন অন্তত ভয় বা উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নেই।

ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, তোর নাম কি?

—রাধা।

—কোথায় থাকিস?

—মাতন গাঁয়ে।

অংশুমান নতুন এসেছেন, জিগেস করলেন সেটা কোথায়?

—বিষ্টুপুরের পথে।

মেয়েটার কথাবার্তা পরিষ্কার আর মুখ দেখে এতবড় বিপদ ঘটেছে বোঝাই যায় না। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন, তোর বাড়িতে কে আছে?

—কেউ নাই।

—ডাকাতরা তোকে কখন ধরে নিয়ে গেছল?

—তা এখন দেড় দু'ঘণ্টা হবে।

অংশুমান ঘড়ি দেখলেন, তখন রাত এগারোটা। জিগ্যেস করলেন, ডাকাতরা তোকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেল কেউ টের পেল না?

—তা কেন গো, আমি তো বিবি মায়ের থান থেকে জাঙল পথে ঘরে ফিরতিছিলাম, সিখেনে ওই তিন ডাকাত ওঁত পাতি ছেল, পলকে মুখ বেন্ধে তুলি নিয়ে চলি গেল, অনেক পথ হাঁটি একটা খেতির ধারের ক'টা খোলা ঘরের একটাতে আনি তুলল, তারপর আমাকে পিছমোড়া করি বান্ধি রেখে ঘর বন্ধ করে ফুর্তি করার জন্যি চোলাই আনতি চলি গেল, তখন—

পরের কথা অংশুমান আগেই শুনেছেন, আর শোনার ধৈর্য থাকল না। জোরেই ধমকে উঠলেন, ডাকাতে তুলে নিয়ে যাবে বলেই রাত ন'টার পরে একলা মেয়েছেলে তুই জঙ্গল পথে ঘরে ফিরছিলি—কেমন? পাইক দুটোর দিকে ফিরে বললেন, একে রাতের মতো কোনো ঘরে ফেলে রাখ—ও কি-রকম ভাঁওতাবাজ মেয়ে কাল বুঝব।

মেয়েটা চকিতে একবার পাইক দুটোকে দেখল। অংশুমান তখন আবার ছেলেকে দেখে আসার জন্য ভিতরের দিকে পা বাড়িয়েছেন। পিছন থেকে মেয়েটা বলে উঠল, ও বড়বাবু, তিনটে নেকড়ের হাত থেকে বাঁচি এলাম, আর ইখেনে এনে আমাকে তুমিই দুটো হাঙরের জেম্মায় রেখে যাচ্ছ! রেতে যে ওরাই আমাকে ছিঁড়ে খাবে!

অংশুমান ঘুরে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য, এখানে এসেই থানার ঠিক এই দুটো লোকের সম্পর্কেই গোপন রিপোর্ট পেয়েছেন, চাকরির সুযোগ নিয়ে ওরা গাঁয়ের কয়েকটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে—ওই দু'জনের চরিত্র অতি মন্দ।

বড়বাবু ঘুরে না দাঁড়ালে রাগের চোটে ওরা হয়তো মেয়েটাকে মেরেই বসত। চোখ লাল করে ওর দিকে চেয়ে রইলো। মেয়েটা আবার বলল, ছেলের জন্য তোমার কোনো চিন্তা নাই গো বড়বাবু, তোমার মুখে শোকের চেহ্নও নাই, তোমার বউ ছেলেমেয়ে আছে, রেতের মতো একটু ঠাঁই দাও পড়ে থাকি, ডাক্তারবাবুটি আলেই বুঝতে

পারবে উনি কত ভালবাসেন আমাকে—উনি আলেন বলে—ওনার পরিবার থাকলে আর থানাতক আসতাম না, তাঁর কাছেই থাকি যেতাম।

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে দাপটের বড়বাবুটির আরো একটু থমকাতে হল। কি ভেবে বললেন, আচ্ছা আয়—

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ছোট্ট চত্বরটুকু দেখিয়ে বললেন, এখানে বসে থাক্।

তিনি ভেতরে চলে গেলেন। ছেলে তখনো রাগজ্বরে বেহুঁশ, কপালে জল-পট্টি, আইস ব্যাগের বরফ ফুরিয়ে এসেছে, এত রাতে আরো বরফের খোঁজে যারা গেছে তারা এখনো ফেরেনি। এ-দিকে এখনো ডাক্তারের দেখা নেই। অংশুমানের স্ত্রী ভয়ে আতঙ্কে অস্থির। হঠাৎ মহিলাকে অবাক মুখে পাশের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে অংশুমান ঘুরে দেখেন তাঁর আধ-হাত পিছনে সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে। রেগে উঠতে গিয়েও থমকালেন, কারণ মেয়েটা খুব খুঁটিয়ে অপলক চোখে তাঁর ছেলেকেই দেখছে।

পনেরো বিশ সেকেণ্ড পরেই খুব নিশ্চিন্ত করার সুরে বলল, কোনো ভয় নাইগো তোমার বড়বাবু, এ খরার তড়াসে জ্বর, ঠাণ্ডা জল আনি ছেলের সর্ব অঙ্গে বেশ করে ছিটিয়ে দাও জ্বর নামি যাবে।

শোনামাত্র অংশুমানের মাথায় রক্ত উঠল। একশ সাড়ে পাঁচ ছয় জ্বর ছেলের। বলে কিনা ঠাণ্ডা জলে গা ধুয়ে দাও! চাপা হুংকার দিয়ে উঠলেন, তোকে কে এখানে আসতে বলেছে?

ফ্যালফ্যাল করে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ির ও-পাশের অন্ধকার দিকটাতে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

এর তিন চার মিনিটের মধ্যে ডাক্তার এলেন। অংশুমান হন্তদন্ত হয়ে অর্ধেক সিঁড়ি নেমে তাকে নিয়ে এলেন। ও-দিকের অবস্থা অন্ধকারে কে বসে কেউ খেয়াল করলেন না, অংশুমান তখন ছেলের রোগের কথা বলতে ব্যস্ত। ডাক্তারটির নাম বিজন চৌধুরী, বয়সে অংশুমানের থেকে কিছু ছোট।

ডাক্তার চৌধুরী সমাচার শোনার পর বেশ করে রোগী দেখলেন তারপর বললেন, বড় বালতির এক বালতি ঠাণ্ডা জল আর দুটো বড় তোয়ালে আনতে বলুন। বড় একটা অয়েল ক্লথও দরকার।

দু'মিনিটের মধ্যে এসে গেল। অংশুমান আর তাঁর স্ত্রী ভাবলেন, অত রাগজ্বর বলে বেশ করে মাথা ধুইয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি যা বললেন আর করলেন, তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে হাঁ।

ছেলেকে চাপাচুপি দিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, ডাক্তার সে-সব নিজেই টেনে সরালেন, তারপর বললেন, গা থেকে জামা গেঞ্জি সব খুলে নিন, পরনের প্যান্টও।

খোলা হল। ছেলে তখনো বেহুঁশ, সম্পূর্ণ নগ্ন। এ-কাত ও-কাত করে তাকে অয়েল ক্লথের ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। ডাক্তার শার্টের হাত গুটিয়ে একটা তোয়ালে বালতির জলে ডুবিয়ে বললেন, আর এক বালতি ঠাণ্ডা জল রেডি রাখুন তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমি বললেই ওই শুকনো তোয়ালে দিয়ে আপনি মুছিয়ে মুছিয়ে দিয়ে যাবেন।

বালতির ঠাণ্ডা জলে তোয়ালেটা সপসপে করে ভিজিয়ে অনেক বার মাথা কপাল মুখে বেশ করে চাপড়ে দিলেন, শেষ বারে তোয়ালের জল নিওড়ে মাথায় মুখে দিলেন। এর নাম স্পঞ্জ নয়, যাকে বলে ভেজা তোয়ালে দিয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করানো।

ডাক্তার নিজেই ছেলেকে এ-পাশে টেনে কাত করে বললেন, অয়েল ক্লথটা বেশ করে মুছে ফেলুন তারপর ছেলেকে এবার উপুড় করে শুইয়ে দ্বিতীয় বালতির ঠাণ্ডা জলে বার বার তোয়ালে ভিজিয়ে ঘাড় থেকে পিঠ কোমর আর দু'পা পর্যন্ত একই ব্যাপারের মোহড়া চলল। সব হয়ে যেতে শেষ বার শুকনো তোয়ালে দিয়ে আবার সর্বাঙ্গ বেশ করে মুছে দেবার পর অয়েল ক্লথ সরিয়ে দেওয়া হল। গলা পর্যন্ত একটা পাতলা চাদরে ঢাকা হল। ডাক্তার মাথার ওপর পাখাটা কেবল একটু কমিয়ে দিতে বললেন। ছেলে তখন চোখ মেলে চারদিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। ব্যাগ থেকে দুটো বড়ি বার করে তাকে খাওয়ালেন। কাগজ নিয়ে একটা প্রেসকৃপশন লিখে বললেন, কালকের

মধ্যে রেমিশন হয়ে যাবে আশা করছি, তবু এ ওষুধটা খাইয়ে যাবেন

আরো মিনিট পনেরো বসে থেকে টেম্পারেচার নিলেন। জ্বর একশ দুই। চেয়ার ছেড়ে উঠে আশ্বাস দিলেন, কোনো ভয় নেই, হীট্ স্ট্রোকে এখানে এ-রকম সাংঘাতিক জ্বর হয়…কালও ঠিক এ-ভাবে নয়. ঠাণ্ডা জলে একবার স্পঞ্জ করিয়ে দেবেন আর বাই চান্স জ্বর বাড়লে আমাকে খবর দেবেন।

সাড়ে পাঁচ ছয় জ্বরের রোগীকে ও-ভাবে সপসপে করে চান করানো. আর মোছার সময়েও অংশুমান থেকে থেকে স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছিলেন, স্ত্রী-ও তাঁর দিকে। এখনো দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাচ্ছেন। দু'জনেরই বার বার অজানা অচেনা মেয়েটার কথা মনে পড়ছিল।

তাঁরা ডাক্তারকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলেন। অংশুমান সামনের দিকে চেয়ে ডাকলেন, এই—কি-যেন নাম তোর…রাধা—এ-দিকে আয়।

সিঁড়ির ও-ধারের অন্ধকার আড়াল থেকে রাধা পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখেই ডাক্তার হতবাক! —এ কি কাণ্ড! রাধা. এত রাতে তুই এখানে…থানায়!

জবাব না দিয়ে রাধা হাঁটু মুড়ে বসে আগে তাঁকে প্রণাম করল তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে জিগ্যেস করল, আগে বলো ওই খরা জ্বরের রোগীকে তুমি বেশ করে ঠাণ্ডা জলে চান করালে কিনা?

ডাক্তার অবাক। —করালাম তো, তাতে কি?

—কিছু না. এটা বড মেজাজের জায়গা, আমাকে তোমার সঙ্গে নে চলো—

হতবুদ্ধির মতো ডাক্তার ঘোষ দম্পতির দিকে তাকালেন। অংশুমান জিগ্যেস করলেন, আপনি তাহলে একে ভালোই চেনেন?

—আমি তো চিনিই, আমার স্ত্রী মানে ওর 'ডাক্তার দিদি' নিজের ছোট বনের মতো দেখে…কিন্তু ও এত রাতে এখানে কেন?

অংশুমান তখনো সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, ও বলছে রাত ন'টায় জঙ্গলের পথে কোন্ থান থেকে একা ফিরছিল, তিনটে ডাকাত তখন

ওর মুখ বেঁধে কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলেছিল, কোন্ ফাঁকে মা-কালী এক বুড়ী সেজে ওকে মুক্ত করে দিয়ে গেছে—

ডাক্তার চৌধুরী থমকালেন একটু, তারপর বললেন, একটু দাঁড়া তুই। সোজা আবার অংশুমানের ভিতরের ঘরে চলে এলেন। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী পিছনে আসবেন জানা কথাই। গলা খাটো করে ডাক্তার জিগ্যেস করলেন, আপনি কি ওকে এখানে এনে বকা-ঝকা করেছেন নাকি?

অংশুমান অপ্রস্তুত একটু। তাঁর স্ত্রী সুচারু দেবী চাপা ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলেন, পুলিশের মেজাজ, বকা-ঝকা করবে না! দোষের মধ্যে আপনি আসার আগে ছেলেকে অত জ্বরে ছটফট করতে দেখে মেয়েটা বলেছিল, ও কিছু না, বেশ করে ঠাণ্ডা জলে চান করিয়ে দাও, তাইতেই উনি ক্ষেপে গিয়ে বললেন, ঘাড় ধরে তোকে রাস্তায় বের করে দেব—আর আপনি কিনা এসেই ও যা বলল তা-ই করলেন। আমার বড় অদ্ভুত লাগছে মেয়েটাকে···কে বলুন তো?

এবারে ডাক্তার চৌধুরী হাসতে লাগলেন। বললেন, অদ্ভুত মেয়েই বটে, আমার অত বিশ্বাসও নেই বুঝিও না, আমার স্ত্রী বরং আপনাকে ওর সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারবেন···তবে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছল যদি বলে থাকে তবে সেটা ঠিক ধরে নিতে পারেন, ও মিথ্যে কখনো বলবে না।

রাগজ্বরের ছেলেকে সত্যি অত ঠাণ্ডা জলে স্নান করানোর ফলে সুস্থ হতে দেখে অংশুমান একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। এখানে এরকম হয় জানা থাকলে ওই দাওয়াই বাতলে দেওয়া এখন খুব একটা কৃতিত্বের ব্যাপার ভাবছেন না। স্ত্রীর ভাব-গতিক দেখে গম্ভীর শ্লেষে বললেন, ডাকাতরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে খালি ঘরে বেঁধে ফেলে রেখে ফুর্তি করার জন্য দল বেঁধে চলে গেল আর সেই ফাঁকে মা-কালী বুড়ী সেজে ওকে মুক্ত করল আর রক্ষা করল—এ-ও তাহলে সত্যি ধরে নেব?

ডাক্তার হেসেই জবাব দিলেন, কাকতলীয় কি ঘটেছে তা বলতে

পারব না …কিন্তু ওকে নিয়ে কি করা যায়, আমার স্ত্রী তো ছেলে-পুলে নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ি, একটা রাত আপনাদের কাছে রাখতে খুব অসুবিধে হবে ?

ব্যস্ত হয়ে সুচারু দেবী আগ বাড়িয়ে বললেন, আর কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, আমি খুব যত্ন করেই ওকে রাখব—

ডাক্তার আবার বেরিয়ে এলেন, ওঁরাও। সুচারু দেবী রাধার হাত ধরে বললেন, আমরা এখানে নতুন এসেছি বোন, তোমার কথা ডাক্তার-বাবুর মুখে এই প্রথম শুনলাম, তোমার সঙ্গে তখন ও-ভাবে কথা বলা খুব অন্যায় হয়েছে, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ঘরে নেই, একটা রাত আমার কাছে থেকে যেতে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না—

মেয়েটা অংশুমান-গৃহিণীর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল, তার-পর ফিক করে হেসে বলল, মেজাজের ঘরে তুমি যে দেখি আনন্দময়ী গো ! তারপরেই সংশয়, কিন্তু তোমার ওই বড়বাবু ফের জেরা করতে বসে আবার আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করতে চাইবে না তো ?

সুচারু দেবী জোরেই মাথা নাড়লেন, না না, আমি তো বলছি !

গম্ভীর মুখে অংশুমান বললেন, কোনো চিন্তা নেই, মা-কালী বুড়ী সেজে তোকে রক্ষা করলেন আজ রাতের মতো না-হয় তাও বিশ্বাস করব।

শ্লেষটুকু স্ত্রীর উদ্দেশে।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বললেন, তোর কোনো ভাবনা নেই, ওঁরা খুব ভালো লোক।—বুঝলি ?

কিন্তু বড়বাবুর আগের কথা শুনেই রাধা অসন্তুষ্ট। ডাক্তারকেই ঝাঁঝিয়ে উঠল, তুমি ডাক্তারি করো শরীলের রোগ ধরো—ভালোমন্দ চেনার কত ক্ষ্যামোতা তোমার ! তারপরেই দু'চোখ বড়বাবুর মুখের ওপর, যেন ভালো কি মন্দ যাচাই করার ক্ষমতা তার আছে। এবারে হাসিহাসি মুখ, সুচারু দেবীর দিকে ফিরল, খারাপ নয় গো দিদি তবে কড়া পুলিশ, বড়বাবুর অবিশ্বাসের রোগ ছাড়াতে তোমার প্রায় জেবন কেটে যাবে।

ডাক্তার চলে যাবার পরে ছেলের জ্বর আরো নেমে এসেছে সুচারু দেবী তাঁর বিচিত্র অতিথি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মেয়েটা সব-রকম তোয়াজের চেষ্টা দু'কথায় নাকচ করে দিল। বলল আমি মেঝেতেই পড়ে থাকি, চাইছ যখন একটা চ্যাটাই দাও, তার বেশি সহ্যি হয় না। না না, খাবার ভাবনা কোরো না, তিন হাবাতে দেহটা ছানাছানি করে বয়ে নিয়ে গেছে—সকালে চানের আগে গলা দিয়ে কিছু নামবে না।

সুচারু দেবী চানের যোগাড় করে দিতে চাইলেন, একটু দুধ খাবার জন্য ঝোলাঝুলি করলেন। রাধা বিরক্ত 'কেন দিক্ করছ বলো তো?'

অংশুমান স্ত্রীকে ডেকে বললেন, যেমন আছে থাকতে দাও, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না।

সবে সকাল। বেশ মিষ্টি গানের গলা কানে আসতে অংশুমানের ঘুম ভেঙে গেল, বিছানায় উঠে বসলেন, দেখলেন স্ত্রী আগেই উঠে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে শুনছেন। অংশুমান ছেলের গায়ে হাত রাখলেন, গা ঠাণ্ডা। দু'কান আবার নিজের অগোচরে সজাগ! গ্রাম্য সুরের বড় অদ্ভুত মিষ্টি গান। গলা ছেড়ে গাইছে না, আবার একেবারে আস্তে না।

'ও মা, দেহ-জ্বর আসে যায়
ভব-জ্বর তো ছাড়ে না,
মন জ্বলে আর পরাণ জ্বলে
ও মা, তার বদ্যি তো মেলে না

দেহ-জ্বর আসে যায়
ওষুধ গুণে সেরে যায়
মা-গো, ভব-জ্বরে যে জর-জর
সে ওষুধ কোথায় পায়?
রাধা কয়, যা রে মন নিজ ধাম
তার ওষুধ মায়ের নাম।

স্ত্রী দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন। কার উদ্দেশে এ প্রণাম অংশুমান বুঝলেন না। কোনরকম উচ্চাঙ্গের আহা-মরি গান কিছু নয়। কিন্তু আবেদনে এমনই মূর্ত যে সবল স্নায়ুর মানুষটাও কান পেতে না শুনে পারেননি।

সুচারু দেবী উঠে পায়ে পায়ে রাধার সামনে এসে দাঁড়ালেন। গান থেমেছে, কিন্তু চাউনি এখনো ভাবে তন্ময়। টেনে টেনে জিগ্যেস করল, ছেলে ভালো তো?

—ভালো। এমন গান তুমি কোথা থেকে শিখলে গো?

খুশি। —তোমার ভালো লেগেছে? ···তোমার মনখানা ভালো তাই ভালো লেগেছে। কোত্থেকে আর শিখব, আমি কি আর মাস্টার রেখে গান শিখি? বাবা গাইত, কপালী বাবা গায়, শুনে শুনে যে-টুকু শেখা যায়, আর মনে যা আসে গেয়ে যাই, আবার, ভুলেও যাই—যা গাইছিলাম আবার বললে গাইতে পারব নি।

ঘরে দাঁড়িয়ে অংশুমান শুনছিলেন। হ্যাঁ, ভোরে এই গান শুনে ঘুম ভেঙেছে, ভালো লেগেছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-ধরনের বোল্‌-চালে বিশ্বাস করার লোক নন তিনি, এমন সুরেলা গলায় টেনে টেনে পদ আর ছন্দ মিলিয়ে গাইছিল, অথচ বলছে ফের গাইতে বললে পারবে না। এটা ভাবের বাহাদুরি ছাড়া আর কিছু ভাবলেন না অংশুমান।

—বড়বাবুকে বলে দিও আমি যাচ্ছি, এরপর রোদ চড়ে যাবে।

সুচারু দেবী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, সে কি! কাল জলটুকুও মুখে দাওনি, আজ এক্ষুনি যাবে কি, আমাদের অকল্যাণ হবে না!

সরল হাসি আর জবাব কানে এলো অংশুমানের।—আমার জন্যি কোনো গেরস্তের কখনো অকল্যাণ হয় না গো দিদি—কিছু ভেবনি।

—না না তা হবে না, আমাকে দিদি বলেছ, কিন্তু আমি তোমার মায়ের মতো দিদি, আমার কথা না রাখলে আমি সমস্ত দিন না খেয়ে থাকব বলে দিলাম—

—বড় ঝামেলা করো বাপু, চান করে আবার এই বাসি জামা-কাপড় পরব?

—আমি ধোয়া জামা-কাপড় এনে দিচ্ছি।

—তা হলে খুব ছেঁড়া-খোঁড়া কিছু দাও, তিন মাইল পথ ঠেঙিয়ে আমি আর ফেরত দিতে আসতে পারবনি।

ছেলে এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অংশুমান সেই খাটেই বসে। স্ত্রীকে ঘরে ঢুকে আলমারি খুলতে দেখলেন। তাঁর এই ভাবাবেগের তিনি খুব দাম ছান না, কিন্তু এ নিয়ে খোঁচাখুঁচিও করেন না। আলমারি খুলে যা-যা নেবার নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চোখাচোখি। হাসি দেখেই ভ্রূকুটি।

—সব-কিছু অত তুচ্ছ কোরো না—বুঝলে ?

কি নিয়েছেন সেটা এক-রকম আড়াল করেই দ্রুত চলে গেলেন। কিন্তু পরের কথাও অংশুমানের কানে এলোই।

ও-ঘরে রাধার গলায় রাজ্যের বিস্ময়।—শাড়ি সায়া ব্লাউজ সব যে একেবারে নতুন দেখছি—এত ভালো আমি কখনো দেখেছি না পরেছি—বললাম না ছেঁড়া-খোঁড়া কিছু দাও।

স্ত্রীর জবাব, দিদি কি তোকে এক প্রস্থ জামা-কাপড় দিতে পারে না ? এত লজ্জা কিসের—

—লজ্জা! আমি ভিক্ষে করে খাই, আমার আবার লজ্জা! কি ভাগ্যি গো দিদি আজ আমার—কাল রেতে কালামুখোগুলো ও-ভাবে বেন্ধে নে গেল বলে মনে খুব দুঃখ হয়েছিল—আর আজ মা কি দেল দেখো!

এ-ঘরে বসে অংশুমান একটু ভুরু কোঁচকালেন।

স্ত্রীর অতিথিপরায়ণতা এরপর একটু বাড়াবাড়িই মনে হয়েছে অংশুমানের। চান করে আসার পর নিজে ওর চুল বাঁধতে বসে গেছেন। ও-দিকে রাঁধুনিকে হুকুম করেছেন লুচি বেগুনভাজা আর তরকারি করতে। চাকরকে পাঠিয়েছে মিষ্টি আনতে। দু'জনের কথা-বার্তাও কানে আসছে।

—কালো হলেও কি সুন্দর চেহারাখানা তোর। কী মিষ্টি চোখ মুখ—এ-ভাবে থাকিস কেন ?

হাসি।—মা-কালী কালো করেছে বেশ করেছে, এর ওপর হদ কুচ্ছিৎ করলে আরো ভালো হত, নিশ্চিন্তে থাকতাম—

—কেন? স্ত্রীর প্রশ্ন।

—বোঝো না? পাঁচ বাড়ি থেকে ডাক আসে, গান গেয়ে ভিক্ষে করে খাই—লোকে সন্দ করতে ছাড়ে না পিছনে লাগতে ছাড়ে?

—কেন, তোর কেউ কোথাও নেই? স্ত্রীর গলায় স্নেহ ঝরা উৎকণ্ঠা।

নির্লিপ্ত গোছের সাদা-মাটা জবাব কানে এলো অংশুমানের। —বাবা মা, অনেক বড় দিদি আর একটা ছোট ভাই ছিল। মা ওর ন'বছর বয়সে সগ্‌গে চলে গেল, ভাইটা তখন পাঁচ বছরের। ওর থেকে আট বছরের বড় দিদির সবে তখন বিয়ে হয়েছে। বাবা হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে গান গেযে যা রোজগার করত তাতেই বেশ চলে যেত। ছ'সাত বছর বয়েস হতে ভাইও বাপের সঙ্গে যেত, দোহার করত, করতাল বাজাতো। কেবল গ্রামে নয়, টেরেনে চেপে তারা হরদম কলকাতায়ও চলে যেত। দু'বছর আগে বাবা আবার বিষম দাগা পেল। পঁচিশ বছরের জোয়ান দিদিটাকে সাপে কাটল, নামী-নামী ওঝা এসেও কিচ্ছুটি করতে পারল না। তা দিদির মনেও সুখ ছিল না, দু' দুটো সন্তান হয়েছিল, একটা এক বছর বেঁচেছিল আর একটা দেড় বছর। শেষে নিজে মরে হাড় জুড়ালো।...পরের বছরই বাপ কলকাতার রাস্তায় গান গাইতে গাইতেই ধুপ করে পড়ল আর মরে গেল। কেবল থাকল ছোট ভাইটা। পনেরো বছর বয়েস হলে কি হবে, বাপ বেঁচে থাকতেই বখাটে হয়ে গেছল, তিন চার মাস না যেতে একদিন সেই যে পালালো আজও ফেরেনি। কপালী বাবা বলেছে ও বদ সঙ্গে পড়ে অনেক দূরে চলে গেছে, ওর আশা আর রাখিসনি। শেষটুকুতে তপতপে রাগের গলা, মা-কালীর রঙ্গ ত্মাখো গো দিদি, এক-এক সময় ইচ্ছে করে ওই লকলকে জিভ টেনে ছিঁড়ে আনতে।

অংশুমান উঠে ধরা-চুড়া পরে এবার নিচে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এত বছরের চাকরিতে এর থেকে ঢের বেশি দুঃখ আর

অত্যাচারে জর্জর শতশত জীবন দেখেছেন।

কিন্তু ও-ঘরে স্ত্রীটি আ-হা আ-হা করে অস্থির।—তাহলে তোর দেখাশুনা এখন কে করে?

—মা-কালী করে, বিবি-মা করে, বড় মাজারের পীরবাবা করে কপালী বাবা করে—ও-জঙ্গি আমি ভাবি না গো দিদি। তারপরেই ফিক করে একটু হাসি।—দেখা শোনা করার লোভ তো তিন গাঁয়ের আরো কত জনার, কিন্তু ভগ্নিপতির দাপটে পেরে ওঠে না—তার নিজের জিভেই যে অষ্ট-প্রহর টসটস করে জল গড়াচ্ছে! মা-কালীর যেমন ইচ্ছে তেমন হবে।

...মেয়েটার কথা-বার্তা যেমন সহজ সরল, ওর ভিতরটাও সত্যি সে-রকম কিনা অংশুমান ভেবে পান না।

সুচারু সামনে বসে রাধাকে খাওয়াচ্ছেন। সবে খান দুই লুচি মুখে দিয়েছে, সিঁড়িতে ব্যস্তসমস্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই বড়বাবুর সঙ্গে কার কথা কানে এলো।

কুলপির দিকে এক চাষের জমির কাছে একটা বুড়ী মরে পড়েছিল। দেখে মনে হয় রাতে তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে। তাকে তুলে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ওই জমির ধারে চাষের সময় মালিকের লোক থাকার তিনটি 'কুজি' ঘর আছে, আশপাশের কেউ কেউ বলছে, যখন কেউ থাকে না বুড়ীটা তখন ওই ঘরগুলোর কোনটাতে পড়ে থাকত।

সুচারু দেবী বাধা দেবার সময় পেলেন না, রাধা খাওয়া ফেলে ছিটকে উঠে দাঁড়ালো। সুচারু দেবী হাঁ-হাঁ করে ওঠার আগেই সে বাইরে।

—তুই খাবার সব ফেলে রেখে উঠে এলি কেন, আয় শিগগীর, থানায় এ-রকম খবর হামেশা আসে—

রাধার কানেও ঢুকল না, বড়বাবুর সামনে যে ইনসপেক্টর দাঁড়িয়ে তাকে গলা চড়িয়ে জিগ্যেস করল, কী বললে গো বাবু তুমি, রেতে চাষের জমির সামনে বুড়ীকে গলা টিপে মারা হয়েছে? সেখানে কুজিঘর

আছে তিনটে—কুলপির দিকে? অস্বাভাবিক চাউনি বড়বাবুর দিকে ফিরল। —আমি আঁধারে ছুটতে ছুটতে যে লোক দুটোকে পেলাম তারা তো কুলপির দিক থেকেই আসছিল, সে-পথেই ডাক্তারবাবুর বাড়ি—তাহলে যে বুড়ী কাল আমাকে ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচালে, বুঝতে পেরে তারাই ওকে মেরে ফেলেনি তো?

ও-দিকে সুচারু দেবী হাত ধরে ওকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য টানছেন। ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উত্তেজিত মুখে বড়বাবুকেই বলে উঠল, হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছ কি, আমাকে নে চলো। আমি দেখব কোন্ বুড়ীকে নে আসা হল, সে হলে আমি ঠিক চিনতে পারব।

অংশুমান ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কাল রাতে তো তুই বললি, মা-কালী বুড়ী সেজে এসে তোকে উদ্ধার করল?

—আঃ, কী-যে বিবেচনা তোমাদের বুঝি না—মা-কালী ওর ওপর ভর করে আমাকে বাঁচাতে পারে না?

অংশুমান গম্ভীর মুখে একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, খেয়ে নিচে নেমে আয়—

—খাওয়ার নিকুচি করেছে। ছুটে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। ইনসপেক্টরটি বিমূঢ়। বড়বাবুর রাগ হচ্ছে কিন্তু অবাকও কম হচ্ছেন না।

অংশুমান নিচে নেমে এলেন। বুড়ীর মৃতদেহ সামনের বারান্দায় শোয়ানো। তার পাশে ধুলো মাটির মেঝের ওপর নিশ্চল পাথর মূর্তির মতো রাধা বসে। গত রাতে যে ওকে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল এ সে-ই বুড়ী কিনা, এ আর জিগ্যেস করাও নিরর্থক। কিন্তু অংশুমান পুলিশী ধাতেই কর্তব্য শুরু করলেন।—এ সেই বুড়ী তাহলে?

জবাবও দিল না, তার দিকে তাকালোও না।

এবারে আর একটু ঝাঁঝালো গলায় বলল, এই বুড়ী তোকে চিনত বা আগে দেখেছে কখনো?

এবার নির্বাক, মুখও ফেরালো না।

হাতের বেটনটা দিয়ে শপাং করে দেয়ালের থামের ওপর ঘা বসালেন।—কথা কানে যাচ্ছে? এ-দিকে তাকা!

আস্তে আস্তে ফিরল। তেমন পাথর মূর্তি।

—আমি যদি বলি ডাকাত-টাকাত সব মিথ্যে কথা, তুই ওদের সঙ্গে ফুর্তি করার জন্য ও-দিকে গেছলি—বুড়ীকে দেখে ধরা পড়ার ভয়ে ওকে মারা হয়েছে—তারপর ছুটে এসে যা বলেছিস সব বানানো কথা?

পাথর মূর্তিতে সাড় ফিরে আসতে লাগল। অপলক চেয়ে রইলো। আশ্চর্য, এত দিনের পোড় খাওয়া ও সি অংশুমান ঘোষ কি-রকম অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তারপর জবাব শুনে আরো স্তব্ধ। একটি একটি করে বলল, তোমার ঘরে ছেলেমেয়ে আছে, তোমার বউ ভালো মানুষ, আর এমন কথা বোলো না—মা-কালী তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবে।

ঘোষ সাহেব আমার দিকে চেয়ে হাসছেন অল্প অল্প। ঘড়িতে রাত তখন এগারোটার কাছাকাছি। বললেন, থানার প্রবল দাপট আর প্রতিপত্তির ও সি'র নাগাল আড়াই তিন-মাইল দূরের একটা গ্রাম্য মেয়ে কি-ভাবে পেল—এটাই তো আপনার প্রশ্ন ছিল?...আর আমি বলেছিলাম, এই কড়া মানুষের মেজাজের মাথায় যোগাযোগের প্রথম দিনেই মেয়েটা একটা থাপ্পড় মেরে বসল—মিলেছে?

হেসেই জবাব দিলাম, অনেকটা...তবে আমার প্রশ্নটা এর থেকেও অনেক বড় কিছুর ওপর থেকে যবনিকা তোলার ভনিতার মতো ছিল...।

মুখের মৃদু হাসিটুকু সুন্দর লাগছে। কোনরকম উদ্বেগের ছিটে-ফোঁটাও দেখছি না। জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছেন। রাতের অপেক্ষাকৃত নির্জনতায় সমুদ্রের একটা শাঁ-শাঁ শব্দ আসছে। বোম্বাই তটের এদিকের আরব সাগর বেশ শান্ত।

যবনিকা তোলার ব্যাপারেও ঘোষ সাহেব ছোট একটু ভূমিকা করে নিলেন। মেয়েটার উনিশ বছর বয়সে তাঁর আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। কিন্তু মেয়েটার সাতাশ বছর বয়েস পর্যন্ত তিনি অন্তত এই যোগাযোগটুকু খুব একটা ভাবাবেগের দিকে গড়াতে দেন'নি। আরো পাঁচজন ভদ্রলোকের গৃহিণীর মতোই তাঁর স্ত্রীরও মেয়েট'র প্রতি স্নেহ আর আকর্ষণ বাড়ছিল। কিন্তু এই ক'বছরের মধ্যে স্বামীর ভ্রূকুটির ভয়ে তাকে বাড়িতে অর্থাৎ থানার দোতলার কোয়াটার্স-এ ডেকে এনে কখনো নাম-গানের আসর বসাননি। কাছে বা ছু'তিন মাইলের মধ্যেও কোথাও রাধার গান হবে জানতে পারলে তিনি যাওয়া আসার জন্য আগে ভাগে জিপের বায়না করে রাখতেন। আর, ছেলেমেয়ের জন্মদিনে হোক বা যে-কোনো অছিলায় হোক রাধাকে নেমন্তন্ন করে জিপ পাঠিয়ে আনাতেন এবং পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতেন। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা উপসী থেকে মেয়েটা খেতে বসেও না খেয়ে চলে গেছে এই খেদ ভুলতে মহিলার অনেক সময় লেগেছিল। কিন্তু তখনো বড়বাবুটি ওই মেয়ের তেমন কাছের মানুষ মোটেই নন। স্ত্রীকে নাকি বলত, তোমার বাড়িতে যাব কি, বড়বাবুটিকে দেখলেই আমার বুকের তলায় কাঁপুনি ধরে।

কিন্তু স্ত্রীর ঘরে এসে হেসে হেসেই মন্তব্য করতেন, মুখে বলে বটে, কিন্তু ভয় ও এই ছুনিয়ায় বোধহয় কাউকেই করে না, বরং ওর কখন কি মেজাজ থাকে এই নিয়েই ভাবনা সকলের।

অংশুমান এটুকু খুব অবিশ্বাস করতে পারেননি। কারণ, সেই প্রথম দিনের যোগাযোগে তাঁর নিচের কর্মচারীদের সামনে এক বুড়ীর মৃতদেহের পাশে বসে তাঁর শাসানির জবাবে যে-রকম পাথুরে মুখ করে আর পাথুরে চোখ তুলে যা বলেছিল তা ভোলবার নয়।

...বলেছিল, তোমার ঘরে ছেলেমেয়ে আছে, তোমার বউ ভালো মানুষ, আর এমন কথা বোলো না—মা-কালী তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবে।

...ভয়-ডরের লেশ মাত্র থাকলে থানার দাপটের বড়বাবুকে এমন

বলার বুকের পাটা আর দেখেননি।

...তারপর আট বছর পরের সেই এক ঘটনা। যে-ঘটনার পরে মেয়েটার যত না হোক, অংশুমান ঘোষের জীবনের পরিবর্তন ঘটে গেছে ঢের বেশি। তারপরে মাস আড়াই মাত্র সেখানকার চাকরিতে বহাল ছিলেন তিনি। ওই আড়াই মাসের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে ওই মেয়ের সঙ্গে যেন জন্ম-জন্মান্তরের শুদ্ধ যোগ অনুভব করেছেন। মাত্র আড়াই মাসে অনন্তকালের ব্যবধান উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। প্রমোশন পেয়ে দূরে চলে আসার পরেও সেই যোগ আর ছেঁড়েনি বরং দৃঢ়তর হয়েছে।...ওই আড়াই মাসে সপ্তাহে দু'তিন রাতও রাধাকে তাঁর কোয়ার্টার্স-এ ধরে রাখতে পেরেছেন। সে এক অনির্বচনীয় আনন্দের দিন গেছে। রাধার ছেলেবেলার দিনগুলির কথাও রাতে পাশাপাশি শুয়ে সুচারু দেবী তার মুখ থেকেই শুনেছেন, আর পরে স্বামীকে বলেছেন, সেখান থেকেই শুরু করে ঘোষ সাহেব আট বছর পরের সেই একটি দিনের ঘটনা বিস্তার করে পরের উপসংহারে এসে থেমেছেন।

বিছানায় শুয়েই ঘড়ি দেখলাম। রাত সাড়ে চারটে। সাড়ে তিনটেয় আমরা শুয়েছি। এরই মধ্যে পাশের শয্যায় ঘোষ সাহেবের নাসিকা-গর্জন বেড়েই চলেছে। বড় তৃপ্তির ঘুম ঘুমোচ্ছেন।

আমার চোখে ঘুম নেই। কিন্তু তার জন্য কোনো ক্লান্তিও নেই। নিঃশব্দে উঠে পড়লাম। চোখে মুখে জল দিয়ে চেয়ারটা জানালার ধারে তুলে এনে বসলাম। সামনে চেয়ে বসে আছি বটে, কিন্তু আবছা অন্ধকারে কিছু দেখছি না বা দেখতে চেষ্টাও করছি না

ভোরের আলো স্পষ্ট হচ্ছে। আরব সাগরের কালো জলে লাল সূর্যের গলানো সোনার রঙের ছোঁয়া লাগল।

আমার চোখের সামনে সমুদ্র-জোড়া একখানা সুশ্রী কালো মুখ। সেই কালো মুখের ওপর ওমনি সোনার রং ঝিকমিক করছে।

সকাল দশটার ফ্লাইটে রওনা হয়ে বেলা বারোটায় কলকাতায় পৌঁছেছি। রওনা হবার ঘণ্টাখানেক আগে ঘোষ সাহেব হোটেল

থেকে মেয়েকে ফোন করেছিলেন। মেয়ে আবার তার দাদাকে ফোনে জানিয়ে থাকবে। অফিস কামাই করে ছেলে আর জামাই এয়ারপোর্টে উপস্থিত।

শমীর বাড়িতে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা। দেবু বলল, আমার ওখানেই ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম, শমীটা কিছুতেই রাজি হল না, মাঝখান থেকে আমাদের সুদ্ধ ওর ওখানে নেমন্তন্ন।

দেবুর দিকে চেয়ে আমি ওর সেই এগারো বছরের মুখখানা কল্পনা করতে চেষ্টা করছিলাম, একশ সাড়ে পাঁচ ছয় জ্বরে, ভাজাভাজা, বেহুঁস, সেখানে ডাকাতের হাত থেকে প্রাণ আর ইজ্জত রক্ষা পাওয়া একটা উনিশ বছরের মেয়ে পাকে-চক্রে এসে গিয়ে ওর বাবার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে আর তারপর বিধান দিচ্ছে।

কল্পনা করতে পারব কেন, মাঝে তেইশ বছরের ফারাক। কিন্তু রাধার সেই উনিশ বছরের মুখ দিব্বি চোখের সামনে আসছে।

বাপের সঙ্গে আমাকেও পেয়ে শমী খুশিতে আটখানা। ছেলের বউ উর্মিলা তো কড়ার করিয়ে নিল, সকলে মিলে একদিন তার কোয়ার্টার্স-এও জমায়েত হতে হবে। তারপর তাদের সাগ্রহ প্রশ্ন, প্রোডিউ-সারের সঙ্গে আমার হিন্দী ছবির কথা-বার্তা পাকা হয়ে গেল কিনা।

ঘোষ সাহেব মাঝখানে ফোড়ন কাটলেন, পকেট কি-রকম বোঝাই করে ফিরলেন সেটা বরং জিগ্যেস কর।

ওরা সানন্দে বিশ্বাস করল, কারণ ওদের ধারণা বম্বের ফিল্‌ম জগতে টাকার গাছের ছড়াছড়ি, ধরে একবার নাড়া দিতে পারলেই ঝরঝর করে পড়ে। শমী আনন্দ করে বলে উঠল, তাই নাকি! তাহলে তো আমাদের আর একটা বড় খাওয়া পাওনা হয়ে থাকল!

রসিকতা করতে গিয়ে ঘোষ সাহেব একটা বড় রকমের সত্যি কথাই বলে ফেলেছেন। অনেক বার কাজের তাগিদেই বোম্বাই গেছি এসেছি, থোকে টাকাও কম পাইনি, কিন্তু এবারের মতো এমন পকেট বোঝাই করে আর কখনো ফিরিনি। খুশি মুখে সায় দিয়েছি, নিশ্চয়, যেদিন বলবে সে-দিনই হবে, তোমরাই ঠিক করো—

মেয়েটার মধ্যে সত্যি কৃত্রিমতা কম, সেটা অন্যভাবে প্রকাশ করল। —আগে বলুন কত টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে ফিরলেন, আমরা সেই বুঝে প্রোগ্রাম করব, শুধু খেলেই তো হবে না কি বলো বউদি?

আড় চোখে একবার ঘোষ সাহেবের মুখখানা দেখে নিয়ে জবাব দিলাম, আমার এবারকার প্রোডিউসার সবটাই অ্যাডভান্স করে দিয়েছেন—তোমরা খুশিমতো ইলাস্টিক প্রোগ্রাম করতে পারো।

জামাই তার গাড়িতে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল, তার প্রস্তাব নাকচ করে ঘোষ সাহেব বিকেল চারটে নাগাদ ট্যাক্সি ডাকিয়ে আমাকে নিয়ে রওনা হয়েছেন। তারপরেই বলেছেন, আপনিও তো মশাই ঝানু কম নন, পুলিশের ওপর একেবারে টেক্কা দিয়ে বসলেন! আমি গেলাম সাদা মনে একটু রসিকতা করতে—

আমি যতটুকু সম্ভব গম্ভীর। যতই খুশির চাল চালি এই লোকের গলা নিয়ে মনের তলায় একটা বড়-রকমের অস্থিরতা থিতিয়েই আছে। কথার মাঝে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, রসিকতা করতে গিয়ে আপনি একটু মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন, আর আমার দিক থেকে আমি নির্জলা সত্যি কথাই বলেছি।

—কি রকম? আপনি পকেট বোঝাই করে ফিরেছেন আর প্রোডিউসার আপনাকে সবটাই অ্যাডভান্স করে দিয়েছে?

এবারে হাসলাম। —আমার পকেট কতটা বোঝাই এখন আপনি জানবেন কি করে? আর, প্রোডিউসার সবই অ্যাডভান্স করেছে না-কিছু বাকি আছে সেটা আপনার থেকে ভালো আর কে জানে?

পরদিন সন্ধ্যার আগেই আমরা কাগজ-পত্র নিয়ে কলকাতার স্পেশালিস্ট ডাক্তারের কাছে হাজির। গ্রাফিক চার্টে একশ পঞ্চান্ন ইউনিট দেখে বেশ গম্ভীর। জিগ্যেস করলেন, তাঁদের কি অ্যাডভাইস ...এক্ষুনি অপারেশনের দিকে যেতে চান না তো?

মাথা নাড়লাম। কী অ্যাডভাইস বললাম।

সায় দিয়ে বললেন, আমারও তাই মত। ...এক দেড় বছর একই ভাবে চলছে, আরো বছর কতক যদি চলে তো চলুক না। তবে মাঝে

মাঝে গিয়ে চেক করাতে হবে, আর অসুবিধে বোধ করলে তো তড়ি-ঘড়ি করাতে হবে। তার আগে পর্যন্ত এক চিকিৎসা, পরে অন্য—

যা শুনতে চাইছি সে কথাটাই বলছেন না বলে ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছি। জিগ্যেস করলাম, আপনার চিকিৎসায় পরের বারের রিডিং তো কিছু নেমে আসতে পারে ?

ভদ্রলোক হেসেই ফেললেন একটু : —পারেই না এটা জোর দিয়ে বলছি না, তা নামলে চিন্তার তো অর্ধেক হয়ে গেল, তাহলে টিপিক্যাল ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ নয় বলে আশা করা যেতে পারে, একশ পঞ্চান্ন থেকে আর না বাড়ে সব ডাক্তারের কাছেই এটা এখন প্রথম চিন্তা।

ঘোষ সাহেব আস্তে আস্তে বললেন, আমার একটি ছেলে আর একটি মেয়ে···ম্যারেড অ্যাণ্ড কোয়াইট অ্যাডালট, তাদের কি কিছু জানানো উচিত মনে করেন ?

ডাক্তার বিস্মিত একটু। ···এতদিনের ব্যাপার, বম্বে গিয়ে টেস্ট করিয়ে এলেন···অথচ তাঁরা এখনো কিছুই জানে না বা সন্দেহও করেননি ?

—না, আমার এই বন্ধুটি সহজেই ম্যানেজ করেছেন, আর বাড়া-বাড়ি না হলে ভবিষ্যতেও ম্যানেজ করা যাবে—জানলে খুবই আপসেট হবে···তবু আপনার কি অ্যাডভাইস ?

—তাহলে জানাবার জন্য তাড়াহুড়ো করার কি আছে, বাড়লে তো আপনিই জানাজানি হবে, কিন্তু একইভাবে চললে তাদের আর উতলা করে লাভ কি ?

ভদ্রলোক বেশ ভেবে-চিন্তে প্রেসক্রিপশন লিখলেন। ওষুধ খুব বেশি নয়। সময় ধরে ধরে এক-একটা ব্লাড টেস্টের অ্যাডভাইসই বেশি।

পরদিন।

বিকেল তখন চারটে হবে। ঘোষ সাহেবের গাড়ি তাঁর দোর-গোড়ায় দাঁড়ানো। হীরু দাস চালাচ্ছিল। যাকে আশা করছিলাম

সে-ই কিনা দেখার জন্য রেলিঙে ঝুঁকলাম। হ্যাঁ, গাড়ি থেকে রাধা নামল। তারপরের যে-টুকু সে-টুকুই অপ্রত্যাশিত। রাধার হু'চোখ প্রথমে ও-বাড়ির দোতলার দিকে উঠল। বারান্দায় কেউ নেই। তারপর এ-বারান্দার দিকে ঘুরল। আমাকে দেখেই হু'হাত জোড় করে নিচ-তলার দরজার দিকটা দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ সানুনয়ে আমাকে চলে আসতে অনুরোধ করল।

রাধা এলে ঘোষ সাহেব একসময় আমাকে ডেকে পাঠাতে পারেন এমন একটা আশা আমার মনের তলায় ছিল। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় আমাকে দেখেই এই একজন সানুনয়ে আমাকে আসতে বলবে এ ভাবব কি করে। যা-ই হোক পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে চললাম।

দোতলায় উঠে দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে ঘোষ সাহেবের খুশির গলা কানে এলো, এত তাড়াতাড়ি এসে যাবি ভাবিনি—রাস্তা ফাঁকা ছিল বুঝি? মোড়াটা টেনে বোস্।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখছি দেয়ালে টাঙানো কালীর পটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম সেরে রাধা ফিরল। এবারে ঘোষ সাহেবের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

—এত প্রণামের কি আছে, বোস্ বোস্।

মোড়াটা কাছে টেনে বসল মনে হল। —কেমন আছ?

—খাসা, এই তিন চার দিনেই তরতাজা হয়ে ফিরেছি। সাড়া দিলাম, আসব?

কয়েক নিমেষ থমকালেন কিনা বোঝা গেল না। —আরে মুখুজ্জে মশাই নাকি, আসুন, আসুন—।

ভিতরে এসে দাঁড়াতেই সহাস্য প্রশ্ন, ওকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই এসে গেলেন নাকি?

জবাব রাধা দিল, উনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলেন, দেখে আমিই আসতে বলেছি। চট করে উঠে আর একটা মোড়া এনে সামনে রাখল। —বোসো বাবু।

ও ডেকেছে শুনে ঘোষ সাহেব একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমার দিকে তাকালেন। এভাবে ডাকাটা আমার কাছেও হুর্বোধ্য। আমি বসতে রাধা নিজের মোড়াটা আধ-হাত সরিয়ে নিয়ে বসল। ঠাণ্ডা হু'চোখ আমার দিকে।—ভালো বেড়ানো হল ?

হাসি মুখে ফিরে বললাম, তোমার বড়বাবু কী বলেন ?

জবাব দিল না, ঘোষ সাহেবের দিকেও তাকালো না। ঠাণ্ডা চাউনি আমার মুখের ওপরই পড়ে থাকল খানিক। তারপর রয়ে সয়ে যা বলল শুনে আমরা হুজনাই বিমূঢ়। —বড়বাবু সম্ভব হলে একশর মধ্যে একশ কথাই মিথ্যে বলে আমাকে, আর তোমার তো শুনি মিথ্যে বলাই পেশা, মাথা থেকে বানিয়ে গপ্প লেখো শুনি, তবু তোমাকেই জিগ্যেস করব বলেই ডেকেছি—যা বলব সত্যি জবাব দেবে না ভাঁওতা দেবে ?

হকচকিয়ে গিয়ে ঘোষ সাহেবের দিকে তাকালাম। তিনিও আমারই মত বিমূঢ়।

—অত চোখ তাকা-তাকি করার দরকার নেই, তোমরা বুদ্ধিমান বলে অন্য সকলেই ষোল আনা বোকা নয়। বোম্বাইয়ের ডাক্তার বড়বাবুর কী পরীক্ষা করল কী বলল, সব আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলো।—কি-চ্ছু ফাঁকি দেবে না।

আমি হাঁ হয়ে ঘোষ সাহেবের দিকে তাকালাম। তিনি আমার থেকেও ডবল হাঁ।

—তুই জানলি কি করে—বুঝলি কি করে ?

বিরক্ত ভাব। —এটুকু জানা বোঝা কি খুব বাহাছুরির কাজ। আমার কথায় এঁকে সঙ্গে করে তুমি অন্য ডাক্তার দেখালে চিকিচ্ছে করলে, তারপর এঁর হুট করে বোম্বাইতে কাজ পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও সেখানে বেড়াতে যাবার জন্য নেচে উঠলে—অথচ ছেলে-মেয়ে সাধ্য-সাধনা করলেও ঘর ছেড়ে নড়তে চাও না—বুঝেছি বলেই তক্ষুনি তোমার যাবার কথায় সায় দিয়েছিলাম—ছেলেমেয়ে হুটোকে বুঝতে দাওনি ভালো করেছ, আমাকে গোপন করার কি আছে ?

এখন কথা না বাড়িয়ে আগে সব বলো শুনি—

ঘোষ সাহেব বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে হাসতে লাগলেন। আমাকেই বললেন, আর রাখা-ঢাকার চেষ্টা করে লাভ নেই।

এরপর সাগ্রহেই আমি আদ্যোপান্ত বললাম, যতটা সম্ভব সহজ করে পরিস্থিতি বোঝাতে চেষ্টা করলাম।

অপলক চোখে তাকিয়ে এক মনে শুনল। তারপর হঠাৎ বে-খাপ্পা প্রশ্ন।—ধরো আর পাঁচ বেড়ে বেপদের ঘরেই এলো, তখন আর কোনো চিকিচ্ছেই নেই?

ঘোষ সাহেব জবাব দিলেন, থাকবে না কেন, তবে সেটা হল সব থেকে কঠিন অবস্থার চিকিৎসা—

তাঁর দিকে একটা আঙুল তুলে রাধা বলল, তুমি চুপ করে থাকো, যা বলার ইনি বলুন আবার আমার দিকে তাকালো।—যত কঠিন অবস্থাই হোক, চিকিচ্ছে যখন আছে, কেউ ভালো হয় কিনা, একজনও ভালো হয় কিনা?

তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, নিশ্চয় হয়।

চেয়ে আছে। যেন আমার মুখখানাই নিরক্ষণের বস্তু।—ডাক্তার যখন বলেছে পাঁচ সাত বছরও এ অবস্থায় থাকতে পারে…তা সে চের জেবন থাকতে পারে না কেন?

—পারে না এমন কথা কেউ বলেনি।…তবে ওই কঠিন রোগ হলে তা থাকে না।

অসহিষ্ণু।—কঠিন রোগ যে হয়েইছে এ-কথা এখনো তো কেউ হলপ করে বলতে পারেনি?

জবাব না দেওয়াই নিরাপদ ভাবলাম, কিন্তু ঘোষ সাহেব আলতো করে বলে বসলেন, জেনে-বুঝেও তুই নিজেই কী বলেছিস—কেবল ডাক্তার বদলানোর তাগিদ দিয়েছিস।

আস্তে আস্তে তাঁর দিকে ফিরল। চেয়ে আছে তো আছেই।—তোমার ভাবনা-টাবনা আর সব বালাই তুমি আমাকে দেছ কি দাওনি?

এবারে ঘোষ সাহেবের চেয়ে থাকার পালা একটু।—তোর কি মনে হয়, দিয়েছি না দিইনি?

—তাহলে এখন থেকে তুমি আমার কিছু কথা মেনে চলবে চিকিচ্ছে যেমন চলছে চলবে, তোমার এই বন্ধুটি নরম মনের ভালো মানুষ, খুব বুদ্ধি ধরেন, তোমার চিকিচ্ছের ব্যবস্থার ভার যখন নয়েছেন ও-ব্যাপারে কখন কী করতে হবে সে-চিন্তা তাঁর—তুমি কেবল ধরে নেবে তুমি ভালো আছ, তোমার কিছু হয়নি—কেবল ধরে নেবে না, বিশ্বাস করবে। দেহ যখন ধরেছ উপসর্গ থাকবেই। তারপরেও যদি দরকার হয় রাধা তোমার কথা ভাববে—দায় যখন দিয়ে দেছ—তোমার কি ভাবনা? আমার কথা তোমার মনে লাগছে?

ঘটা করে ঘোষ সাহেব আবার একটা বড নিঃশ্বাস ছাড়লেন। জবাব দিলেন, খুব সোজা করে বড কঠিন হুকুম করলি, এমন বিশ্বাস মনে লেগে থাকবে কি না এ-ও তুই জানিস।

কালো সুন্দর মুখখানা ভারি কোমল হয়ে এলো।—থাকবে গো থাকবে, তোমার চেষ্টার জোর এখন কত তার তুমি কী জানো—তোমার কেবল আনন্দে থাকা কাজ আর নিশ্চিন্ত থাকার চেষ্টা

আমার দিকে ফিরল, তারপর আঙুল তুলে সোজা দেওয়ালে টাঙানো কালীর ফোটোটা দেখালো।—ওই মেয়ে লডাই বড় ভালবাসে বুঝলে বাবু, নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গেও লড়াইয়ে নেমে যায়, কিন্তু লড়াইয়ে জিতলে কত দুঃখ পায় আর হারলে কত খুশি হয় এ-খপরটি আমার নিজের জেবন দিয়ে বুঝে নিয়েছি—বুঝলে বাবু? মোড়া ছেড়ে সোজা উঠে দাঁড়ালো, পটের দিকে দু'পা এগিয়ে গেলো। অদ্ভুত ধীর অথচ টনটনে গলায় বলল, আমিও দেখব তোর মুরোদ কত, হেরে হাসিস না জিতে কাঁদিস!

অভিভূত বিস্ময়ে চেয়ে আছি। মনে হল রাধার সরল শান্ত টানা দুই চোখে এই প্রথম আমি আগুন দেখলাম।…

দেখছি। দু'চোখ বুজে স্থির দাঁড়িয়ে রইলো খানিক। তারপর সুডোল দেহে একটু ঝাঁকুনি তুলে নিজেকে নিজের মধ্যে ফেরালো

যেন। আগের সেই শান্ত কোমল মুখ। ঘোষ সাহেবের দিকে ফিরল।
—হীরুকে ডাকো, আমি এক্ষুনি ফিরব।

ঘোষ সাহেবেরও সম্বিত ফিরল যেন।—সে কি! এত পথ যাবি একটু জলও তো মুখে দিলি না।

—আজ জল মুখে দেবার মন নিয়ে আসিনি বড়বাবু, আমার তাড়া আছে—

দরজার দিকে এগলো। নিজের অগোচরে আমিও মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ব্যস্ত হয়ে ঘোষ সাহেব হীরুর উদ্দেশে হাঁক-ডাক করে উঠলেন। হীরু প্রস্তুতই ছিল।

ঘোষ সাহেব সামনের বারান্দার রেলিংএ এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে আমিও। হীরু গাড়ির দরজা খুলে দিতে রাধা সোজা উঠে গেল। একটু পরেই গাড়ি চোখের আড়ালে।

ঘরে ফিরে আবার বসলাম আমরা। মনে হল ঘোষ সাহেবের ভেতরটাও এই মুহূর্তে দূরে সরে আছে। একটু হেসে জিগ্যেস করলেন, কী-রকম বুঝলেন মশাই?

একটু থেমে ফিরে জিগ্যেস করলাম, আমার থেকে আপনি ওঁকে ঢের ভালো জানেন…আপনি কী-রকম বুঝলেন?

বিমনা ভাব একটু। তারপরেই হাল্‌কা হবার চেষ্টা।—ও যা বলে গেল ভাবলে বোঝা সকলের পক্ষেই সোজা। …ডাক্তারদের বা আমাদের যা আশংকা ও তার উল্টো কিছু ভাবছে না বা বলছে না।

পরের প্রশ্নটা করে আমি নিজেই অপ্রস্তুত একটু।

—এ-রকম লড়াইয়ে আপনার বিশ্বাস আছে?

স্বস্তি, একটুও চিন্তিত বা বিব্রত দেখলাম না। হেসেই জবাব দিলেন, এ-সব লড়াইয়ের মর্ম বুঝি না খবর রাখি যে আমি বিশ্বাস করব? আমার আগের সেই উদ্বেগ আর নেই এটুকু শুধু বলতে পারি …আর আজ দেখে রাধার বিশ্বাসও কিছুটা আঁচ করতে পারি।

উৎসুক।—কী রকম?

—যত কঠিনই হোক জিতবে এই স্থির বিশ্বাস নিয়েই ও

লড়াইয়ে নামছে

ফিরে আসার পর অনেক সময় অনেকগুলো ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। আমি খুব আত্মস্থ বোধ করিনি। রাতে ভালো ঘুম হবে না মনে হলে আগে থাকতে কোনো-একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নিই। আজ শয্যা নেবার দু'ঘণ্টার মধ্যেও চোখে পাতায় এক হল না, তবু ওষুধের দিকে হাত বাড়াইনি কারণ জেগে থাকতেই ভালো লাগছে।

নিঃশব্দে উঠলাম। আবছা অন্ধকার সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। রাত কত দেখিনি। শহর ঘুমুচ্ছে।

বিস্ময় নয়, আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে মগজের কোষে কোষে কথা চলে কেবল বিশ্বাস নামে একটা শব্দ নিয়ে। দুর্জ্ঞেয় বিশ্বাসের মিছিল আমি কম দেখিনি। নিজে তার সঙ্গে ভিড়তে পারিনি, কিন্তু অজ্ঞতা বা দুর্বলতা বলে উড়িয়েও দিতে পারিনি।

...আজ কয়েক পলকের জন্য রাধার চোখে যে আগুন দেখলাম সে-ও বোধ করি বিশ্বাসেরই আগুন। এ-বিশ্বাস জয়ী হবে কি হবে না তা অনাগত ভবিষ্যত জানে পাঠককে আমি তার হদিস দিতে পারব না। কিন্তু এর আগেও আর একবার রাধার চোখে এ আগুন যিনি দেখেছেন, বিশ্বাসের এমনি আগুন দেখেছেন, আর জয়ী হতেও দেখেছেন—পাঠকের কাছে এখন আমি কেবল সেই বৃত্তান্তটুকুই পেশ করতে পারি

মৃত বুড়ীর দেহ পোস্টমর্টেমে যাবে, সেখানকার রিপোর্ট আসতে ঢের দেরি। কিন্তু তাকে যে গলা টিপে মারা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবার জিপ পাঠিয়ে ডাক্তার বিজন চৌধুরীকে আনিয়ে শব পরীক্ষা করানো হয়েছে। তিনিও নির্দ্বিধায় একই মত দিয়ে গেছেন। বুড়ীকে সনাক্ত করেছে রাধা। অতএব পুলিশকে এখন বিধিমতেই অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। অংশুমান রাধাকে আবার ওপরে নিয়ে গিয়ে ধমক-ধামক করেও আর খাওয়াতে পারেননি। তার আগে তাঁর

স্ত্রীর অনুনয় ব্যর্থ হয়েছে।

রাধার ঠাণ্ডা জবাব, চোখ দেখিও না বাবু, তোমাদের যা করার করো—আমার মুখে এখন কিছু উঠবে না।

সুচারু দেবী ব্যাকুল মুখে স্বামীকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছেন, ওকে এখন আর খাওয়ানো যাবে না, দোহাই তোমার ওকে আর একটি কটু কথা বোলো না।

অংশুমান তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, ওকে কিছু খাওয়াবার চেষ্টাতেই ও-রকম করে বলেছেন, ওকে নিয়ে যেটুকু কাজ তা শেষ হলেই জিপে করে ঘরে পৌঁছে দেবেন।

সুচারু দেবী আবার এসে রাধার হাত ধরে অনুনয় করেছেন, তোমাকে নিয়ে উনি এখন একটু তদন্ত করতে বেরুবেন, কিন্তু তুমি কথা দাও ওঁর সঙ্গেই আবার এখানে ফিরে এসে খাবে?

রাধা বলেছে, খাওয়াবার মন হলে তার অনেক সময় পাবে দিদি··· আগে বুঝতে দাও আমাকে বাঁচাতে মা-কালী ওই বুড়ীকে কেন নিল, কে ওই রাক্ষসীর কাছে এমন দয়া চেয়েছেলো?

অন্য তিন-চার কর্মচারীসহ রাধাকে নিয়ে অংশুমান কুলপির দিকেই সেই চাষের জমির পাশের 'কুজিঘরে' এসেছেন। তিনটে ঘরের মধ্যে রাধা শেষের ঘরটাকে দেখালো। ওই ঘরটায় ডাকাতেরা তাকে এনে তুলেছিল, পিদিম হাতে বুড়ী শিকল খুলে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় তাকে দেখে বলে উঠেছিল, ডাকাতরা তোকে জোর করে তুলে এনেছে—টাকার লোভে নিজে আসিসনি?

রাধা তখন নিশ্চিত জানে মা-কালী বুড়ী সেজে ওকে বাঁচাতে এসেছে, কারণ আকুল হয়ে ও তখন মা-কালীকেই ডাকছিল। কথা শুনে রাগই হয়ে গেছল, জোরে জোরে মাথা নেড়েছে।

কাছে নয় দূরে-দূরে কিছু জন-বসতি আছে। জিপে করে সে-দিকে গিয়ে অংশুমান কয়েকজন বয়স্ক লোকের কাছে বুড়ীর সম্পর্কে খবর নিয়েছেন। তারা কেউ ভালো বলল না। চাষের সময় ভিন্ন জমির মালিকেরা কোনো লোককে তারা ওই কুজিঘরে থাকতে

দেখেনা। ঘর তিনটে তখন ওই বুড়ীকেই আগলাতে দেখা যায়। সে জমির মালিকের লোক কিনা কেউ জানে না। ...ওই ঘরগুলো তখন মাতাল বদমায়েসের আড্ডা হয়ে ওঠে। সকলেরই ধারণা বুড়ীটা এদের কাছ থেকে টাকা-কড়ি পায়।

জমির মালিকের নাম শ্রীনাথ পোদ্দার, অনেক জায়গায় অনেক জমি-জমার মালিক, অর্থাৎ নাম-করা জোতদার। লক্ষ্মীকান্তপুরে নিবাস।

এই একটি নাম অংশুমান ঘোষের শোনা আছে। যে কয়েকটি শাঁসালো লোকের নাম আগের বন্ধু ও সি তাঁকে দিয়ে গেছলেন, এই নাম তাদের ওপরের সারিতে। তার পিছনে জোরালো রাজনৈতিক পার্টির মদত আছে। হাতে গুণ্ডা আর মাস্তানের দল। চালের সাদা-কালো কারবারে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। কলকাতায় মদের দোকান আছে, অন্য লোক চালায় কিন্তু আসল মালিক সে-ই। সুদে টাকা খাটায়, কিন্তু যে-সব খাতকের ঘরে সুন্দরী মেয়ে বউ আছে—তারা তার বদান্যতার প্রশংসা করে। মোট কথা লোকটার সব গুণই পুলিশের অনুকূলে। পুলিশ তার দিকে চোখ তুলে তাকানোর আগেই সবিনয়ে সে পর্যাপ্ত সম্মানদক্ষিণা দিয়ে থাকে। তার কোন পুকুরে বারো চৌদ্দ কিলো রুই কাতলার চাষ হয় কেউ জানে না, কিন্তু পূজা-পার্বনে নিজস্ব পুকুরের ও-রকম মাছের আস্বাদ থানার পদস্থ জনেরা পেয়ে থাকে। তার কাছে সর্ব-ধর্ম সমান, ঈদ বা বড়দিনকেও তুচ্ছ করে না, পর্যাপ্ত মাছ মাংসসহ বিদেশী বোতলও আসে। তাছাড়া সমাজের শান্তি-রক্ষকদের আমের দিনে আম-মিষ্টি, ইলিশের মৌসুমে গঙ্গার ইলিশ খাওয়ানোটাও তার কর্তব্য-কর্মের মধ্যে পড়ে। এই ফিরিস্তি দেবার পর গলা খাটো করে প্রাক্তন ও সি বন্ধুটি বলেছিলেন, শ্রীনাথ পোদ্দারের এ-সব দাক্ষিণ্যের অমর্যাদা করাটা কিন্তু থানার ও সি'র চাকরির পক্ষে খুব নিরাপদ নয়...।

ঘটনা-স্থল থেকে জিপে লক্ষ্মীকান্তপুরে আধ-ঘণ্টারও পথ নয়। পুলিশের গাড়ি তারও আগে শ্রীনাথ পোদ্দারের মস্ত দালানের সামনে

দাঁড়ালো।

অংশুমান পরিচয় দেওয়া মাত্র বক্তৃর বিবৃতির জ্যান্ত পট দেখলেন। দু'হাত জোড় করে কোমর পর্যন্ত মাথা নোয়ালো। পরনের দামী তাঁতের ধুতি খাটো করে পরা, গায়ে আদ্দির থ্রি-কোয়ারটার-হাতা ফতুয়া, গলায় সোনার হার। বছর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে বয়েস। ছিপছিপে দোহারা চেহারা গায়ের রং ফর্সা, নাকের নিচে কালো ভোমরার মতো এক ইঞ্চি প্রমাণ পুষ্ট গোঁফ। মাননীয় অতিথিকে নিয়ে কী করবে, কোথায় বসাবে ভেবে না পেয়ে অস্থির যেন। দীন কুটিরের বিলাস-বহুল বৈঠকখানায় এনে বসিয়ে বার বার খেদ প্রকাশ করল, বিশেষ কাজে তিন সপ্তাহের ওপর দিল্লিতে থাকতে হয়েছিল, ফিরে আসতে কলকাতার কর্তাদের তলব, মাত্র তিন চারদিন হল ঘরে ফিরে হাঁপ ফেলতে পেরেছে—আজ কালের মধ্যেই সে নিজে গিয়ে বড়বাবুর দর্শন-প্রার্থী হত—এই ক্রটিটুকু মাপ করতেই হবে, আগের সদাশয় ও সি তাকে খুব স্নেহ করতেন, তার খুব আশা এই ক্রটির জন্য নতুন বড়বাবুর কাছ থেকেও এই স্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে না, ইত্যাদি।

এই ধরনের মানুষকে চিনতে বা বুঝতে অংশুমানের সময় লাগার কথা নয়। মনে মনে হাসলেন, মুখে জানালেন, আগের ও সি মিস্টার চক্রবর্তীর কাছে তিনিও তার অনেক প্রশংসা শুনেছেন। বিশেষ ব্যস্ততার মধ্যে আছেন বলে আজ আর তিনি বসতে বা সময় দিতে পারছেন না। এরপর তাঁর আসার কারণ অর্থাৎ ঘটনা শুনে অতি বিনয়ী জোতদার শ্রীনাথ পোদ্দার হতবাক। বুড়ীর কথা বলামাত্র চিনল।

বুড়ীটার নাম জিগ্যেস করতে শ্রীনাথ তক্ষুনি মনে করতে পারল না। অন্য একজন স্মরণ করিয়ে দিল নাম কামিনী। শ্রীনাথ সখেদে জানান দিল, এই বুড়ীর সম্পর্কে পাঁচ-রকম কথা তার কানে আসছিল, ওকে ঘুষ দিয়ে অবাঞ্ছিত লোকেরা এসে নাকি রাত কাটিয়ে যায়, সে নিজেও ভাবছিল বুড়ীটাকে আর ওখানে রাখবে না, কিন্তু আশ্চর্য..

একটা মেয়ের মান ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে নিজে প্রাণটা দিল।

অংশুমান কান খাড়া করে কথা ক'টা শুনলেন। ত'রপর ফেরার জন্য পা বাড়ালেন। নামী অতিথির সেবা করা গেল না বলে শ্রীনাথ পোদ্দারের আর একপ্রস্থ খেদ। সঙ্গে সঙ্গে জিপ পর্যন্ত এলো। আসবে জানা কথাই।

বড়সড় জিপ। পিছনে নয়, নিজে ড্রাইভারের পাশে বসে রাধাকেও সামনেই বসতে দিয়েছিলেন। ডাকলেন, রাধা নেমে আয় তো একটু।

রাধা জিপ থেকে নামল। শ্রীনাথ পোদ্দারের দিকে চেয়ে অংশুমান কেবল একটু চোখের ইশারা করলেন। তাইতেই সে আরো দুই এক পা কাছে এগিয়ে এলো।...পরনে অংশুমানের স্ত্রীর দেওয়া সাদার ওপর বেগুনে ডুরের দামী শাড়ি, গায়ে তেমনি চকচকে নতুন হালকা বেগনি রঙের ব্লাউস, স্নানের পর মহিলা নিজের হাতে চুল বেঁধে দিয়েছিলেন। থমথমে মুখ সত্ত্বেও নিটোল যৌবনা মেয়েটাকে দেখাচ্ছিল বড় সুন্দর। দেখার নামে শ্রীনাথ পোদ্দারের দু'চোখ তার সর্বাঙ্গ লেহন করল একপ্রস্থ। কিন্তু চতুর মানুষের আত্মস্থ হতে সময় লাগল না বড়বাবুর দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, একেই ডাকাতে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার জমির কুজিঘরে নিয়ে তুলেছিল?

অংশুমান মাথা নাড়লেন। দু'চোখ রাধার মুখের ওপর। রাধা অপলক চোখে শ্রীনাথ পোদ্দারকেই দেখছে।

—এ কোন্ গাঁয়ের মেয়ে? ডাকাতের খপ্পরে পড়ল কী করে?

—মাতন গাঁয়ের।...আমারও এখন অনেক কিছু জানতে বাকি, বুড়ীকে চেনে এমন কাউকে এখুনি আপনি আমার থানায় পাঠিয়ে দিন, পোস্টমর্টেমে নিয়ে যাবার আগে সনাক্ত করবে, চলি—

শ্রীনাথ পোদ্দার যুক্ত করে আবার আনত হল।

জিপ চলতে অংশুমান গলা খাটো করে জিগ্যেস করলেন, এই লোকটাকে বা তার সঙ্গে যারা ছিল কাউকে কখনো দেখেছিস?

রাধা মাথা নাড়ল। দেখেনি।

…ওই লোকটাকে তুই ও-ভাবে দেখছিলি কেন ?

—ওর কুজিঘর বলল, তাই।…লোকটা ভালো না।

—ও তো মস্ত লোক, ভালো না তোকে কে বলল ?

—কেউ না। আমার মনে এলো।

—ওই তিন ডাকাতের কাউকে যদি দেখিস চিনতে পারবি ?

—জঙ্গলের আন্ধার থেকে টেনে নে আন্ধার পথে গেছল, হাত-মুখ বেন্ধে আন্ধার ঘরে ফেলে রেখেছিল, মুখগুলো খুব আবছা চোখে লেগে আছে…ঠিক চেনতে পারবনি

ওখান থেকে অংশুমান বিবিমায়ের থানে এলেন একাই নেমে খোঁজ নিতে গেলেন বিবিমায়ের পূজো করে শফিদার মা শফিদা জানালো, রাধা দিদির বাড়িতে কী গণ্ডগোলের কথা শুনে তার মা সেখানে গেছে

—রাধা কাল কখন এখানে এসেছিল আর কখন চলে গেছল ?

জবাব, দুকুরে এয়েছিল, রেতে গেছে, আগে অনেকক্ষণ থাকে।

—রাতে জংলা পথে একলা ফেরে ?

মেয়েটা ঘাড় কাত করল। মুখেও বলল, রাধা দিদির কুনো ভয়-ডর লাইগো বাবু।

বেলা সাড়ে দশটা। রাধার চালা-ঘরের সামনে তখন ভিড় জমে গেছে। গতকাল বেলাবেলি মেয়ে বেরিয়েছে, সমস্ত রাতের মধ্যে আর দেখা নেই সেটাই উত্তেজনার ব্যাপার। রাতে রাধার ঘরের সামনের দাওয়ায় যে বয়স্কা মেয়েলোকটি ঘুমোয় আর দিনমানেও বেশির ভাগ সময় এখানে পড়ে থাকে তার নাম বিলাসী। আগে শ্মশানে রাত কাটাতো, কপালী বাবাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে, রাধার বাপ মরে যাওয়ার পর থেকে কপালী বাবার হুকুমে সে রাধার কাছে থাকে। ভাইটা তো বাপ মারা যাবার পরে-পরেই নিরুদ্দেশ। রাধা খুশি মনেই তার খাওয়া দাওয়ার ভার নিয়েছে। রাত পর্যন্ত আসছে না দেখেও বিলাসী উতলা হয়নি। কারণ এটা কোনরকম অনিয়মের মধ্যে পড়ে না। কোথাও গাইতে গেলে ফিরতে রাত হয়, কপালী

বাবার সঙ্গে শ্মশানে বা তাঁর ডেরার জংলি কালীর কাছে গিয়ে বসলেও ফিরতে কত সময় বেশি রাত হয়ে যায়।

দাওয়ায় পড়ে এক ঘুম দিয়ে ওঠার পরেও বিলাসী ঘরে চুপি দিয়ে দেখে রাধা নেই। কত রাত জানে না, কিন্তু গহিন রাত এটুকু আন্দাজ করতে পেরেছে। তখন দুর্ভাবনা শুরু হয়েছে।

…শনি মঙ্গলের রাত কপালী বাবা শ্মশানে কাটান। অন্য পাঁচ দিন ঘরেই নিজের জংলি কালীর পুজো নিয়ে থাকেন। রাধার ঘর থেকে পিছনের পুকুর পার দিয়ে জংলা পথ ধরে গেলে দশ মিনিটের মধ্যে তার ডেরায় যাওয়া যায়। আর সামনের ঘুর পথ ধরলে মিনিট পনেরো লাগে। কপালী বাবার আজ ঘরেই থাকার কথা। কিন্তু এত রাতে বিলাসীর পিছনের জংলা পথ ধরে যেতে সাহস হয়নি। ঘরের শিকল তুলে দিয়ে লণ্ঠন নিয়ে সামনের রাস্তা ধরেই গেছে। গিয়ে দেখে জংলি কালীর সামনে মাটির মেঝেতে শুয়ে বাবা গভীর ঘুমে। ভয়ে ভয়ে তাঁকে ঠেলে তুলল।

রাধা এত রাতেও ঘরে ফেরেনি শুনে তিনি হকচকিয়ে গেলেন। মায়ের মূর্তির দিকে খানিক চেয়ে থেকে বিলাসীকে বললেন, এত রাতে আর কোথায় খোঁজ করব, তুই ঘরে যা, আমি সকাল হলেই যাচ্ছি।

এসেছেন। গত দিনে কখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিল আর কোথায় গেছল জিগ্যেস করেছেন। তারপর দাড়িতে খানিক হাত বুলিয়ে বলেছেন, এক কাজ কর, মনোহর পাইকের ঘর চিনিস তো?…পা চালিয়ে চলে যা, বলবি আমি এক্ষুনি ডাকছি।

মনোহর পাইকের ডেরা এখান থেকে মাইলটাক দূরে।

মনোহর পাইক বাবার সাম্প্রতিক কালের ভক্ত। বছর পাঁচেক আগেও রাধাকে জ্বালাত বলে বাবাটি ওকে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করেছিলেন। মনোহর এখন তা বলে বাবার সাধন-ভজনের ভক্ত নয়, তেল-তত্ত্ব এবং তোয়াজ তোষামোদ কলায় সিদ্ধ-হস্ত। তার বাপ সাইকেল রিকশ চালাতো, সেই বাপ দু'বছর হল গত হয়েছে, মনোহর পাইক তার বাবু ছেলে। ঘরে বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। বছর

পঁচিশ ছাব্বিশ বয়েস এখন, রাধার থেকে বছর ছ'সাত বড়। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তার রাধার দিকে চোখ। উপযুক্ত ছেলের বিয়ে দেবার জন্য তার মা নাকি মাথা খুঁড়ছে, কিন্তু ছেলের বিয়েতে মতি নেই। বাপ রিকশ চালাতো, ছেলে ঝকঝকে একটা শৌখিন সাইকেলে চেপে গ্রাম শহরে টহল দিয়ে বেড়ায়। পরনে সর্বদা চকচকে চোঙা প্যাণ্ট, গায়ে নানা রঙ বেরঙের দামী জামা, হাতে ঘড়ি, পায়ে পালিশ করা জুতো, মুখের সিগারেট কপালী বাবা কখনো দেখেন নি কিন্তু শ্রদ্ধাবনত হয়ে সামনে এলে গন্ধ পান। বাবার প্রতি তার বিগলিত ভক্তির একটাই কারণ। রাধার গার্জেন বলতে এখন কপালী বাবা। মনোহরের বড় আশা এই বাবাটি যদি একবার মুখ খোলেন বা হুকুম করেন, রাধা সুড়সুড় করে তার ঘরে চলে আসবে। সাহস করে কপালী বাবার একটা দুর্বল জায়গায় হাত ফেলতে পেরেছে মনোহর। রক্তাম্বর ধুতি চাদর দিয়ে প্রণিপাত শুরু করেছিল, সেটা এখন 'কারণে' দাঁড়িয়েছে। দিশির মধ্যে সেরা অর্থাৎ যাকে বলে 'বেলায়তি', সে-রকম এক-একটা বোতল এনে তাঁর চরণের সামনে রাখে। এই কারণ-সুধার স্বাদ তিনি কমই পান। ভক্তদের মধ্যে যারা যা এনে দেয় তা নির্জলা দিশি, আর··· সঙ্গে যা পান করেন তা একেবারেই চোলাই। আগে শববাহকরা যা একটু ভালো-মন্দ বাবাকে খাওয়াত ওই মনোহরের ভক্তির ঠেলায় তার থেকেও ভালো জিনিস জুটছে।

তার উদ্দেশ্য কপালী বাবা গোড়া থেকেই জানেন। তাই প্রথম দিন পায়ের কাছে বোতল রাখতেই চোখ লাল করে তার দিকে তাকিয়েছিলেন।—তোর তাহলে এ-সব চলে ?

জিভ কেটে নাক-কান মলে মনোহর মাথা নেড়েছে। খায় না। এই 'কারণ' প্রণামীর গুণেই মনোহরের কিছুটা অন্তরঙ্গ হওয়া সহজ হয়েছে। বাবা খোলাখুলি জিগ্যেস করেছেন, তোর বাপ তো রিকশ চালাতো, তুই এত বাবুয়ানি করার টাকা পাস কোথায় ?

মনোহর তক্ষুনি কালীর দিব্বি কেটে বলেছে, তার সবই উপার্জনের টাকা, হকের টাকা, দিন-কাল বুঝে সে কাজের লাইন বদলেছে,

তাইতেই ভালো রোজগার হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, কী কাজ করিস তুই?

মনোহর দালাল শব্দটা মুখে উচ্চারণ করেনি। বাবাকে বুঝিয়েছে, সব লেন-দেনের কাজের মধ্যেই আজকাল মাঝখানে একজন লোক থাকে, যে দুই পার্টির যোগাযোগ করিয়ে দেয়। যেমন একজন টাকার দরকারে জমি বেচবে আর একজন কিনে বাড়তি টাকা খরচ করবে—দু'জনের যোগাযোগ করিয়ে দিলে দু'তরফ থেকেই তার কিছু পাওনা হয়। তেমনি কারো চালের আড়ত আছে, সে তিন টাকা কিলো দরে একশ বস্তা চাল ছাড়বে, আবার কলকাতার কোনো চালের ব্যবসায়ী চাল দেখে সাড়ে তিন টাকা দরে সেই চাল কিনতে রাজী, তার তখন কিলো প্রতি আট আনা লাভ—মাল পৌঁছে দেওয়ার খরচ-খরচা বাদ দিয়েও কিলো প্রতি চার পাঁচ আনা নেট লাভ তো থাকবেই।

কপালী বাবার দু'চোখ কপালে —বলিস কি রে?

তার আসল রোজগার যে চোলাইয়ের দালালি থেকে এটা মুখ ফুটে বলার মতো বোকা সে নয়। চোলাই তৈরি করে এমন তিন-তিনটি ঘাঁটির মাল মেয়ে মজুবনির মারফত নানা জায়গায় চালান করেই কাঁচা টাকার মুখ দেখছে সে।

কপালী বাবার বিবেচনায় ছেলেটা চৌকসই বটে। অতএব রাধার মন বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। শুনেই রাধা ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, ওটা হাড়-বজ্জাত, খবদ্দার তুমি ওকে আস্কারা দেবে না বাবা!

কারণের লোভে এ-মেয়েকে তার অনিচ্ছায় কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার লোক নন তিনি। তাকে সোজা বলেছেন, যা চাইবার সোজা মায়ের কাছে চাইবি, মা মঞ্জুর করলে সব পাওয়া যায়, নইলে লবডঙ্কা।

আরজি নিয়ে মা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে এ বিশ্বাস মনোহরের নিজেরও নেই। অতএব এ ব্যাপারেও সে কপালী বাবাকে মিডলম্যান হিসাবেই তোয়াজ করে চলেছে।

বিলাসীর মুখে খবর শুনে মনোহর তার সাইকেল উড়িয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে এলো। কপালী বাবা তীক্ষ্ণ চোখে প্রথমে তাকে

নিরীক্ষণ করেছেন।—রাধা কাল ছুপুরে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি···তার কী হতে পারে ?

মনোহর আর্তনাদ করে উঠল, অন্তর্যামী হয়ে বাবা আপনি আমাকে শুধাচ্ছেন ?

ভেবে চিন্তে কপালী বাবা তাকে বিবিমায়ের থানে, তারপর বড় পীরের মাজারে আর একবার শ্মশানে খবর নিয়ে আসতে বললেন।

মনোহর পাইক আবার সাইকেলে উড়ে গেছে। মিনিট চল্লিশের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরেছে। তাব খবর, বিবিমায়ের থান থেকে রাধা একটু রাতেই রওনা হয়েছিল, মাজারে বা শ্মশানে তার কোনো খবর নেই।

কপালী বাবা বলেছেন, চট্ করে একবার বিষ্টুপুরে ওর বোনাই হারাণ মণ্ডলের কাছ থেকে ঘুরে আয়, সেখানে যদি গিয়ে থাকে—

হারাণ মণ্ডল লোকটাকে ছু'চক্ষে দেখতে পারে না মনোহর। তার ধারণা, বয়সে চৌদ্দ পনেরো বছরের বড় হলেও ওই লোকটারই শালীর ওপর সব থেকে বেশি চোখ। এমন খবরও বিলাসীর মারফত কানে এসেছে বিয়ের প্রস্তাব দিতে রাধা নাকি তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল। বাবার পেয়ারের চেলাকে বিলাসী বলবেই বা না কেন ? বিলাসী তাকে সুনজরেই দেখে।

মনোহর গলায় প্রতিবাদের সুর তুলেছে, রাধা সেখেনে যেতে যাবে কেন ?

—একবার গিয়েই ছাখ্ না, হাজার হোক বোনাই তো···মান ভাঙাবার জন্যও তো গিয়ে থাকতে পারে।

অর্থাৎ বিলাসী তাকে গোপনে যে খবরটা দিয়েছে, বাবাকেও তা বলতে বাকি রাখেনি। ঐ সম্ভাবনার কথা শোনামাত্র মনোহরের বুকের ভিতরটা চিনচিন করে উঠেছে। তক্ষুনি সাইকেলে উঠে ছুটেছে। তিন কোয়ারটারের মধ্যে হারাণ মণ্ডলকে সাইকেলের ক্যারিয়ারে তুলে নিয়ে ফিরেছে। এ সংবাদ শুনে সে-ই বা ঘরে বসে থাকে কী করে ?

এই করে বেলা বেড়েছে আর লোক বেড়েছে। বিবিমায়ের থান থেকে শফিদার মা এসেছে, বড় পীরের মাজার থেকে তাজউদ্দীন পীর সাহেব এসেছে, প্রথমে কাছের, পরে দূরের প্রতিবেশীরাও এসেছে। কপালী বাবা, শফিদার মা আর পীর সাহেব একত্র হলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ছুটে আসবেই, আধ-মাইল দূর থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসেছে নিতাই স্যাকরা। রাধার কোনো প্রেমিক নেই, তা বলে রাধাকেও কেউ প্রেমিকার চোখে দেখবে না এ তো আর নয়। মনোহর পাইক আর হারাণ মণ্ডলের পরে তৃতীয় দাবিদার নিতাই স্যাকরা। সাত আর পাঁচ বছরেব তুটো ছেলে মেয়ের বাপ, ছেলে হবাব ছ'মাসের মধ্যে তার বউ সূতিকায় মরেছে। হারাণ মণ্ডলের কাছাকাছি বয়েস, তু'জনে বন্ধুও ছিল, আর তু'জনেরই উনিশ-বিশ একই রকমের কপাল। তফাতের মধ্যে হারাণের শিশু সন্তান তুটোও মরেছে, সে ঝাড়া হাত পা, আর নিতাই স্যাকরার ছেলে মেয়ে তুইই বেঁচে, তাদের স্বাস্থ্যও ভালো। নিতাইয়ের সঙ্গে হারাণ মণ্ডলের মনোমালিন্যও বাধাকে নিয়েই। রাধার মুরুব্বি হিসেবে হারাণের ইচ্ছেটা নিতাই তার কাছেই প্রকাশ করেছিল। ফলে এখন মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

…তা সবার সেরা অর্থাৎ সব থেকে উত্তেজনার খবরটি সে-ই এনেছে। এ-খবরের যোগানদার যে-সে লোক নয়, সকলের সব থেকে পরিচিত এবং শ্রদ্ধার মানুষ ডাক্তার বিজন চৌধুরী। খানিক আগে তিনি বৃদ্ধ কালী ভক্ত দোতারাবাবুকে দেখতে এসেছিলেন। দোতারা-বাবু রাধাকে খুব স্নেহ করেন, মাঝে মাঝে ডেকে এনে গান শোনেন। বছরে তু'তিনবার রাধাকে তিনি টাকা-কাপড় ছ্যান। তাকে দেখতে এসে বিজন ডাক্তার রাধার তুর্বিপাকের কথা বলেছেন। রাধাকে তিন ডাকাত জঙ্গল থেকে মুখ বেঁধে নিয়ে কুলপির কাছে এক চাষের জমির কুঁড়েঘরে এনে তুলেছিল। ওকে বেঁধে ফেলে রেখে ডাকাতরা ফুর্তি কবার জন্য মদ কিনতে গেছল। সেই ফাঁকে এক বুড়ী এসে তাকে উদ্ধার করে। খুব সম্ভব রাগের চোটে ওই ডাকাতরাই বুড়ীকে গলা

টিপে মেরে ফেলে। বিজন ডাক্তার সেই বুড়ীকে দেখে তবে দোতারা-বাবুর কাছে এসেছেন। রাধা এখনো থানার ও সি ঘোষ সাহেবের হেপাজতে কাল রাত থেকে আছে।

দোতারা বাবুর বাজার সরকার নিতাইয়ের বন্ধু। তার দোকানে বসে তেষ্টা মেটায়। রাধার ব্যাপারে বন্ধুর মনও জানে। খবরটা শুনে সবার আগে সে বন্ধুকে জানানো কর্তব্য ভেবেছে। নিতাই স্যাকরা সবে তখন দোকানের ঝাঁপ খুলতে যাচ্ছিল। দোকানের চিন্তা মাথায় তুলে সে ছুটতে ছুটতে রাধার ডেরায় এসেছে এবং সকলকে হালের খবর দিয়েছে। এর পর লোক আসা বাড়তেই থেকেছে।

জিপ থেকে আগে রাধা নামল। তার বেশবাস দেখে অন্য সকলে ছেড়ে কপালী বাবা পর্যন্ত অবাক। মুখখানা বেজায় গম্ভীর অবশ্য, কিন্তু নতুন দামী জামা-কাপড়ে দেখাচ্ছে কি সুন্দর। তারপরেই থানার ও সি সাহেবকে নামতে দেখে কার মুখে আর কথা সরবে ?

কপালী বাবা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে। তাঁর পাশে পীর সাহেব আর শফিদার মা। উঠোন ধরে এগিয়ে গিয়ে রাধা আগে কপালী বাবার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল। তারপর অন্য দু'জনকে। রক্তাম্বর বেশে কপালী বাবাকে অংশুমান সেই প্রথম দেখলেন। অন্য দু'জনকেও, কিন্তু এই একজনকেই মেয়েটার গুরু মনে হল। থানায় ফেরা ছাড়া তাঁর আর করণীয় কিছু নেই এখন। তবু দাওয়ায় উঠে একবার সামনের ঘরটার ভিতরে উঁকি দিলেন। মাটির ঘরের তকতকে মেঝের কোণে অনেকগুলো ছোটবড় দেব-দেবীর ফোটো দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো :

বিবি মায়ের থান থেকে ফেরার সময় অংশুমানেরও কেন যেন ইচ্ছে হয়েছিল মেয়েটাকে আবার থানায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর হাতে তুলে দেন। মুখ ফুটে সে-প্রস্তাবও করেছিলেন। রাধা মাথা নেড়েছে, এখন না।

—কেন, তুই তো বুঝতে চেয়েছিলি, তোকে বাঁচানোর জন্য তোর

মা-কালী ওই বুড়ীকে কেন নিল।...তা আমি যা খবর পেলাম বুড়ীটা ভালো লোক ছিল না, ওকে টাকা খাইয়ে অনেক বদ লোক ওখানে আশ্রয় নিত, মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তিও করত, তোর বেলায় তার সুমতি হয়েছিল, তার ফল পেল, আর বোঝার কী আছে?

রাধা তাঁর দিকে তাকায়নি, সামনে চোখ রেখে বলেছিল, মা-কালী ওর ওপর ভর না করলে তার এমন সুমতি হতে যাবে কেন...।

—তাই না-হয় হল, কিন্তু তোর বোঝা তো হয়ে গেলো, এখন যেতে আপত্তি কি?

—না।...তোমার কাজ হয়ে গিয়ে থাকে তো আমাকে এখানেই ছাড়ি দিতে পারো।

আর জোর না করে অংশুমান তাকে তার ডেরায় নিয়ে এসেছেন। ঘরটা একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে আর অনুরোধ না করে চলে গেলেন।

রাধা তার ঘরের মধ্যে।

মাতনের চার ভাগের তিন ভাগ বাসিন্দা মুসলমান, বাকিরা নানা বর্ণের হিন্দু। ভিড় করে আছে যারা তারা প্রায় সকলেই সাধারণ মানুষ, রাধাকে বেশির ভাগই ভালবাসে। মেয়েটার কী হল, চূড়ান্ত সর্বনাশ কিছু হয়ে গেল কিনা এটা জানা বোঝার জন্য তারা ব্যাকুল। যদিও অনেকেরই বিশ্বাস (তাকে দেখার পর আরো বেশি) এ-মেয়ের বড় ক্ষতি করার সাধ্য কারো নেই। আবার এই রাধা-অঙ্গের প্রতি ভিতরে ভিতরে লুব্ধ জোয়ান মরদও বেশ কিছু আছে, আর তার চলন বাঁকা দেখে এমন মেয়ে-পুরুষও নেই এমন নয়। তাই কপালী বাবার আদেশ আর ফকির সাহেব তাজউদ্দীন আর বিবিমায়ের পূজারিণী শফিদার মায়ের অনুরোধে ভক্ত হিন্দু মুসলমানদের বেশির ভাগই চলে গেল বটে, আবার অনেকে ভালো করে জানা বোঝার জন্য দাঁড়িয়েও রইলো। এবারে কপালী বাবা তেড়ে এলেন, তাঁকে সাহায্য করল মনোহর পাইক আর নিতাই স্যাকরা। শেষ পর্যন্ত ভগ্নিপতি হারাণ মণ্ডল, মনোহর পাইক আর নিতাই স্যাকরা ছাড়া

একে একে সকলেই চলে গেল।

রাধা তার মাটির ঘরে দরজার হাত দুই দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তিন জন ছাড়া বাকি লোকদের চলে যেতে দেখল। অবশ্য তাজউদ্দীন, শফিদার মা আর কপালী বাবা ছাড়া। এবারে মাটির উঠোনের মনোহর আর নিতাইয়ের সঙ্গে রাধার চোখাচোখি। আঙুল তুলে রাগত মুখে তাদের দেখিয়ে কপালী বাবাকে ইশারা করল, ওদেরও চলে যেতে বলো।

কপালী বাবা মনোহরের ওপর সদয় একটু, তাকে বললেন, সকাল থেকে তুই অনেক করেছিস বাবা, এখন ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করগে যা। তারপর নিতাইযের দিকে ফিরলেন, তুই দাঁড়িয়ে কেন বাপু, এক্ষুনি কোনো গয়না-পত্র বানানোর অর্ডার পাবার আশায় নাকি?

মনোহর ক্ষুব্ধ হয়ে তার সাইকেল নিয়ে চলে গেছে, আর কপালী বাবার মুখের কথা শেষ হবার আগেই নিতাই স্যাকরা প্রস্থান করেছে। রাধার দু'চোখ এবার ভগ্নিপতির মুখের উপর।

চৌদ্দ বছরের বড় হাবাণ মণ্ডল কুঁকড়ে গিয়ে একবার কপালী বাধা আর একবার শালীর দিকে তাকালো। অর্থাৎ আদেশ বা ইংগীত পেলেই সে-ও উঠোন ছেড়ে প্রস্থান করবে। কিন্তু রাধা কেবল একটু চেয়েই রইলো, কিছু বলল না বা ইশারা করল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে উঠোনের বাইরে এসে দাঁড়ালো। কপালী বাবা তাকে ডাকিয়ে এনেছে, আদেশ না পেলে যায় কি করে।

ফকির সাহেব, শফিদার মা আর কপালী বাবা এবারে ঘরে ঢুকলেন। তারা জানা বা শোনার জন্য কম উৎসুক নয়। মেঝেতে বসে অল্প কথায় রাধা তবু অঘটনের ব্যাপারটা বলল একসঙ্গে ডালে-চালে কয়েকটা আলু-বেগুন ফেলে বিলাসীও দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতেছে। সব শুনে তাজউদ্দীন বললেন, বড় পীরের দোয়া, বেটীকে বড় ভালবাসেন। শফিদার মা বললেন, বিবিমায়ের কাছে আমি পুজো দেব। আর কপালী বাবা বেশ রাগ করেই বললেন, কত দিন তোকে সাবধান করেছি রাত দুপুরে জঙ্গলের পথে ফিরবি না?

বিমনার মতো রাধা বলল, তাই তো দেখছি গো বাবা, অমন রাত করে তো কত ফিরি, কিন্তু সেদিন বিবিমায়ের থান থেকে জাঙল পথে পা ফেলতেই আমার মনে ডাক দেছিল···কিন্তু তুমি তো জানো ডাক দিলেই মা-কে পরখ কবার ঝোঁক বাড়ে আমার···

বাধার এই মনে ডাক দেওয়া আর তার মেজাজের বা রীতির ষোল আনা বুঝতে হলে এবারে বছর পাঁচ ছয় একটু পিছনে তাকানো দরকার।

তখন কত্ত বা বয়েস, তেরো ছাড়িয়ে চৌদ্দও নয়। এর ঢের আগে থেকেই চার বছরের ছোট ভাই বাবুয়াকে নিয়ে বাবা পথে পথে গান গাইতে বেরিয়ে যায়। দূরে গেলে সন্ধ্যার আগে আর ফেরে না। পাঁচ গাঁয়ে, শহরে, এমন কি কলকাতায়ও বাবার উদাত্ত গলার সেই ভক্তিমূলক গানের খুব কদর ছিল। মেয়ে হলেও রাধা বাবার গলার টনটনে স্বর পেয়েছে, সুর জ্ঞান পেয়েছে। বাবা হাতে গোনা কয়েকটা গান গেয়ে সর্বত্র ভালো পয়সা পেত। বিশেষ করে দুটো গান :

‘গিরি এবার উমা এলে,
আর উমায় পাঠাব না,
বলে বলবে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়,
উমা নেবার কথা কয়,
এবারে মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মানব না।’

সকলের মতো আর একটা গানও রাধার দারুণ ভালো লাগত।

সেটা শিব-স্তোত্র। বাবার মুখে শুনে শুনে ওই গানও মুখস্ত। একই সুরে রাধা সেটাও গাইতো। কিন্তু বাবার গম্ভীর গমগমে গলার সে-গান যেমন স্নায়ুতে ঝংকার তুলত, ওর গলায় সে-রকম হত না। আর ভাইয়ের চিঁ-চিঁ গলায় সে গান শুনলে রাধা হেসে লুটোপুটি খেত।

···বাবা প্রথমে যেন পেটের নিচ থেকে 'ওম' বলে একটা শব্দ বার করে মিনিট খানেক ধরে রাখত। তারপর গাইত :

'জয় শিব-শংকর, হর ত্রিপুরারি,
সাধক জনগণ মানসবিহারী ॥
ত্রিলোকপালক, ত্রিলোকনাশক,
পরাৎপর প্রভু, মোক্ষবিধায়ক ॥
করুণনয়নে হের ভকতজনে,
লয়েছি শরণ চরণে তোমারি ॥'

এই গান রাধার যতই ভালো লাগুক, শিব-শংকরের মূর্তি যতই চোখে ভেসে উঠুক, ও এ গান গাইলে যেন বাবার গানই মাটি। কিন্তু আগের গানটা বাবা বাবুয়াকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে সে কত জায়গায় গেয়েছে ঠিক নেই। 'গিরি এবার উমা এলে আর উমায় পাঠাবো না' বলে সুর চড়ালেঃ অদ্ভুত একটা শিহরণ জাগত। মনে হত ও নয়, এ গান যেন ওর মা গাইছে, আর রাধাই যেন উমা, তাকে স্বামীর ঘরে পাঠানো না পাঠানো নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাবার বোঝাপড়া হচ্ছে।

মেয়ে যে জন্মগত ভাবে গানের গলা পেয়েছে সুর-ভাব পেয়েছে এটা বাবারও মনে হত। মায়ের গান দু'চারটে তো প্রথম বাবার কাছেই শিখেছে। কিন্তু রাধার মনে বড় দুঃখ বাবা ভাইকে নিয়ে গাইতে বেরোয়, ওকে নিয়ে নয়। ওর ধারণা, ওকে নিয়ে বেরুলে বাবার এর থেকে ঢের বেশি রোজগার হবে। কিন্তু বাবা মোটে কানই পাতে না। বায়না ধরলে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। বলে, হুঁঃ, তোকে এ-সবের মধ্যে টেনে শেষে আমি বিপদে পড়ি আর কি, বড় হচ্ছিস খেয়াল আছে···

বাবার সঙ্গে বেরুবে, গান করবে, মায়ের নাম করবে তাতে বিপদ

কি হতে পারে রাধা ভেবেই পায় না। বাবার কথাগুলো সর্বক্ষণ মাথার মধ্যে নড়াচড়া করেছে। রাতে স্বপ্ন দেখল, কপালী বাবার জংলি কালী ওর দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে আর বলছে, কাজ নেই বাপু আমার নাম করার জন্য পথে বেরিয়ে, কখন কি বিপদ হয় ঠিক আছে। ঘরের মেয়ে ঘরে থাক্—।

এ-স্বপ্ন রাধা কোনদিন ভুলবে না। কপালী বাবার ডেরায় তার জংলি কালীর সঙ্গে রাধার বলতে গেলে প্রায় রোজই দেখা হয়। হবে না কেন, সকালের খাওয়া খেয়ে বাবুয়াকে নিয়ে বাবা সমস্ত দিনের মতো বেরিয়ে পড়তে রাধার আর বাধা কোথায়?

বেপাড়ায় টহল, জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে। কপালী বাবার ডেরায় যায়, সপ্তাহের শনি মঙ্গল বারে তিনি বিষ্টুপুরের শ্মশানে থাকেন, কম দূর নয় কিন্তু রাধা দিব্বি হেঁটে চলে যায়, আরো দূরে বিবিমায়ের মন্দিরে যায়—বুড়ো ফকির সাহেব ওকে বড় ভালবাসেন, বড় পীরের সমাধি দেখিয়ে তিনি কত জাগ্রত ওর কাছে তাই নিয়ে কত গল্প করেন। আবার পর-পর তিন-চার দিন ওকে না দেখলে শফিদার মা বলেন, ক'দিন দেখা নেই বিবিমায়ের ওপর টান চলে গেল নাকি তোর!

কমা দূরে থাক এ-সব জায়গায় আসার টান রাধার বেড়েই চলেছে। ···বড় পীরের মাজারে কত দূর-দূর থেকে লোক আসে, মোম আর ধূপ কাঠি জ্বেলে সারি দিয়ে মৌন প্রার্থনায় বসে যায়, ফল দিয়ে যায়, মানত থাকলে মুরগী দিয়ে যায়। বিবিমায়ের থান আরো বেশ মজার জায়গা। মাথায় ঘোমটা টেনে বিবিমা বসে আছে, কোলে একটা বড়সড় মেয়ে দাঁড়িয়ে, দু'জনেরই পরনে লাল পাড় শাড়ি, গায়ে জামা, বিবিমায়ের বুক পর্যন্ত সাদা জালি কাপড়ে ঢাকা। এখানেও দূর দূর থেকে বেশির ভাগ সব-জাতের মেয়েরাই পুজো দিতে আসে, কার ছেলে হয় না, কার শ্বশুর বাড়িতে যন্ত্রণা, কার বিয়ে হচ্ছে না, কার স্বামীর চাষ-আবাদ ভালো হচ্ছে না, কার স্বামী বিচারের আসামী। ইত্যাদি। সব আসে, মানত করে পুজো দিয়ে যায়। পুজোর নিয়মও বেশ মজার ভাবে রাধা। গ্রাম-শহর

ঢুঁড়ে বাড়ি-বাড়ি চাল ভিক্ষে করে এনে সেই চাল বাজারে বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে সেই টাকা দিয়ে আবার চাল ডাল কাঁচা দুধ ডাব ইত্যাদি কিনে পুজো দিতে হবে।

পুজোর আগে বা পরে শফিদার মা এক এক-হাত একদিকের কানের ওপর রেখে গান করে।

শফিদার মায়ের এখন আর গলায় তেমন সুরটুর নেই, বয়েসও হচ্ছে, তবু শুনতে বেশ লাগে রাধার। শুনতে শুনতে এখানকাব গানও তার রপ্ত হয়ে গেছে, সামনে থাকলে শফিদার মায়ের সঙ্গে গলা দেয়, গান করে, আর তখন খুব জমে ওঠে।

তবে তার সব থেকে বেশি টান কপালী বাবা আর তাঁর জংলি কালীর ওপর। এমন স্বপ্নটা দেখে ওঠার পর মনে হল মা-কালী যেন ওর সঙ্গে রঙ্গ করল, বিপদের ভয়ে ওকে ঘরে সেধিযে থাকতে বলল। নিজে মা বিপদ নিয়ে খেলা করে আর ওকে কিনা এই ঠাট্টা! ব্যস রোখ চেপে গেল।

এরপর কপালী বাবার কাছে গিয়ে বাবার কথা বা স্বপ্নের কথা কিছুই বলল না। তাঁকে গিয়ে ধরল ওকে অনেক কালীর গান শেখাতে হবে। কপালী বাবাব গানের গলা অবশ্যই বাবার মতো নয়, আর একটু ফ্যাঁসফেঁসেও। কিন্তু অনেক গান জানেন, আর ভাবে বিভোর হয়ে গান যখন রাধার একটুও খারাপ লাগে না। এমন একটি ছাত্রী পেয়ে বাবা খুব খুশি। রাধার গলা কত সুন্দর তাতো তিনি জানেন।

মনে ডাক দেওয়ার ব্যাপারে সেই ছেলেবেলাতেই অনেক রকমের ব্যাপার ঘটে গেছে।···যেমন ঘরে ফিরে বাবার একবার মনে হয়েছিল পয়সা আরো অনেক বেশি পড়েছিল, কিন্তু বাড়ি এসে গুনে দেখা গেল অত নয়। গান গাইতে গাইতে যেখানে দাঁড়িয়ে যায়, বাড়ির এক-তলা দো-তলা বা কলকাতায় গেলে তিন-চার তলা থেকেও সিকি আধুলি এমন কি টাকাও পড়ে, পাঁচ দশ পয়সার তো কথাই নেই। সে-সব বাবুয়া তুলে কাঁধে ঝোলানো থলেতে ফেলে। রাস্তার লোক

যারা দিয়ে যায় তারা সোজা থলেতেই ফেলে। বাবুয়া সে-সব দিদির হাতে তুলে দেয়, রাধা বাবাকে জানায় এত হল, তারপর তুলে রাখে। সেবারে কত হল শুনে বাবা একটু অবাক হয়েই বলল, সে কি রে, আজ তো মনে হয়েছিল অনেক বেশি পেলাম।

বাবা সরে যেতে রাধা বার কয়েক ভাইয়ের দিকে তাকালো। তারপর কথা নেই বার্তা নেই তার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল।—পাজি তোর মুণ্ডুটা আমি ছিঁড়ে নেব, কোথায় পয়সা লুকিয়েছিস বার কর!

বাবুয়া বিষম ভেবাচাকা খেয়ে গেল, তবু জোর প্রতিবাদ তুলল, বা রে, আমি পয়সা সরিয়েছি তোকে কে বলল—

রাধার আবার হাত উঠল।—আমাকে মা-কালী বলে দেছে, কোথায় রেখেছিস বার কর আগে—

বাবুয়া সুড়সুড় করে তার লুকনো জায়গা থেকে আরো চার টাকা বারো আনা বার করে আনল। অল্প-স্বল্প রোজই সরায়, সেদিন অনেক পেতে লোভে পড়ে অনেক বেশিই সরিয়েছিল। বাবুয়া এরপর দিদির হাতে পায়ে ধরেছে, আর কখনো করবে না, নাক-কান মলেছে।

আশ্চর্য, এমন চিন্তা কোনোদিন রাধার মনের ধারে কাছেও ছিল না। বাবার ওই কথা শোনার পর ভাইয়ের দিকে তাকাতেই কেউ যেন ওর ভিতর থেকে বলে দিল, ওকে ধরে ঝাঁকালেই পয়সা বেরুবে।

...আর একবার। ওদের কুটীর গঙ্গার আধেকেরও ও-ধারে শ্যাওলা-ছাঁওয়া জলে হঠাৎ চমৎকার একটা গোলাপী আভার মস্ত পদ্ম ফুটেছে দেখল। কুটীর গঙ্গা বলতে বাড়ির পিছনের নোঙরা পুকুরে। এখানে সব বাড়ির সব পুকুরই গঙ্গা। বাড়ির নাম বা পদবীর নামের সঙ্গে জুড়ে পুকুরকে গঙ্গা বলা হয়। সেই কোন্ কাল থেকে লোকের বিশ্বাস এখান দিয়ে গঙ্গা বয়ে গেছল, এখনো কিছু মাটি খুঁড়লেই জল বেরোয়—তাই ছোট-বড় সব পুকুরই গঙ্গা। বেলা তখন

এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে। পুকুরের ও-দিকটায় শ্যাওলা শুধু নয় আগাছায় ভর্তি। সাত আট বছর বয়েস থেকে এই পুকুরেই রাধা হুটোপুটি করে চান করেছে, সাঁতার কেটেছে। কিন্তু পুকুরের যা অবস্থা এখন, এ-জলে প্রায় চান করাই বন্ধ করে দিয়েছে। বিশ পঞ্চাশ গজ দূরের প্রতিবেশীদের মানে বাড়ুইদের গঙ্গায় চান করে। পদ্মটা দেখে রাধার ভারি লোভ হল। ওটা তুলে নিয়ে বাবার জংলি কালীর পায়ে দিতে পারলে বেশ হয়। কালীর পদ্মপ্রীতির কথা জানা নেই, কিন্তু অমন সুন্দর ফুল কার না ভালো লাগবে?

শাড়িটা গাছ-কোমর করে নামতে যাবে ওমনি ভিতর থেকে কেউ যেন সাবধান করল, যাসনি, বিপদ হবে। রাধা মুহূর্তের জন্য থমকালো। তারপরেই মনে হল মা-কালীকে দেবে ভেবেছে, তাই তাঁরই কৌতুক-মাখা নিষেধ এটা। রাধা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শ্যাওলা আর আগাছা ঠেলে অনেক কষ্টে পৌছুল, ফুলটাও তুলল। তারপরেই চিত্তির কাণ্ড। কাপড়ে টান, আগাছা বা কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। যত ছাড়াতে চেষ্টা করে শাড়িটা খুলে পায়ে আরো বেশি জড়িয়ে যাচ্ছে। ওই নোঙরা জল খেতে খেতে রাধা চোখে অন্ধকার দেখল। সামনে মৃত্যু, আর বুঝি উদ্ধার নেই। জল যে খুব বেশি তা নয়, কিন্তু ডুব-জলের অনেক বেশি। শেষে অনেক কষ্টে যদি বা ছাড়া পেল বাকি জলটুকু আর সাঁতরে আসতে পারে না, দু'পায়ে শাড়ি এমনি জড়িয়ে গেছে। প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েই চেষ্টা করছে, আর মা-কালীকে ডেকে চলেছে। হঠাৎ পায়ের নিচে মাটি। কোনরকমে রাধা পাড়ে উঠল, ফুলটা কিন্তু তখনো হাতে ধরা। চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল, আপনা থেকেই অনেকটা বমি হয়ে গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে সেই ফুল নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে ঘরে ফিরল। বিকেলে সেই পদ্ম মায়ের পায়ে পৌছুল, কিন্তু কালীকে ধমকও কম খেতে হল না, রাক্ষসী ফুলের লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে একেবারে খেয়ে ফেললেই তো পারতিস, ছাড়লি কেন?

...আর একবার কি দুঃসাহসের কাণ্ডই না করে বসেছিল রাধা।

অথচ মনে যা ডাক দিয়েছিল তা শুনলেই সে-বিপত্তি ঘটত না। তখন পনেরোয় পা দিয়েছে, বাড়ন্ত গড়নের ছাঁদ-ছিরি দ্রুত বদলাচ্ছে। কত বদলাচ্ছে সেটা ওই মনোহর পাজির চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলে আরো বেশি অনুভব করতে পারে। কিন্তু সে তুলনায় রাধার মনের বয়েস ছাই যদি একটুও বাড়ত। নইলে ওই হাড় বজ্জাতের কথায় বিশ্বাস করে এমন লোভেও পড়ে! ও পনেরোয় পা দিয়েছে মানে মনোহরও একুশে পৌঁছেছে। ওর মায়ের মুখেই শুনেছে ঠিক ছ'-বছরের বড় রাধার থেকে। ছিপছিপে লম্বা আর গায়ে শক্তিও কত রাখে সে-তো হাড়ে হাড়েই বুঝেছে।

…নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে টসটসে পাকা আধ-মিষ্টি কামরাঙা বোধহয় সব থেকে লোভনীয় খাদ্য রাধার কাছে। ও-ছেলে সেটা বেশ জানে। মাঝে মাঝে বাড়িতে এনে রেখে বলে, মা তোর জন্য কামরাঙা এনে রেখেছে—যাস। ওর মা সত্যি ভালো মানুষ, রাধার মুখে মায়ের গান শুনে মুগ্ধ হয়, তাই ডাকলে যায়। কিন্তু কামরাঙা খেয়ে আর নিয়ে ফেরার সময়, এমন কি ছল-ছুতোয় মা-কে সরিয়ে কম বজ্জাতি করে না। কামরাঙা লেগে আছে বলে গাল খিমচে ধরে, ভালো কামরাঙা কেড়ে খাওয়ার অছিলায় কাঁধ-পিঠ খাবলে ধরে, হাত ধরে টানাটানি করে। মোটকথা আরো প্রায় দু'বছর আগে থেকেই ওই বজ্জাত ছেলে ওর দেহটার ওপর হামলা করে মজা পায়। তবু যদি রাধার শিক্ষা হত আর মগজে কিছু থাকত! কপালী বাবা, ফকির সাহেব আর শফিদার মা মিথ্যেই ওকে বুদ্ধিমতী মেয়ে ভাবে।

ওর জ্বালাতনে রাধা প্রায় দুপুরেই ঘরে থাকে না। দিদির কবেই বিয়ে হয়ে গেছে, বাবুয়াকে নিয়ে বাবা গাইতে বেরুনোর পরেই তো রাধা একেবারে একলা। মনোহর সকালে নিজের ধান্ধায় ব্যস্ত থাকে, তার ফুরসৎ দুপুরে। একবার না একবার আসবেই। ওকে কলা দেখাবার জন্যই রাধা অনেক সময় ঘর ছেড়ে কোথাও না কোথাও চলে যায়। ওর যাবার জায়গার তো আর অভাব নেই। এ-ভাবে জব্দ হয়ে একদিন দিব্বি কেটে বলেছে আর ওকে জ্বালাতন করবে না,

মা-কালী নাকি ঘুমের মধ্যে তাকে চোখ রাঙিয়ে নিষেধ করেছে। শোনামাত্র রাধা বিশ্বাস করেছে। দারুণ খুশি। এ তো হতেই পারে, মা-কালী ওকে কত যে ভালবাসে তাতে কোনো সন্দেহ আছে।

এরপর বেশ কয়েকদিন মনোহর ভারি ভদ্র আর ভালো ছেলে। অনুনয় করে সাধা-সাধি করে দু'দিন ওর মুখে কালীর গানও শুনেছে। রাধা বুঝে নিয়েছে পাজি ছেলের মতি ফিরেছে। মা ইচ্ছে করলে কি না হয়।

—সেই দুপুরে এসে মনোহর জানালো, ওমুক জায়গায় জঙ্গলের এক গাছে মস্ত বড়বড় কামরাঙা পেকে টসটসে হয়ে ঝুলছে, মনোহরের দেখেই নাকি জিভে জল গড়িয়েছে তক্ষুনি ভেবেছে রাধাকে নিয়ে আসবে, চোখে দেখলে ও আহ্লাদে আটখানা হবে। বলল, একটা ঝোলা নিয়ে চল্ কত আনতে পারিস দেখব—

শোনামাত্র রাধার দারুণ লোভ হল। কিন্তু তার পরেই কি-রকম খটকা লাগল।—বাজে ভাঁওতা দিচ্ছ না তো?

মনোহর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর আহত যেন। বলল, এখনো আমাকে অবিশ্বাস তোর! যাক্ যেতে হবে না···মা-ই শুনে বলে দিল, যাচ্ছিস যখন রাধাকে নিয়ে যা···দেখেও খুশি হবে। আমার মায়ের কথা না না-হয় ছেড়ে দে, আমি কার দিব্বি কেটেছি মনে আছে—গাছে কামরাঙা এমন ঝেঁপে আছে তুই চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবি না—

সংশয় ঝেড়ে ফেলে রাধা জিজ্ঞেস করল, কাঁচা লঙ্কা আর নুন নিয়ে যাব?

—নিয়ে নে, এত মিষ্টি যে নুনের খুব দরকারও হবে না।

খোশ মেজাজে জঙ্গলে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো। কেউ যেন ভিতর থেকে স্পষ্ট নিষেধ করল, যাসনি, মুশকিলে পড়ে যাবি।

—কি হল?

জবাব না দিয়ে রাধা কয়েক পলক তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারছে না। তারপরেই হনহন করে আগে আগে

চলল। ভিতর থেকে যে বলল কথাগুলো মনে মনে তাকেই ধমকে উঠল, বেরুবার মুখে বলোনি কেন—মজা পেয়ে গেছ, কেমন? মুশকিলে পড়লে মুশকিল আসানও তুমি করো কিনা আমি দেখে ছাড়ব।

মনোহর সঙ্গ নিয়ে ঘন জঙ্গলের দিকে চলছে। এরই মধ্যে ও প্রথমে একটা হাতের ওপর দখল নিয়েছে, তারপর সেই হাত ওর পিঠে বেষ্টন করে কাঁধে উঠেছে। হেসে বলেছে, জঙ্গলের মধ্যে হোঁচট মোচট খাবি, আমার সঙ্গে পা ফেলে সাবধানে চল্। এটুকু বলার ফাঁকে কাঁধের ওপর চাপ বেড়েছে, মুখটা গালে ঠেকেছে। রাধা ঘাড় ফিরিয়ে যেটুকু দেখে নেবার দেখেছে, বুঝে নেবার বুঝেছে। চোখে মুখে লোভ আর মতলব ঠিকরে পড়ছে।...এ ছেলের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে না, উল্টে মাথায় খুন চাপবে হয়তো। ভুল হচ্ছে না, তবু একটু যাচাই করে নেওয়া দরকার, মা-কালীর নামে দিব্বি করেছিল। ঠোঁটে চেষ্টা করে একটু হাসি টেনে আনল, একবার ছ'বার টেরিয়ে তাকালো, বেশ হালকা গলায় বলল, আর যদি যেতে না চাই, ঘরে ফিরে যেতে চাই?

দাঁড়িয়ে গেল। কাঁধটা আরো জোরে চেপে ধরল, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তাহলে তোর ছ'গালে প্রথমে ঠাস ঠাস করে এমন চড় মারব যে চোখে আন্ধার দেখবি, তারপর তোকে এমনি করে বুকের সঙ্গে পিষে মারব! তুই আমাকে অনেক ভুগিয়েছিস—

বলেই নিজের বুকের সঙ্গে সজোরে চেপে ধরল, চোখ ছুটো ক্রুর লোলুপ।

রাধা এবারে একটু বেশিই হাসছে, সেটুকুই এই ছেলের অবাক হবার মতো যথেষ্ট। কথা শুনে আরো যেন হতবাক।

—ছাড়ো, আর বীরত্ব ফলাতে হবে না, তোমার মতলব আমি কামরাঙা খেতে নিয়ে যাবার কথা শুনেই বুঝেছি...আরো ভিতরের দিকে চলো, কে কোথায় এসে পড়বে—

এ-যে এমন সৌভাগ্যের দিন মনোহর কি কল্পনাও করতে পেরেছিল! আজ একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য তৈরি হয়েই

বেরিয়েছিল, এমন হামলাই করবে যে ওকে বিয়ে করতে এ মেয়েকে রাজি হতেই হবে। কিন্তু রাধাও যে তলায় তলায় ওকে মন দিয়ে বসে আছে জানবে কি করে? ছেড়ে দিয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে আবার তার কাঁধ জড়িয়ে ধরল, আর হাসি-হাসি মুখে রাধাও এক হাতে ওর পিঠ বেষ্টন করে এগিয়ে চলল। পায়ের দিকে চোখ। এ-দিকের জঙ্গলের সবকিছু ওর চোখের দর্পণে। হাসি-ছোঁয়া চোখ তুলে এক-একবার তাকাচ্ছে, আবার মাথা নামিয়ে চার-দিকে দ্রুত চোখ চালাচ্ছে।

—এখানেই বসি আয়, কেউ দেখবে না।

—আঃ এসো না!

জোর করেই টেনে নিয়ে চলল। মনোহর হাওয়ায় ভেসে জড়াজড়ি করে চলেছে। রাধা আচমকা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল, মনোহরকে ঠেলে খানিকটা সরিয়ে নিজের দিকে ফেরালো। হাসছে অল্প-অল্প, দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলেই পড়ল প্রায়, বোসো, বসে পড়ো—আর না।

গলায় আর বুকে ওজনের ভারেই মনোহর ধপাস করে বসে পড়ল, রাধা বলতে গেলে প্রায় তার কোলের ওপর, সোহাগ করেই যেন তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে শুইয়ে দিল, তারপর তেমনি হাসি-হাসি মুখে কয়েক পলক চেপে ধরে থাকল, রাধার সমস্ত দেহই প্রায় ওর উরু আর বুকের ওপর। তারপরেই ছিটকে নেমে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে গেছি—গেছি—মরে গেলাম মরে গেলাম! বলে বিকট আর্তনাদ! কিন্তু রাধার কানেই এলো শুধু, দেখার জন্য সে আর দাঁড়িয়ে নেই। জঙ্গলের পথ ধরে হরিণীর মতো ছুটছে। ···শয়তান এখন কোন্ যন্ত্রণায় দাপাদাপি করছে, সবব অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে খুব ভালো করেই জানে। ···গলায় ঝুলে পড়ে মস্ত একটা লাল পিঁপড়ের ঢিপির ওপর ওকে ঝপাং করে বসিয়েছে তারপর বুকের আর শরীরের ওপর চেপে বসে আদর করে শুইয়ে দিয়ে এসেছে। বড় বড় লাল পিঁপড়ে, একটা কামড়ালে অঙ্গ জ্বলে যায়, কম করে

কয়েক শ' কামড়াচ্ছে। জ্বলুক, জ্বলুক, সব্ব অঙ্গ জ্বলে যাক, পাজী ইতর কোথাকার!

এরপর রাধা কেন, পনেরো বিশ দিনের মধ্যেও বাইরের কেউ মনোহরের মুখ দেখেনি। ওদের এক পড়শিনীর মুখ থেকে রাধা জেনেছে, মনোহরের মা নাকি ছেলের দুর্দশা দেখে কপাল চাপড়ে কেঁদেছে, কোন্ গাছ থেকে সে একটা লাল পিঁপড়ের ঢিপির ওপর পড়ে গেছল, শ'য়ে শ'য়ে পিঁপড়ের কামড়ে সব্ব-অঙ্গ ফুলে ঢোল, বিজন ডাক্তারকে বাড়িতে ডেকে এনে চিকিৎসা করাতে হয়েছে, সুঁই নিতে হয়েছে। মরেই যায়নি রক্ষা।

এতটা শুনে অবশ্য রাধার একটু খারাপ লেগেছিল। কিন্তু ওর কি দোষ, দশ বিশটা পিঁপড়ে কামড়ালে ওই রাক্ষসের কাছ থেকে সেদিন ছাড়া পেত!

সুস্থ হবার পরে এক দুপুরে মনোহর এসেছে। তাকে আসতে দেখেই রাধা দরজা বন্ধ করে বসেছিল। মনোহর গলা উঁচিয়ে ফের মা-কালীর দিব্বি কেটে শাসিয়ে গেছে, এর প্রতিশোধ সে নেবে—এমন প্রতিশোধ যা জীবনে ভুলতে পারবে না।

জবাবে ঘরে বসে রাধা জিভ ভেঙিয়েছে।

কিন্তু এরপর কিছু দিন সত্যিই ও ছায়ার মতো পিছনে ঘুরেছে আর সুযোগ খুঁজেছে। বাবা ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে রাধা একলা আর টহল দিতে বেরুতে পারে না। মাজারে যাওয়া বন্ধ, বিবিমায়ের থানে যাওয়া বন্ধ। পিছনের পুকুর ধারের জংলা পথে কেবল কপালী বাবার কাছে যেতে পারে। নিরুপায় হয়ে রাধা তাঁর কাছেই সমস্যার কথাটা বলল। ঘটনা শুনে বাবার সে কি হাসি। পিঠ চাপড়ে বলেছেন, ঠিক করেছিস, আমি দেখছি।

তারপর একদিন শ্মশানের রাস্তায় ওকে দেখে কপালী বাবা ত্রিশূল হাতে এমন তেড়ে গেছলেন যে মনোহরের হৃৎকম্প। কোন-রকমে পালিয়ে বেঁচেছে। তারপরেও ওর এক বন্ধুর মারফৎ কপালী বাবা শাসিয়ে দিয়েছেন, রাধার গায়ে একটা আঁচড় পড়লে উনি তাকে

চিবিয়ে খাবেন।

ছেলে এরপর সমঝেছে। বাড়িতে এসে রাধার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। বলেছে, আমি খুব অন্যায় করেছিলাম, কিন্তু তার জন্য তুই তো আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলি। রাগের মাথায় অমন দিব্বি কেটেছি, দিব্বি তুলে নিচ্ছি, তুই আমাকে ক্ষমা করে দে।

এই আপোস রাধারও কাম্য ছিল। খুশি হয়েই মাথা নেড়েছে।

…এমনি করেই রাধার মনে ডাক দেয়। রাধা থমকায় বটে। কিন্তু তার পরেই রোখ চাপে। পরীক্ষা ভাবে। যে ডাক দেওয়ায়, ওকে রক্ষা করার দায়ও তারই ভাবে! রক্ষা যে করেই থাকে তাতে কি কোনো ভুল আছে? …সেদিন বিবিমায়ের থান থেকে জঙ্গলের পথে পা দিতেই ভিতরের কেউ নিষেধ করেছিল। যাসনি, বিপদ হবে। রাধার সেই একই রোখ চেপেছিল। …কিন্তু তিন-তিনটে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার তো আশ্চর্যভাবে পেল! যে রক্ষা করার সে রক্ষা না করে পারল?

কিন্তু সে-দিনের চৌদ্দ পনেরো বছরের রাধার সঙ্গে আজকের উনিশ যাই-যাই রাধার অনেক—অনেক তফাৎ। বাবা মারা যাবার পর থেকে নিজের ভিতরের এক স্থির বিশ্বাসের জোরে সে দাঁড়িয়ে আছে। অভাব অনটনের মুখ দেখেনি। বরং স্বাচ্ছল্য যেচে এসেছে, আসছে। বাবার কথা থেকেছে আবার কালীর স্বপ্ন দেখে মনের সেই রোখও সফল হয়েছে। পেট চালানোর জন্যে তাকে পথে-পথে গান গেয়ে বেড়াতে হয়নি, অথচ এই গান গেয়েই অনায়াসে তার দিন চলে যাচ্ছে। বাবা সেই কথার পর এক বছরের মধ্যে মেয়ের গান আর

গলার উন্নতি দেখে অবাক হয়েছিল। তারপর জিগ্যেস করেছিল, এ-সব গান তুই এ-ভাবে গাইতে শিখলি কি করে? রাধার ইচ্ছে করছিল জবাব দেয়, মা-কালী শিখিয়েছে—তার মস্করার জবাব দেবে পণ করেছিল বলেই শেখা হচ্ছে। কিন্তু তা তো আর বলা যায় না। বলেছিল কালীর গান কপালী বাবার কাছে, কারবালার মাতনের গান মাজারের ফকির সাহেবের কাছে আর বিবিমায়ের দু'তিনটে গান শফিদার মায়ের কাছে শিখেছে। এরা কে কেমন গায় রাধার বাবার জানা আছে, তার মনে হয়েছে মেয়ের আসল গুরু তার ভাব আর আবেগ। এ দুটোর সঙ্গে মিষ্টি মাজা গলা তো আছেই। এরপর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চার বছর বাবাই সন্ধ্যায় বা রাতে ওকে ডেকে গান নিয়ে বসেছে। কেবল কালীর গান নয়, গোপাল রাধা-কৃষ্ণের গান, এমন কি শিবের গানও। রাধা বুঝেছে পয়সা রোজগার বেশি হয় না বলেই বাবার গলায় এ-সব গান বেশি শোনেনি। কিন্তু ওর বেলায় এ-সব গানেও রোজগার কম হচ্ছে না। ও অবশ্য রোজগারের দিকটা মোটে ভাবেই না। কিন্তু টাকা এলে কি করবে? আর বাবা মারা যাবার পরে নিজের ভাবেও তো কত মন-গড়া গান গেয়ে ফেলে। গাঁয়ের স্কুলের তিন 'কেলাস' পড়া তো বিদ্যে, কিন্তু গান ওর মন থেকে উঠে আসে। আবার ভুলেও যায়।

এখন তো কাছে দূরে কত জায়গা থেকে ডাক আসে তার। অবশ্য হাল ফ্যাশনের গানের আসরে নয়। কত বড় লোক মধ্যবিত্ত লোক তাদের ঘরোয়া ঠাকুরের পূজা উৎসব উপলক্ষে ভক্তির গানের আসর বসায়। রাধাকে তারা যেচে এসে ডেকে নিয়ে যায়। এখন বহুজনের কাছে তার খাতির কদর। লক্ষ্মীকান্তপুর, বিষ্টুপুর, জয়নগর, ধপধপি —ডাক এলে কোথায় না গিয়ে পারে? এই বয়সেই বার দুই তিন কলকাতায় গিয়ে পুজো-পার্বণের ঘরোয়া আসরে গেয়ে এসেছে। এ-দিকের চেনা-জানা লোকেরাই তাদের কলকাতায় আত্মীয়দের ওই সব আসরে সাদরে নিয়ে যায়।

...এ-সবের এক কণাও কি ওর নিজের শক্তি নিজের জোরে

হয়েছে? ছাই। মস্করা করে স্বপ্ন দেখিয়ে যে ওকে গানে নামিয়েছিল সব তার শক্তি, তার জোর। গান নয়, এই শক্তির মহিমা নিজের সত্তা দিয়ে অনুভব করে, বিশ্বাস করে। ···সাধারণ লোক নয়, গানের দৌলতে এ-ভাবে এগোনর ফলে অনেক বড় ঘর শিক্ষিত ঘরের ছেলেদের চোখে লোভ দেখেছে, আসরে আলাপের ফাঁক খুঁজে কাছে ঘেঁষার চেষ্টা দেখেছে। যার জোর আর বিশ্বাসের ওপর সে দাঁড়িয়ে, রাগের বদলে হাসিই পায়। ঘরে ফিরে আয়নায় দাঁড়িয়ে অনেক সময় সকৌতুকে নিজেকে দ্যাখে। লম্বা স্বাস্থ্য-টাস্থ্য এ নিজেও স্বীকার করে, আর ছেলেবেলা থেকে পাঁচ জনের মুখে নিজের ডাগর চোখ দুটোর প্রশংসা শুনে এ-ও মেনেই নিয়েছে চোখ দুটো সুন্দরই, কিন্তু কালো তো, আর এমন আহা-মরি মুখও কিছু নয়, তবু আসরের রূপসীদের ছেড়ে হ্যাংলা ছোঁড়াগুলো ওকে গিলে খেতে চায় কেন? আর ঠিক এই চিন্তা করতে গিয়ে বিষ্টুপুরের রায় বাড়ির গৃহিণী বিন্দুবাসিনী দেবী আর জয়নগরের সেন বাড়ির রুমা সেনের কথা মনে পড়ে যায়। ওঁরা দু'জনেই গোপাল ভক্ত। নিয়মিত বিগ্রহ পূজা হয়। রুমা সেন মস্ত লোকের ঘরণী ছিলেন, নিঃসন্তান, বিধবা হবার পর থেকে দেশের অর্থাৎ জয়নগরের বাড়িতে ভাগ্নেকে নিয়ে থাকেন। ভাগ্নে অজয় গুপ্তর বছর বাইশ বয়েস, জয়নগর থেকে কলকাতায় যাতায়াত করে কী পড়াশুনা করে নাকি। আর বিন্দুবাসিনীও বড়লোকের বাড়ির গিন্নি, চার ছেলের মা। স্বামী আর বড় তিন ছেলে কেবল টাকার পিছনে ছুটছে, ছোট ছেলেটা ভদ্র কিন্তু অলস গোছের, সে-ই কেবল সর্বদা মায়ের কাছে থাকে, কিছুই করে না। কিন্তু বড় তিন ছেলের বউ নিয়ে বিন্দুবাসিনী দেবীর মনে অশান্তি, কারো সঙ্গে কারো মিলমিশ নেই, স্বামী ছেলেরা বা বউরা কেউ গোপালকে মোটে ভক্তিশ্রদ্ধা করে না, যেমন-তেমন করে কেবল দায়-সারা কর্তব্য করে। এই দুঃখেই বিন্দুবাসিনী এখন পর্যন্ত ছোট ছেলের বিয়ের নাম করেন না। তাঁর ধারণা, তাঁর গোপাল মাঝে মাঝে রাগ অভিমান করে, মান করে, আর তখনই রাধার ডাক পড়ে। রাধা গান গেয়ে গোপালের মান

ভাঙাতে যায়। আর রুমা সেনের বাড়িতেও গোপালের নামে বাধার ডাক পড়েই। ওই দু'বাড়ি থেকেই বছরে দু'জোড়া দু'জোড়া চার জোড়া শাড়ি রাধার বাঁধা প্রাপ্য। তাছাড়া প্রতি মাসেই নিতে না চাইলেও তাঁরা ওর বটুয়ায় বিশ পঁচিশ টাকা করে গুঁজে দেবেনই। শাড়ি টাকা এমন আরো কতজনই দেয়। সে-কথা নয়। এই দু'জনেই একই রকমের আবেগের কথা ওকে শুনিয়েছিলেন।

বিন্দুবাসিনী দেবী ভাবে বিভোর গান শুনে একদিন ছলছল চোখে বলেছিলেন, গোপালেব আমার এতদিনে মান ভাঙল, তুইই বোধ হয় কোনো জন্মে রাধা ছিলি।

আর রুমা সেন বলেছিলেন, বিভোর হয়ে গান করিস যখন তোকেই যে আমার রাধা মনে হয় রে!

তা হেসে হেসে দু'জনকে একই জবাব দিয়েছিল রাধা —শ্রীমতী রাধা তো কাঞ্চনবর্ণ রূপসী ছেলেন গো, আমি তো কালো!

বিন্দুবাসিনী মনের খেদে খেঁকিয়ে উঠেছিলেন, তোব মতো রূপ পেলে এ-কালের দেমাকী রূপসী রাধারা বর্তে যেত বুঝলি? কটাক্ষ তিন বউয়ের উদ্দেশে। তারা সকলেই বেশ ফসা আর সুশ্রী।

আর রুমা সেন খানিক ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলেছিলেন, তোর কত রূপ যদি জানতিস·· থাক না জানাই ভালো।

রূপের এই বিশেষত্বটুকুই রাধা ঠিক-ঠিক ধরে উঠতে পারে না। ···তবে, একটু কিছু আছেই জানে, যা দেখে আদেখলে পুরুষগুলোর লোভী চোখ অন্যকে ছেড়ে আগে ওর দিকেই ছোটে।

কিন্তু যে-বিশ্বাস তার আসল পুঁজি, যার জোরে ও নিঃশঙ্ক চিত্তে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারত, এমন একটা ঘটনার ফলে সেই বিশ্বাস আর জোরের ওপর বড় রকমের একটা ধাক্কা পড়েছে। ···হ্যাংলা লোভীর দল চার-দিকে তো আছেই জানে, কিন্তু ওর অনিচ্ছায় কেউ ওর একটা কেশও স্পর্শ করতে পারবে না এ-ধারণা একেবারে বদ্ধমূল হয়ে গেছল। যে রক্ষা করার সে তাকে রক্ষা করেই যাবে। কিন্তু

এবারে কি হল, দু'দুটো ডাকাত ওকে ঝাপটে ঝাপটে ধরল, একজন নোঙরা গামছা দিয়ে ওর মুখ বেঁধে ফেলল, তারপর এক-একবার এক-একজন ছানাছানি করে ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে গেছে, ছাড়াতে চেষ্টা করলেই পিছনে কিল-চড় পড়েছে।···মা শেষ পর্যন্ত ওকে রক্ষা করল বটে, কিন্তু সে-জন্য এক বুড়ীকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হল।

রাধা এই চিন্তা নিয়েই পাগলের মতো ছটফট করে কাটালো কটা দিন। তার এই জোর আর এই বিশ্বাস গেলে আর থাকল কি? যায়নি বটে, কিন্তু বড রকমের নাড়া তো খেয়েছে। মায়ের কি ইচ্ছে, এমন শাস্তি দিয়ে মা ওকে কি বোঝাতে চায়?

এমন একটা ঘটনা চারিদিকে রটে যেতে সময় লাগল না। যাকে নিয়ে এই ঘটনা তার নাম রাধা—পাঁচ দশ ক্রোশের মধ্যে তাকে না চেনে কে? আর যে বুড়ী ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে জেবন দিল সে হল গিয়ে লক্ষ্মীকান্তপুরের ছিনাথ (শ্রীনাথ) পোদ্দারের লোক—ওই একটি জোতদারকেই বা গোটা অঞ্চলের মধ্যে না চেনে কে? কিন্তু এ রটনা লোকের মুখে মুখে রসালো হয়ে ছড়াতে লাগল। একটা থুত্থুড়ি বুড়ী রাধাকে তিন ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করে প্রাণ দিয়েছে এ কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা? ফুর্তির সময় ঝামেলা বরদাস্ত করতে পারেনি বলেই ডাকাতরা বুড়ীকে মেরে চাষের জমির ধারে ফেলে রেখেছে এ বরং সম্ভবের মধ্যে পড়ে। এমনও হতে পারে ডাকাতদের মধ্যে বুড়ীর কেউ চেনা লোক বেরিয়ে পড়েছে, তাই আগে থাকতে তাকে মেরে তারা নিশ্চিন্ত হয়েছে। বুড়ীকে মারার ব্যাপারটা রাধাও দেখে থাকবে, বুড়ীর দেহ সনাক্ত হবেই জেনে ডাকাতদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রাধা থানায় এসে নিজের উদ্ধার পাওয়ার গল্প ফেঁদেছে।

মাতনের কিছু লোক ছাড়া কেউ এ গুজবে মন থেকে বিশ্বাস করতে চায়নি অন্তত। কিন্তু এ-সব রটনা ছোঁয়াচে ব্যাধির মতো একটু নাড়াচাড়া দিয়েই যায়। প্রতিবেশিনীদেরই কেউ কেউ নিজেরাই এসে রাধার কানে কথাটা তুলেছে, বিলাসীও বলেছে। ড্যাকরারা

সব এই-এই বলছে, মুখে আগুন সব।

সাত দিনের মধ্যে রাধা আর ঘর ছেড়ে নড়েনি। তাই নিয়েও কথা, দেহের কি হাল হয়েছে কে জানে, বেরুনোর শক্তি থাকলে তো। কোন্ মাস্তান নাকি বিজন ডাক্তারকে একটু বেশি রাতে রাধার ঘর থেকে বেরুতে স্বচক্ষে দেখেছে। ...চিকিৎসার দরকার হয়েছে নিশ্চয়। তাঁকে কপালী বাবার সঙ্গেও কথা বলতে দেখেছে। দেখাটা মিথ্যে না হতে পারে, কারণ, দু'দিন বাদেই অংশুমানের স্ত্রী জিপে ডাক্তার চৌধুরীর স্ত্রীকে তুলে নিযে তার ডেরায় এসে দেখে গেছেন। রাধা সারাক্ষণই গুম হযে বসেছিল, পাঁচটা কথাও বলেনি। স্ত্রীর মুখে এ-কথা শুনে পরদিন রাতের দিকে একটু ফুরসৎ পেয়ে ডাঃ চৌধুরীও রাধাকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁর ভয় হয়েছিল বড রকমের মানসিক আঘাত-টাঘাত পেল কিনা। কপালী বাবা সকাল সন্ধ্যায় অনেকটা সময়ই এখন এখানে কাটিয়ে যান। তাঁর সঙ্গেও ডাক্তারের দেখা হযেছে। রাধা ভালো আছে দেখে তিনি উঠোনে দাঁড়িয়ে রাধার সম্পর্কেই কিছু কথাবার্তা বলেছেন। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর মত, চেষ্টা চরিত্র করে এখন রাধার একটা বিয়ে দেওয়া উচিত।

আগে-পরে রাধাকে দেখতে অনেকেই এসেছেন। কালীভক্ত দোতারাবাবু এসেছেন, ভাগ্নে অজয় গুপ্তকে নিয়ে রুমা সেন এসেছেন, ছোট ছেলে নিখিল রায়কে নিয়ে বিষ্ণুপুরের বিন্দুবাসিনী দেবী এসেছেন। আশ্চর্য, কতগুলো ব্যাপারে মানুষের ভাবনা চিন্তা একই রকমের হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই একই মত ব্যক্ত করে গেছেন—রাধার এবারে একটা বিয়ে হওয়া উচিত। আর সেটা সব থেকে বেশি মনে হয়েছে কপালী বাবারও।

নিজের সেই বিশ্বাস আর জোরের ওপর নাড়া পড়তে রাধার দৃষ্টিও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। ...মামী আর মায়ের সুবাদে অজয় গুপ্ত আর নিখিল রায়ও তাকে পছন্দ করত, রাধাও তাদের ভদ্র ভালো-মানুষই ভাবত। বেশি রাতেও কতদিন এক-একজন ওকে ডেরায় পৌঁছে দিয়েছে, রাধা সাইকেল-রিকশয় এসেছে, তার কেউ না কেউ

পাশে পাশে সাইকেলে। কিন্তু এবার তারাও যখন মা বা মামীর সঙ্গে এসেছে, তাদের চোখেও রাধা যেন লোভ উঁকিঝুঁকি দিতে দেখেছে। এ কি হল রাধার, বিশ্বাস কি এরপর তাহলে ও আর কাউকেই করতে পারবে না?

কপালী বাবা বিয়ের কথা তুলতে তাঁকে অবাক করে রাধা ঠাণ্ডা মুখে সায় দিল, হ্যাঁ, বিয়ে এবারে একটা করব।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন কপালী বাবা। —যাক, নিশ্চিন্ত করলি। ...তা কাকে বিয়ে করবি ভেবেছিস?

—ভাবিনি। ভাবছি...।

—মনোহরকে তোর সঙ্গে দেখা করতে বলব?

রাধা ভ্রুকুটি করে উঠল, তোমাকে কারো হয়ে ওকালতি করতে হবে না।

এ-সব কথায় বিলাসীর কান সর্বদা খাড়া। মেয়ের এই ভ্রুকুটি একবারও আসল রাগ মনে হল না। সে ওই দুপুরেই প্রথমে পাড়ার সমবয়সী অন্তরঙ্গ কয়েকটি রমণীর কাছে খুব গোপনে খবরটা ফাঁস করল। তাঁদের মধ্যে একজনের গলা পর্যন্ত ধারে বিকিয়ে আছে নিতাই স্যাকরার কাছে। নিতাইয়ের দুর্বলতা তার তো অজানা নেই, সে তার দূত হয়ে কতসময়ে পাকে প্রকারে রাধার মন বুঝতে চেষ্টা করেছে। সে তড়িঘড়ি ছুটল নিতাই স্যাকরার দোকানে। এ-দিকে মনোহরকে ফাঁক মতো খবরটা বিলাসীই দিয়ে এসেছে। এ-ও বলেছে রাধার তাকেই পছন্দ মনে হয়। এটুকু মেহনতের সুফল দুটি টাকা হাতেনাতে পেয়েছে।

পরদিন দুপুরেই নিতাই এসে হাজির। এ-সময় ছাড়া রাধাকে আর নিরিবিলিতে কখন পাবে, সকাল-সন্ধ্যা তো ওই বাবাটি এখানে ঠাঁই গেড়ে বসে থাকেন। রাধার বোনাইয়ের বন্ধু হিসেবে আগে তো এখানে হামেশাই আসত, আর রাধার বাপ বেঁচে থাকতে একই উদ্দেশে তাকেও তোয়াজ তোষামোদ করতে আসত।

উঠোনে দাঁড়িয়ে বার দুই গলা খাকারি দিল, তারপর গলা যতটা

সম্ভব নরম করে দু'বার বিলাসী-বিলাসী বলে ডাকল।

দরজা খুলে গেল। রাধার পিঠের ওপর চুলের বোঝা ছড়ানো। গম্ভীর মুখে স্থির চোখে সোজা তাকাতে গলায় মধু ঢেলে বলল, একবারটি তোর কাছে না আসি পারলাম না—

—সে-তো দেখতে পাচ্ছি। কেন?

—ইয়ে এত ধকল গেল তোর ওপর দে…

—আমার ওপর দে কি ধকল গেল? রাধার গলার স্বর ঈষৎ তীক্ষ্ণ।

নিতাই বলল, উ কথা ছাড়, কোনো শালার কথায় আমি কান পাতি না—আমার কথা হল এবার তুই আমার ঘরে আয়, আমি তোকে মাথায় করে রাখব।

রাধা চেয়ে রইলো একটু। —গয়না-টয়না গড়িয়ে রেখেছ?

নিতাই ভেবাচাকা খেয়ে গেল। —ইয়ে, মানে তোর জন্যি গয়না?

—হ্যাঁ, গড়িয়ে রাখাই ভালো, দু'বছর মাত্র অপিক্ষে করছ, আর বছর দশেকের মধ্যে তোমার গলাতেই মালা দিতে ইচ্ছে হবে কিনা কে জানে। তার মুখের ওপর দরজা দুটো বন্ধ করে দিল।

সন্ধ্যায় মনোহর পাইক কপালী বাবার ডেরা হয়ে এখানে হাজির। কপালী বাবাই বলে দিয়েছেন নিজে গিয়ে রাধার মন বুঝে নে-গে যা, আমি আর তাহলে এখন যাচ্ছি না—

এসেই বলল, কপালী বাবা আসতি বললেন—এলাম।

রাধা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা মুখে জিগ্যেস করল, কেন আসতি বললেন?

—একটু বসতে দিবি না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হবে?

রাধা ভিতরে চলে গেল। এক হাতে চাটাই অন্য হাতে লণ্ঠনটা নিয়ে বেরুলো। দাওয়ায় চাটাই পেতে লণ্ঠনটা সামনে রেখে নিজে আবার দরজা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

মনোহর গ্যাঁট হয়ে বসল। —কপালী বাবা তোর মন বুঝে নেবার জন্য আসতি বললেন।

একটু চুপ করে থেকে রাধা জিজ্ঞেস করল, মনের কী বোঝার জন্যি?

যতটা সম্ভব সমর্পণের সুরে মনোহর জবাব দিল, তোর বে-তে মত হয়েছে, এখনো তুই আমাকে বাতিল করবি কিনা সেটুকু বোঝার জন্যি।

রাধা আবার চুপ খানিক। —আমাকে কুঞ্জিঘরে টেনে নে গিয়ে তিন ডাকাত বে-ইজ্জৎ করেছে সে-কথা শোনোনি?

মনোহর এবার দরাজ গলায় জবাব দিল, তিন ছেড়ে পাঁচ হলেও আমি কেয়ার করি না, ডাকাতের অত্যাচার তুই সেধে নেতে গেছিস, এ-জন্যিই তো আগের থেকেও তোর ওপর আমার বেশি দরদ, বেশি টান।

এবারে রাধার গলার সুর রুদ্ধ একটু। —ও, লোকে যা বলে বেড়াচ্ছে তুমি তা বিশ্বাস করেছ, তার পরেও টান দেখাতি এয়েছ?

চতুর মনোহব তক্ষুনি বুঝে নিয়েছে সে কোন ফাঁদে পড়ল। তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চেষ্টা কবল, যারা অমন কথা বলে তারা হারামীর বাচ্চা বুঝলি? এ-কথা যারা বলে আমার ও-কথাগুলো তাদের মুখেব ওপর জবাব—নইলে গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে হলপ করলেও কি তাদের বোঝানো যাবে—নইলে তোর তেজ আমি জানি না··· এক হাজার লাল পিঁপড়ে দিয়ে খাইয়ে আমাকে মারতে বসেছিলি! তোর কথা বিশ্বাস না করা আর মা-কালীর কথা বিশ্বাস না করা তো সমান কথা!

রাধা চেয়ে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে একটু একটু হাসির ফাটল ধরছে। —ঠিক আছে এখন ঘরে যাও, পরে আমার মনের কথা বাবার কাছেই জেনে নিও।

ওই হাসিটুকু লক্ষ্য করে মনোহর পাইক মনের আনন্দে বাতাস সাঁতরে চলে গেছে।

রাধার ভগ্নিপতি সকালে দুপুরে বা বিকেলে যখনই হোক রোজই

একবার করে শ্যালিকার খবর নিতে আসে। বিষ্টুপুরের আগের স্টেশন জয়নগর ট্রেনে কয়েক মিনিটের পথ। আর স্টেশন থেকে এক দেড় ক্রোশ হেঁটে আসা কিছুই না। কপালী বাবা তাকে রাধার সামনেই ডেকে বলেছিলেন, আপনার জন বলতে তো একমাত্র তুমি, যেটুকু পারো খবর টবর নিও।

তা হারাণ মণ্ডল রোজই এই কর্তব্য করতে আসে। রাধার সঙ্গে এ ক'দিনের মধ্যে একটা কথাও হয়নি। উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখে রাধা চুপচাপ ঘরে বসে আছে। না ডাকলে ঘরে ঢোকার সাহস নেই, দাওয়ায় বা উঠোনের পিছন দিকের গোলা ঘরে বসে বিশ্রাম করে খানিক। বিলাসীর কাছ থেকে খবর নেয়। তারপর চলে যায়।

সেদিন (অর্থাৎ মনোহর পাইক বড় রকমের আশা নিয়ে চলে যাবার পরদিন) বিকেলে হারাণ উঠোনে পা দিয়েই ধমকে দাঁড়ালো। আজ ঘরে নয়, রাধা দরজার বাইরে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে অপলক দুই চোখ মুখের ওপর আটকে রইলো।

—কি গো বোনাইদাদা কি মনে করে?

হারাণ মণ্ডল আরো হকচকিয়ে গেল। খুব গম্ভীর বটে, কিন্তু শালীর গলা অনেকটা আগের মতোই নরম যেন। বিড়বিড় করে জবাব দিল, তোর খপর নিতে এলাম···রোজই তো আসি।

—কেন, বড় খবরটা তোমার কানে ঢোকেনি? লোকে কি বলছে শোনোনি?

আট বছরের বড় দিদিকে হারাণ মণ্ডল যখন বিয়ে করে নিয়ে যায়, এ-মেয়ের তখন ন'বছর মাত্র বয়েস। এখন যে চোখেই দেখুক, বড় আদরেরই তো ছিল। রাগত মুখে বলে উঠল, যারা বলে তাদের জিভ খসি যাবে!

জবাব শুনে রাধা ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলো একটু। ঠোঁটে হাসির আভাস।—হুঁ?···আচ্ছা খপর নিতে এয়েছো যখন ভালো করেই নাও, ঘরে এসে বোসো।

হারাণ মণ্ডল বিস্ময়ে হাবুডুবু খেতে খেতে দাওয়ায় এসে উঠল,

চপ্পল খুলে ভিতরেও ঢুকল। এই মেয়ে আগে তাকে কথায় কথায় নাকাল করে মজা পেত, মাঝে একটা বছর তার দিকে মুখ তুলেও তাকায়নি। রাধা আবার সেই পুরনো দিনে ফিরে এলে তার থেকে খুশি আর কে হবে?

রাধা মাটির মেঝেতে চাটাই পেতে দিল। —বোসো বোনাই··· খাবে কিছু?

এই ঘরেও হারাণ এক বছর বাদে ঢুকতে পেল। বসে জবাব দিল, আজ বেলায় খেয়ে বেরিয়েছি···কতদিন তো খিদের মুখে ফিরে যাই, খপরও নিস না—

—আ-হা, রাধার যেন কাতর মুখ, তোমার খাবার জিনিস যে আমার ঘরে থাকে না, আজও নেই তবু ভালোবেসে জিগেস করে ফেললাম।

হারাণ মণ্ডল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

—বুঝতে পারছনি? বলি ভাং সিদ্ধির মাত্রা দিদির শোকে ক'গুণ বেড়েছে, দু'গুণ না চার গুণ?

হারাণ মণ্ডল আবারও হকচকিয়ে গেল, মাথাও হেঁট একটু। বেচারার একলা ঘরে নেশা বলতে ভাঙের নেশা। রাতে ওই নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। মাত্রাও আগেব থেকে ঢের বেড়েছে, তবে দু'গুণ কি চার গুণ বলতে পারবে না। এখন আবার শুধু ভাঙে হয় না, সঙ্গে এটা-ওটা মেশাতে হয়। কিন্তু রাধার মুখে হঠাৎ এ-সব কথা কেন! মুখ তুলে যা দেখল তা-ও যেন বিশ্বাস হয় না। রাধা তার দিকে চেয়ে টিপ-টিপ হাসছে।

—কি বলবি বল্···

—বলব? শুনে আবার ভিরমি খাবে না তো?···বিয়ের নামে তো জিভ দিয়ে টসটস করে জল গড়াতো, এখনো সে সাধ আছে না গেছে?

সাহস করে হারাণ মণ্ডল গলা দিয়ে শব্দ পর্যন্ত বার করতে পারছে না।

রাধা একটু চেয়ে থেকে আবার বলল, সাধ যদি থাকে তো

সোজা এখেন থেকে কপালী বাবার কাছে যাও, দিনক্ষণ ঠিক করে একেবারে বর সেজে এসো।

হারাণ মণ্ডলের হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি বুক ঠেলে বেরিয়ে আসবে। বিশ্বাস করবে না করবে না? বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। —আমি বে করব···মানে তোকে?

রাধা ঝামটা দিয়ে উঠল, না আমাকে কেন—ওই বিলাসী বুড়ীকে!

এই লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে বিলাসী সন্তর্পণে দাওযার দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা-বার্তা শুনছিল। হঠাৎ এই মুখ ঝামটা কানে আসতে দু'আঙুল জিভ কামড়ে ছুট লাগালো।

এ-দিকে আনন্দে দিশেহারা হারাণ মণ্ডলও ঘর ছেড়ে বেরুবার মুখে বাধা পড়ল।—শোনো বোনাই!

নিশ্বাস বন্ধ করে হারাণ ঘুরে দাঁড়ালো। হাসি চাপার চেষ্টায় ডাগর দুই চোখ পাকিয়ে রাধা বলল, এখন পর্যন্ত বোনাই বলব না তো কি বলব?

বিগলিত হারাণ মণ্ডল জবাব দিল, তোর যা খুশি তাই বল্—

—ও-বাব্বা! তা শোনো আগে থাকতে বলে রাখি, বে'র পর আমি কারো ঘর করতি যেতে পারব নি, এখান থেকে ঠাঁই-নাড়াও হব না, তোমার যখন ইচ্ছে এখেনে যখন ইচ্ছে বিষ্টুপুরে থাকবে····কিন্তু আমাকে নিয়ে টানাটানি করলে বে ভেঙে দেব জেনে রাখো।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। তোর ইচ্ছা মতোই সব হবে।

খেয়ালী মেয়ের আবার পাছে মত বদলায় সেই ভয়ে পড়ি-মরি করে সে কপালী বাবার ডেরার দিকে ছুটল।

এ-দিন একটু রাত করে কপালী বাবা রাধার খোঁজে এলেন। ওকে সামনে পেয়েই বললেন, কি রে পাগলী, তুই ডবল বয়সের বোনাইকে বেছে নিলি শেষ পর্যন্ত।

রাধা হেসেই জবাব দিল, ডবল হবে না, বছর তেরো-চোদ্দ বড়

হবে। তা শিবের বয়সের কি আর গাছ পাথর আছে!···একদিক থেকে খুব মিল বুঝলে বাবা, ভাং খেয়ে ব্যোম হয়ে পড়ে থাকে।

দিন কয়েকের মধ্যে কপালী বাবা হারাণ মণ্ডল আর রাধাকে তার জংলি কালীর সামনে বসিয়ে তন্ত্রমতে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তাঁর জনাকয়েক চেলা কেবল এ-বিয়ের সাক্ষী থাকল। মা-কালীকে প্রণাম করে রাধা মনে মনে প্রার্থনা করল, কেউ না থাকলে নয় বুঝে এই একজনকেই নিলাম. কিন্তু দিদির বরাত কোরো না যেন মা-গো, তার থেকে বরং আমি সন্তান চাই না।

রাধার বিয়ে আর সেটা কিনা ভগ্নিপতি হারাণ মণ্ডলের সঙ্গে। ছু দিনের মধ্যে এ-খবর কেবল মাতন জয়নগর বা বিষ্ণুপুর কেন, দূরে দূরেও ছড়িয়ে গেল। এমন ভক্তিমতী মেয়েটাকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছল শুনে তারা কতটা বিষণ্ণ হয়েছিল, ক'দিনের মধ্যে তার বিয়ের খবর শুনে ততোটাই খুশি তারাও যেচে এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে এটা-সেটা দিয়ে গেল। আর কাছের মানুষদের তো ভিড়ই পড়ে গেল। আবার ঠারে-ঠোরে এমন কথাও বাতাসে উড়ল যে, তিন-তিনটে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিল, কোন্ বিপদ ঘটে সেই ভয়ে এমন তড়িঘড়ি বিয়ে এবং ভগ্নিপতিকে বিয়ে কিন্তু বিশিষ্টজনদের আনাগোনার ফলে এই কুৎসা তেমন সোচ্চার হয়ে উঠতে পারেনি। কালীভক্ত দোতারাবাবু এসে একশ এক টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করে গেছেন, রুমা সেন আর বিন্দুবাসিনী দেবী রাধাকে একখানা করে গয়না দিয়ে গেছেন। সঙ্গে একজনের ভাগ্নে অন্যজনের ছেলে ছিল। —হ্যাঁ, মন বিষিয়ে ছিল বলে রাধারই চোখের দোষ হয়ে ছিল। এই ছুজনের চোখে এখন আর লোভের ছোবল দেখছে না—ও সি অংশুমান ঘোষের স্ত্রী খুব সুন্দর একখানা শাড়ি দিয়েছেন। রাধা বলেই এ-ধরনের বিয়ের পরেও তার প্রাপ্তি যোগ খুব কম হল না।

মন বিষিয়ে আছে কেবল মনোহর পাইক আর নিতাই স্যাকরার। এই কারণেই ছুজনের ভাব এখন। বাবার কাছে এক চেলার মুখের খবর, নিতাইয়ের দোকানে বসে মনোহর নাকি বুক ঠুকে বলেছে,

রাধাকে সে একদিন না একদিন চরম শিক্ষা দেবেই দেবে—না যদি পারে তাহলে ওকে যেন সবাই বে-জন্মা বলে। দোতারাবাবুর বাজার সরকারও বাবাকে ভয়-ভক্তি করে। সে-ও এসে চুপিচুপি বলে গেছে, হাওয়া ভালো নয়, মনোহর পাইকের মেজাজ ভালো মতো বিগড়েছে। এখানকার মস্তানদের লিডার হিসাবে মনোহরের ক্রোধ দুর্বলের গর্জন বলে ভাবে না কেউ।

কিন্তু মনোহর পাইক চতুর কত সেটা কপালী বাবার বুঝতে বাকি। ক'দিন না যেতে তারও মনে হয়েছে ভিতরের ক্রোধ একটু বেশি জাহির করে ফেলেছে। বাইরে অনেকেই তাকে একটু সমঝে চলে বটে, কিন্তু রাধা আর বাবার ভক্তের সংখ্যা কম নয়।—না, বাবাকে অন্তত সে বিরূপ করে তুলতে চায় না এখন। যে-সব কাজে-কর্মে ভিড়েছে, তাতে বাবার ভক্ত হিসেবে তার পবিচয় আরো উজ্জ্বল হওয়া বরং বাঞ্ছনীয়।

বুদ্ধিটা মাথায় আসতেই রাতে দামী বোতল নিয়ে বাবার কাছে হাজির। তাকে দেখেই বাবাব রক্তচক্ষু। বোতল পায়ের কাছে রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে উঠতেই তিনি ব্যঙ্গস্বরে বলে উঠলেন, আবার এসব ভড়ং কেন, তোরা শালারা তো রাধার শেষ দেখে নিবি বলে শাসাচ্ছিস শুনলাম।

করজোড়ে মনোহর বলল, মানুষ ক্ষ্যাপা হয়ে গেলে কি হয় তোমার তো জানা আছে বাবা—দুঃখে যন্ত্রণায় আমার কি মাথার ঠিক ছেল! মাথা এট্টু ঠাণ্ডা হতে মনে হল, যা হয়ে গেছে, এরপর বাবার ছিচরণ খোয়ালে তো সবই গেল—যা বলেছি সেসব ক্ষ্যাপা কুকুরের কথা বাবা, সব ভুলে মাজ্জনা করে দাও।

এরপর খুশি হয়ে বাবা বোতল খুলেছেন। উপদেশ দিয়েছেন, এবারে তুই দেখে শুনে একটা বে করে ফ্যাল্—

মুখখানা কালি করে মনোহর মাথা নেড়েছে। বলেছে, সেই ছেলেবেলা থেকে আশা ছিল রাধাকে ঘরে আনব, তা যখন হলনি, আর বে নয়—।

এসব কথা বাবা পরদিনই রাধাকে বলেছেন। শুনেই রাগতমুখে রাধা বলে উঠেছে, ও একটা পাজির পা-ঝাড়া বাবা, ওর কোন কথা বিশ্বাস কোরো না।

বলেছে বটে, কিন্তু কোথাও একটু খচখচ করে লেগেছে। সেই ছেলেবেলা থেকে পিছনে লেগেছিল, সত্যি কথাই। ওর বিয়ের সাধ ভালো হাতে মেটানোর জন্য লাল পিঁপড়ের কামড় খাইয়ে একেবারে আধমরা করেছিল। একটু চুপ করে থেকে রাধা আবার বলেছে, ওর চরিত্তি আমার জানা আছে, তুমি ধমকে বলে দাও এক মাসের মধ্যে বে করতি হবে। ঠিক করবে দেখে নিও, এঁঃ, রাধার জন্যি একেবারে বিবাগী দশা—বেঁ করবে না!

ডাক এলেই রাধা আবার গান গাইতে যায়। কিন্তু সর্বত্র আসরে প্রথম যে গানটি গায় তা হল ডাকাতে ধরার ফলে যে কুৎসা রটেছিল তার সরস জবাব। এ-গানও নিজের মন থেকে উঠেছিল, পাছে ভুলে যায় তাই লিখে রেখেছিল। নিজের সুরে বাঁধা ওই গানটাই প্রথমে গায়। লোকে কান পেতে শোনে, খুশিতে মন ভরে ওঠে, আবার চোখও সজল হয়। রাধা চোখ বুজে দুলে দুলে গায়:

তুই কালের বুকে দাঁড়ায়ে কালী
চার আঙুল লাজ দেখালি,
মা আলো (আর) তার মেয়ে কালো
এমন বিচার কোথায় পেলি?

নিজে সাজলে দিগম্বরী
সবাই বলে আ-হা মরি!
মেয়ে রয় বসন পরি
তবু বলে লাজে মরি!

মা তোর সবই দেখি উল্টা পাল্টা
মা সতী আর মেয়ে কুলটা!

এবার মা-গো রঙ্গ ছাড়

হয়েছে খুব বাড়াবাড়ি,

(মা) যদি রাখতে চাস নিজের মান

তবে মায়ে-মেয়ে কর সমান।

পাড়ার কালীপুজোর আমন্ত্রণে সৌজন্য রক্ষার্থে সস্ত্রীক এসে ওর মুখে এ-গান অংশুমানও শুনেছেন। ভালো লেগেছিল। ওই এক গানেই আসর জমিয়ে দিয়েছিল। সুচারু দেবী সানন্দে জানিয়েছেন, ওর মুখে এ-গান আমি আরো তুবার তু'জায়গায় শুনেছি। ডাকাতে ধরে নিয়ে যাবার পর সেই যে নানা কুৎসা রটেছিল, তার জবাব দেবার জন্য এ-গান ও নিজে বেঁধেছে!

অংশুমান কোনো মন্তব্য করেননি। কিছুদিনের মধ্যে সুচারু দেবী মেয়ে-জামাই তুজনকেই নেমন্তন্ন করেছেন। রাধা প্রথম এসে তাঁর বাড়িতে উপোসী থেকে গেছে, এ খেদ তাঁর যায়নি। ওদের আনার জন্য জিপও পাঠিয়েছেন। কিন্তু রাধা একলা এসেছে। অন্য জনের কথা জিগ্যেস করতে হেসে বলেছে, জামাই তোমাদের রাতের ভাঙের জের কাটাতে দিনমানেও ঢুলুঢুলু—তাকে কে আনে। পরের আড়াই তিন বছরের মধ্যে রাধা আর বার-তিনেক সুচারু দেবীর নেমন্তন্ন রাখতে কোয়ার্টারসে এসেছে। বাড়িতে কোনো আনন্দ অনুষ্ঠান হলেই রাধার নেমন্তন্ন। সব বাড়িতেই রাধার কদর কত সুচারু দেবী তা স্বচক্ষে দেখে আসছেন। অংশুমান মুখে প্রকাশ করেন না, কিন্তু মেয়েটার ভারি সহজ চালচলন সাদাসাপটা কথাবার্তা তাঁরও ভালোই লাগে। অবশ্য স্ত্রীর মতো নয়, তাঁর বিশ্বাসের আবেগ অন্যরকম।

তৃতীয়বার রাধা আসতে তার এমনি সাদাসাপটা কথা শুনে অংশুমান কিন্তু রেগেই গেছলেন।...তাঁর তিন বছর হয়ে গেল এখানে, এবার কেবল বদলি নয়, মনে মনে প্রমোশনের আশাও করছেন। এম-এসসি ডিগ্রি আর চাকরির রেকর্ডের বিবেচনায় এটা তুরাশা কিছু

নয়। তাছাড়া তিন থেকে চার বছরের মধ্যে বদলি তো তাঁরা হয়েই থাকেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর এটা-সেটা গল্প হচ্ছিল। অংশুমান সামনে বসে সেদিনের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন, কলকাতার ইংরেজী বাংলা কাগজদুটো বেশ দেরিতে আসে, সকালে প্রায়ই ভালো করে পড়া হয়ে ওঠে না।

কথায় কথায় সুচারু দেবী বললেন, হ্যাঁরে রাধা ডাক্তার গিন্নির কোন্ বোনকে দেখে আর তার খুব বিপদের কথা শুনে তুই নাকি বলে দিয়েছিলি পনেরো দিনের মধ্যে সব বিপদ কেটে যাবে—তাই হয়েছিল, সত্যি নাকি?

লজ্জা পেয়ে রাধা বলল, আমি বলার কে, মা বলালে, বলি ফেললাম, ডাক্তার দিদির বোন কান্নাকাটি করছেল সোয়ামীর ব্যাঙ্কের কি গণ্ডগোলে তার বিচার চলছে, শাস্তি হলে চাকরি যাবে জেল হবে, তা ভদ্দলোকের মুখে চেয়ে আমি কোনো বিপদের ছোঁয়াই দেখলাম না, কিন্তু ওই বোনের কান্না দেখে ঘাবড়ে গেলাম, তখন মা বলে দিলে কিচ্ছুটি হবে না।

অংশুমান তখনো মুখ থেকে কাগজ সরাননি। কাকতালীয় ব্যাপার কিছু ঘটেছে ধরে নিয়ে মনে মনে হাসছেন। স্ত্রী হঠাৎ সাগ্রহে জিগ্যেস করে বসলেন, তা তোর বড়বাবুকে দেখে বলে দে না, বদলির তো সময় হয়ে আসছে, এবার প্রমোশন মানে উন্নতি টুন্নতি কিছু হবে কি না?

মুখ থেকে অংশুমান এবার কাগজ সরালেন। স্ত্রীর বিশ্বাসের বহর দেখে কৌতুকই বোধ করছেন। রাধা একটু ঘুরে তাঁর দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইলো, তারপর তাঁর স্ত্রীর দিকে ফিরে আলতো করে বলে বসল, তোমরা এখন ইখেন থেকে নড়ছ টড়হ না-গো দিদি, আমাদের ভাগ্যিতে ইখেনেই তোমরা আরো অনেক বছর আছ।

শুনেই অংশুমান বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালেন। এদিকে সুচারু দেবী বলে উঠলেন, বলিস কি রে তুই—আর ছ'মাস এক বছরের মধ্যে তো নড়তেই হবে, তাছাড়া উন্নতিও হবার কথা!

শুনেই অংশুমান তাঁকেই থেঁকিয়ে উঠলেন, এসব তোমাকে কে জিগ্যেস করতে বলেছে—বুজরুকির কথা শুনতে খুব ভালো লাগে—কেমন ?

বড়বাবুর হঠাৎ এই রাগ দেখে রাধা প্রথমে বেশ অবাক। তারপর গম্ভীর। মোড়া ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। স্থির চোখে মুখের দিকে চেয়ে রইলো খানিক। ধীর ঠাণ্ডা গলায় বলল, বুজরুকির কথা আমি বলি না বড়বাবু, মা সহজে বলায় না, কিন্তু রগড় দেখার জন্য হঠাৎ হঠাৎ কেন যে বলায় তা-ও জানি না, রাগ করো আর যা-ই করো এখন অনেক বছরের মধ্যি তোমার নড়া-চড়া বা উন্নতি-টুন্নতি কিছুই হবেনি, ইখেনেই থাকতে হবে তোমাকে বড়বাবু।

এবারে অংশুমান আরো রেগে গেলেন। বলে উঠলেন, আর তার অনেক আগে যদি আমাকে এখান থেকে যেতে হয় তাহলে যে-কোনো ছুতোয় আমি তোকে এখানকার লক্-আপে ঢুকিযে রেখে যাব জেনে রাখিস।

—কোথায় ঢুকিযে রাখবে ?

অংশুমান চেঁচিয়ে উঠলেন, এখানকার গারদে—বুঝলি ? সহজে যাতে না ছাড়ে সেই ব্যবস্থা করে যাব।

এবারে রাধা হেসে মাথা হেলালো।—তাই কোরো, এক বছর ছেড়ে তিন বছরে তুমি ঠাঁই নাড়া হলে আমি নিজে তোমার লোক-অপের বাসিন্দে হব।

...একটা বছরের ওপর ঘুরে গেল। অংশুমান নিজে কলকাতায় এসে তদবির করে গেছেন। কিন্তু প্রশাসনের চেহারাই তখন অন্য-রকম। চতুর্থ জেনারেল ইলেকশনে হেরে প্রফুল্ল সেনকে সরে যেতে হয়েছে, তার জায়গায় অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী, তার কিছুদিনের মধ্যে প্রফুল্ল ঘোষ। পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা তখন নিজেদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। মফঃস্বলের এ পর্যায়ের কর্মচারীর ব্যক্তিগতভাবে কার কি ক্ষতি হচ্ছে দেখার ফুরসৎ নেই।

শুনে সুচারু দেবী চিন্তিত। —মেয়েটা তাহলে কি কথা বলে

গেছল গো ?

অংশুমান বিরক্ত। —ছাড়ো তো! কলকাতার বাবুদের কি এভাবেই চলবে নাকি ? এখন না হয় ছ'মাস আট মাসের মধ্যে হবে!

ডাক্তার বিজন চৌধুরীর মুখে খবরটা শুনে সুচারু দেবী তো কেঁদেই ফেললেন, মনে যত রাগই থাক অংশুমানও স্তম্ভিত।

রাধার স্বামী হারাণ মণ্ডল মারা গেল। সেরিব্রাল থ্রম্বসিস, এক থাবাতেই দেহের একদিক পড়ে গেছে, গত কাল বিকেলে খবর পেয়ে ডাঃ চৌধুরী ছুটে গেছলেন, আজ গিয়ে ডেথ সারটিফিকেট লিখে দিয়ে এলেন।

রাধার তেইশ বছর বয়েস মাত্র।

ডাক্তারের পরের কথায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বিস্মিত। বললেন, আশ্চর্য মেয়ে মশাই আর তেমনি স্নায়ুর জোর। কান্নাকাটি হা-হুতাশ কিচ্ছু নেই। উল্টে ঠাণ্ডা মুখে তাঁকে নাকি বলেছেন, এরকম কিছু একটা ঘটবে ও আগেই বুঝেছে, ক'রাত ধরে খুব বাজে স্বপ্ন দেখছিল।

কি স্বপ্ন সেটা তিনি বলতে পারলেন না, জিগ্যেস করার সময়ও নয়।

রাধার চার বছরের বিবাহিত জীবনে হারাণ মণ্ডলের অস্তিত্ব প্রায় নিষ্প্রভই ছিল। তার বাইরের কাঠামো দেখে বোঝা যায়নি ভাঙের সঙ্গে নানা ছাই-ভস্ম মিশিয়ে খেয়ে খেয়ে জীবনী শক্তি কত ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। রাধার মতো বউ পেয়েই খুশি, কিন্তু তার সাধ যতো ছিল সাধ্য ততো ছিল না। কিন্তু এ নিয়ে রাধার খুব একটা অভিযোগ ছিল না। নেশা ছাড়াতে চেষ্টা করে ছাখে লোকটার খাবি-খাওয়া মাছের মতো প্রাণ যায় যায়। তাই চেষ্টা ছেড়েছে। লোকটা তার

কথায় ওঠে-বসে, রাধা নিজের মন মেজাজ আর ভাব নিয়ে বেশ আছে।

কেবল এক ব্যাপারে বয়স্ক মানুষটার ওপর খুব বিরক্ত। লোকটার শোয়া বড় খারাপ। নেশার ঘোরে কিনা জানে না, জায়গা পেলে বেহুঁশ ঘুমে ঘরের চারদিকে গড়াবে। এদিকে তার ঘরের মাটির দেয়ালে ঠেস-দেওয়া সারি সারি ছবি বসানো। মাঝখানে মা-কালীর বড় ছবি, তারপর শিবের। এদের এক পাশে ফকির সাহেবের দেওয়া মলোঙ্গা বাবার ছবি, বড়পীরের ছবি। অন্যদিকে শফিদার মায়ের দেওয়া বনবিবি আর বিবিমায়ের ছবি। বনবিবির পায়ের কাছে তিন-তিনটে বাঘ। রাধা রোজ সকলের সামনে ফুল-জল রাখে, ভক্তিভরে সব্বাইকে প্রণাম করে। গান গেয়ে বা কপালী বাবার জংলি মায়ের আরতি দেখে রাধার ফিরতে একটু রাত হয়ই। কিন্তু এসেই সেই এক দৃশ্য তাকে দেখতেই হবে। মানুষটার লুংগি ঠিক থাকে না বলে রাধার হুকুমে তাকে একটা পাজামা পরে শুতে হয়। কিন্তু ঘুমের মধ্যে গড়াতে গড়াতে কোনো না কোনো ছবির গায়ে তার পা ঠেকবেই।

রাধা আঁতকে উঠে চেঁচামেচি করে ছুটে আসে, বকাবকি করতে করতে ধাক্কা মেরে মেরে ঠেলে ঠেলে তাকে জায়গায় নিয়ে যায়। নেশার ঘোরে লোকটা বিড়বিড় করে কি বলে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। যার গায়ে পা ঠেকেছে অনেকক্ষণ ধরে তাকে তো বটেই, বাকি সব ছবিতে ভক্তিভরে প্রণাম করে তবে স্বস্তি। কতদিন সকালে বকাঝকা করেছে, এঘরে আর তোমার ঠাঁই হবে না, পিছনের ওই চালা ঘরে তোমার শোবার ব্যবস্থা করব।

বেজার মুখ করে হারাণ বলে, আমি কি ইচ্ছে করে তোর ঠাকুরের গা ছুঁই ?

সে রাতে ঘুমনোর আগে রাধা ঘরে থাকলে আর এরকম হয় না, ওকে ডিঙিয়ে তো আর যেতে পারে না। বিছানা পেতে মাঝখানে উঁচু করে কিছু রেখে গেলেও এক-এক রাতে এসে দেখে সে-সব ঠেলেঠুলে ঠিক ফোটোর দিকে বা কোনো ফোটোর গায়ে তার পা। ভেবেচিন্তে

রাধা এরপর একটা পাকা ব্যবস্থা করল। ওর নিজের একটা বড়সড় আর উঁচু টিনের বাক্স আছে, আর হারাণের তার থেকে একটা ছোট বাক্স আছে। বিছানা পেতে সেই দুই বাক্স মাঝখানে রেখে তবে বেরুতো। ফিরে এসে সে দুটো সরিয়ে তবে নিজের শোয়া।

তা সত্ত্বেও নেশার ঘোরে জায়গা ভুল করে সে এক-একদিন রাধার জায়গায় শুয়ে পড়ে। ছবিগুলোর তখন বিতিকিচ্ছিরি দশা। বিলাসীকে বকাবকি করার পর এ-ও অবশ্য কমেছে। লোকটার হুঁশ থাকতে থাকতে সে-ই দেখে নেয় ঠিক জায়গায় শোয়া হল কিনা। হপ্তা তিনেক আগে রাধা বিকেলের দিকে বেরিয়েছিল। সন্ধ্যার মধ্যেই ফেরার কথা। কিন্তু এমন আটকে গেল, ফিরতে রাত ন'টা। মনে যে আশংকা ছিল এসে দেখে তার থেকেও বিপত্তি। বিছানার মাঝখানে বিলাসী বাক্স পেতে দেবে এমন আশা করাও ভুল। লোকটা চিৎপাত হয়ে ছবিগুলোর উপরে পড়ে আছে।

তার পর থেকেই রাধা মাঝে মাঝে বিদিকিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে চলেছে। একদিন দেখল মায়ের খাঁড়া রক্তে ভেজা, কোনদিন দেখল শিবের মাথার সাপ ফণা উঁচিয়ে ফোঁস ফোঁস করে কারো দিকে তেড়ে যাচ্ছে। একদিনের স্বপ্ন, বনবিবির পায়ের কাছ থেকে বাঘ তিনটে জীবন্ত হয়ে উঠে সগর্জনে কারো দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এর দুদিন বাদে হারাণ মণ্ডল মারা গেল।

একটা বছরের ওপর কেটে গেল, আটষট্টি সাল পেরিয়ে উনসত্তর চলছে। ও সি হিসেবে অংশুমানের এখানে ছ' বছর চলেছে। যেমন হতাশ তেমনি বিরক্ত। প্রশাসনের স্থিতি আসা দূরে থাক, দিনে দিনে আরো জটিল হয়ে পড়েছে। গেল বছরে প্রেসিডেণ্টস রুল গেছে, তার প্রতিক্রিয়া পুলিশ কর্তৃপক্ষের ওপরেও পড়েছে। এ বছর আবার দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার শাসনে এসেছে, অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী, জ্যোতি বসু উপমুখ্যমন্ত্রী। এই সরকারেরও স্থিতিশীলতা অনিশ্চিত, পুলিশ প্রশাসনেরও বিশেষ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ

নেই। তার ওপর নকশাল উপদ্রব নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে, ফলে শক্ত অফিসার হিসেবে অংশুমানের সুনামই তাঁর ক্ষতির কারণ। বড় কর্তাদের কাছ থেকে বন্ধ খামে যা আসে তার বেশির ভাগই সতর্ক তৎপরতার আদেশ বা নির্দেশ।

মনের এই অবস্থায় অনেক দিন পরে রাধার সঙ্গে দেখা। সঙ্গে স্ত্রী সুচারু দেবী।

তাঁর সঙ্গেও রাধার দেখা সাক্ষাৎ কমে গেছে, কারণ, বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া রাধা বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। হারাণ মণ্ডল মারা যাবার পর সুচারু দেবী একবার এসেছিলেন। ওকে তেমন শোকগ্রস্ত না দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর ডেকেও আর তাকে বাড়িতে আনতে পারেননি। ইতিমধ্যে ডাক্তার গিন্নির বাড়িতেও সে আর আসেনি। মাঝে একবার মাত্র তার গান আছে শুনে ডাক্তার গিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে দু'মাইল দূরের এক অনুষ্ঠানে গেছলেন। তখন দেখা হয়েছে। কিন্তু রাধাকে তখন অনেকে ঘিরে, কথা বলার সুযোগ হয়নি। দোতারাবাবুর মারফৎ রাধাকে একবার দেখা করার কথা অংশুমান নিজে মুখ ফুটে বলে পাঠিয়েছিলেন। এখানে আসার অনেক দিন পরে দোতারাবাবুর সঙ্গে আত্মীয়তার যোগসূত্র বেরিয়ে পড়েছিল। তাঁর স্ত্রীর দূর সম্পর্কের কি-রকম ভাই হন। বয়সে অংশুমানের থেকেও পাঁচ-ছ বছরের বড়। এদিকে এলে মাঝে মাঝে কোয়ার্টারস-এ আসেন। খোলামেলা মনের দূর-সম্পর্কের এই কালীভক্ত দাদাটিকে সুচারু দেবীর ভালো তো লাগেই, অংশুমানও পছন্দ করেন। তাঁর মারফৎ রাধাকে আসতে বলার কারণ স্ত্রীর ক্ষোভ আর চাপা গঞ্জনা। ওর প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, ও এখানে আর আসবে কেন, বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে যে মূর্তি দেখিয়েছ। এখন ওর কথাই ফলছে কিনা?

ব্যাপার শুনে দোতারাবাবু হেসেছিলেন আবার একটু অবাকও হয়েছিলেন। বলেছিলেন, কখন যে কি মুডে থাকে মেয়েটা—কিন্তু ও ভবিষ্যদ্বাণী-টানি করে এতো জানতাম না! তারপর সুচারু দেবীকে

বলেছেন, তবে নিশ্চিন্ত থাকো, ও কারো ওপর রাগ পুষে রাখার মেয়েই নয়, এখন কারো বাড়িতেই বিশেষ যায়টায় না, ওর গান শোনার ইচ্ছে হলে আমাকেই এখন কপালী বাবার ডেরায় যেতে হয়, সন্ধ্যার পর বেশির ভাগ সময় সেখানেই পড়ে থাকে, জংলি কালীকে গান শোনায়। আমার বাড়িতে বিগ্রহ নেই, রুমা সেন আর বিন্দুবাসিনী দেবীর বাড়িতে গোপালের বিগ্রহ আছে, কেবল ওই তু' বাড়িতে যায় শুনেছি। তবু বলব'খন।

থানার বড়বাবু যেতে অনুরোধ করেছেন শুনে রাধা বলেছে, মন না টানলে কোথাও তো যেতে পারি না, দেখি—।

গেল বারে কালীপুজো উপলক্ষে রাধা কোথাও গাইতে বেরোয়নি, এবারে এসেছে। সুচারু দেবী স্বামীকে আগে থাকতেই তাড়া দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এমনই চাকরি পুলিশের, বেরুবার ঠিক আগে তুটো ছেলেকে নকশাল সন্দেহে ধরে আনা হয়েছে, তারা নাকি কোথাকার এক খুনের ব্যাপারে জড়িত।

ঝামেলা তখনকার মতো চাপা দিয়ে এসে পৌঁছুলেন যখন, রাধার সবে তখন তৃতীয় গান শেষ হয়েছে। শ্রোতাদের এবারের তাগিদ, ক্ষ্যাপা বাবার গান, বামা ক্ষ্যাপার সেই গান হোক!

দেরির জন্য সুচারু দেবী স্বামীর ওপর বিরক্ত, কিন্তু তক্তাপোষের ওপর সাদা চাদর বিছানো মঞ্চে রাধাকে দেখে তাঁর তু'চোখ জুড়িয়ে গেল। পরনে চওড়া হালকা নীল-পাড় আনকোরা শাড়ি, গায়ে সেই রঙের ব্লাউস, পিঠের ওপর খোলা চুল ছড়ানো। মঞ্চে জোরালো আলো। সেই আলোয় চব্বিশের উপছানো কালো রূপের যৌবন শুধুই যেন শান্ত ভাবের শাসনে বাঁধা। হাঁটু মুড়ে পিছ-পা করে বসা, মেরুদণ্ড সোজা। তু'চোখ বোজা, অল্প অল্প তুলছে।

অস্ফুট স্বরে সুচারু দেবী বললেন, আগের থেকেও কত সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে—আ-হা!

শেষের আ-হাটুকু অকাল বৈধব্যের কারণে। গান শুরু হতে শ্রোতারা একেবারে চুপ।

'তুই যেমন মা ধনীর বেটী বাবা তেমন ধনীর বেটা।
বুড়োবৃষ সিদ্ধির ঝোলা এই তোমাদের পুঁজিপাটা।
ধন দিবি তোর মাথা মুণ্ড, বাবার তরে বিষের ভাণ্ড
তোমার সম্বল নরমুণ্ড, হাতে একটা গলায় ক'টা।
বাস বিনা শ্মশানবাসিনী বস্ত্রবিনা উলঙ্গিনী
অন্ন বিনা ত্রিশূলপাণি, পায়ে পড়ে দেখায় ঘটা।'

ঘুরে ফিরে দুবার করে গাইল। একটু স্থির হয়ে বসে থেকে আবার অনুরোধ আসার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে মাথা নুইয়ে সকলের উদ্দেশ্যে নমস্কার করল।

বেশি না হলেও রাধার গান অংশুমান আগেও শুনেছেন। খারাপ অবশ্যই লাগেনি। কিন্তু কোনরকম ভাব বা আবেগের যোগ ছিল না। অথচ আশ্চর্য, আজ চোখের কোণ দুটো কি রকম শিরশির করে উঠল, বুকের তলার অনুভূতিটুকুও অন্যরকম। গানের দরুণ নয়, নিজের মনেই একটু পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছেন।

আগেই বলা ছিল, উঠে দুজনে সামনের ক্লাবঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন। মিনিট দুই বাদে একজন ভলান্টিয়ার রাধাকে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল।

দেখেই রাধা খুশি।—ও মা, বড়বাবু যে! দিদি কেমন আছ?

সুচারু দেবী তার হাত ধরলেন, আগে তোর কথা বল, আমাদের তো ত্যাগই করেছিস।

অপ্রতিভ মুখে নিজের দোষ স্বীকারই করল যেন। —ডেকে পাঠিয়েছিলে তবু যেতে পারিনি—কিন্তু কি করি গো দিদি, মা যেন গলায় গামছা বেন্ধে টানি রেখেছে।

অংশুমান বললেন, তোর দিদির ধারণা আমার ওপর রাগ করেই তুই আর আসিস না—

রাধার দু'চোখ বড় বড়, আমি রাগ করতি যাব কেন গো। তার-পরেই মনে পড়তে হেসে উঠল। —তাই তো! তোমার ইখেন থেকে

নড়ার কি হল গো বড়বাবু—ক'বছর হল ?

অংশুমানের ভালো লাগছে, হালকা বোধ করছেন। জবাব দিলেন, অনেক বছর, নড়ার কি হল দেখতেই পাচ্ছিস।

রাধা হেসে সুচারু দেবীকে বলল, রাগ করব কি, আমার মনেই ছেল না। বড়বাবুর দিকে ফিরল, দুঃখ করছ কেন, ভালোই তো আছ—

এই প্রথম একটু দুর্বলতা ধরা পড়ল অংশুমানের।—ভালো করে ছাখ্ দেখি, এ-রকম ভালোই এখন থেকে যাবে ?

রাধার ডাগর দু'চোখ আস্তে আস্তে তাঁর মুখের ওপর স্থির হল। অপলক কয়েক পলক। তারপর হালছাড়া গোছের করে জবাব দিল, হলনি, মা কিছু বলে দেল না, আমি কি কিছু জানি যে নিজে বাহাদুরি করে বলব !

এই জবাবই আজ কেন যেন সব থেকে ভালো লাগল অংশুমানের

আরো একটা বছর গড়াতে চলল। রাধার পঁচিশের যৌবনে আবার একজনের পদসঞ্চার দিনে দিনে যেন অমোঘ হয়ে উঠছে। গোড়ায় গোড়ায় রেগে গেছে, সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রতিরোধ করতে চেয়েছে। এখনো নিজের সঙ্গে যুঝছে, কপালী বাবার সঙ্গে যুঝছে, আর ওই একজনের সঙ্গেও যুঝছে। কিন্তু যোঝার জোর কমে আসছে তা-ও নিজেই অনুভব করছে।

ওই একজন মনোহর পাইক।

ক'বছর আগে কপালী বাবার কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার ব্যাপারে একবার রাধার কাছেও এসেছিল মনোহর পাইক। কপালী বাবাই বলেছিলেন, আমি না-হয় ক্ষমা করলাম, কিন্তু রাধা ভুল বুঝছে, একবার তাকে বলে যা—

আপোসের মুখই বটে তখন, কিন্তু দু'চোখে তখনো রাধা থেকে থেকে লোভ চিকিয়ে উঠতে দেখেছে। তবু সত্যিই রাগ করেনি, কারণ এত বছরের লোভ ছাড়ব বললেই একদিনে ছাড়া যায় না।

কিন্তু মুখে রাগ দেখিয়েছে। বলেছে বিবাগী হবার দশা তোমার নয়, পয়সার জোর হয়েছে, খুঁজলে আমার থেকে ঢের ভালো আর ঢের সুন্দর মেয়ে পাবে, ফের যখন আসবে একেবারে বউ নিয়ে এসো।

মনোহর বলেছে, তুই ভালো থাক, আমার ভাবনা আমিই ভাবতে পারব।

কিছুদিন বাদে মনোহরের মা মারা গেল শুনে কর্তব্যের দায়ে এক-বার তার ওখানে গেছল শোক যে কত মুখ দেখেই বোঝা গেছে। যতক্ষণ ছিল, লোভের চাউনি সর্বাঙ্গ ছেঁকে ধরে ছিল। রাধা দায় সেরে হাঁপ ফেলে ঘরে ফিরল পরের দু'বছরে অনেক গানের আসবেই রাধা তাকে দেখেছে। ভক্তির গানে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই রাধা খুব ভালো করেই জানে। ছেলেবেলায় অনেক বার বলেছে, ও-সব গান ছেড়ে সিনেমার গান শেখ না। কেবল দেখার টানেই আসে জানা কথা। কিন্তু বাক্যালাপ এর মধ্যে আর হয়নি।

হারাণ মণ্ডল মারা যাবার পর দেখা করতে আসেনি। বুদ্ধি আছে বলেই আসেনি। এলে রাধা হয়তো তাড়িয়েই দিত। বেশ ভালো করেই জানে ওই মৃত্যুতে খুশি কেবল এই একজনই হয়েছে। দু'দিন আগে হোক পরে হোক উৎপাত শুরু হবে জেনেই মনটাকে কঠিন করে তুলছিল। প্রথম মাস দুই রাধা কপালী বাবা অর্থাৎ জংলি কালীর কাছে গিয়ে বসে থাকত। খেয়াল খুশি মতো নাম করত। বিকেলে বিকেলে যাবার সময় রাধা পিছনের পুকুর পার ধরে জংলা পথে যায়, কিন্তু রাতে ফেরার সময় সদর দিয়েই ফিরতে হয়। এক এক রাতে সেখান থেকে বেরিয়ে দেখে সাইকেল নিয়ে ওই মূর্তি-দাঁড়িয়ে। রাধা রাগে রি-রি করতে করতে বাড়ি ফেরে, কিন্তু সঙ্গ নিয়ে মনোহর একটি কথাও বলে না। রাধাকে ডেরা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সাইকেলে চেপে চলে যায়।

এ-রকম বার দুই তিন হবার পর রাধা ঠিক করেছে যা বলার কপালী বাবাকে দিয়েই বলাবে। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার পর ওই মূর্তি সোজা কপালী বাবার ডেরায় এসে হাজির। হাতে একটা টর্চ।

সাইকেলটা দাওয়ায় ঠেস দিয়ে রেখে উঠে এলো। কপালী বাবাকে বেশির ভাগ লোক ভক্তি যত না করে ভয় হয়তো তার থেকে বেশি করে। রক্ত চক্ষু মেলে রাধা এই একজনের বুকের পাটা দেখল। টর্চটা কপালী বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা ওকে দিয়ে দিও বাবা, এই গরমে যা সাপের উপদ্রব, অন্ধকারে পথ চলা ঠিক নয়।

সাপের উপদ্রব নতুন কিছু নয়, আর রাধা ছেলেবেলা থেকেই রাতে পায়ে হেঁটে চলা-ফেরা করছে। সাহস দেখে অবাক। আর বাবাও তেমনি, টর্চটা নেবে কি নেবে না ভেবে পাচ্ছেন না। রাধা হিসহিস করে বলে উঠল, আমাকে সাপে কাটুক বাঘে খাক তোমার তাতে কি?

জবাব না দিয়ে টর্চটা বাবার সামনে রেখে প্রস্থান করল। না রাধা ও-টর্চ ছোঁয়ও নি।

কিন্তু সাত আট মাস ধরে এ-রকম নীরব উপদ্রব বেড়েই চলল। রাধার ঘরের সামনের রাস্তা দিয়ে সাইকেলে কম করে বিশ ত্রিশবার যাতায়াত করে। আবার এক-একদিন সকালে ঘর ছেড়ে দাওয়ায় দাঁড়িয়েই রাধা দেখে সাইকেলে ঠেসে দিয়ে ওই মূর্তি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হয়, রাধা দুচোখে ওকে ভস্ম করতে চায়। মনোহর পাইক নির্লিপ্ত মুখে সাইকেলে উঠে চলে যায়। একদিন গিয়ে দেখে সে আগে থাকতে কপালী বাবার ডেরায় জংলি কালীর সামনে বসে আছে। একদিন দেখামাত্র রাধা কপালী বাবার ওপরেই রাগে ফেটে পড়ল।—বলি এত লাই দিচ্ছ কেন, এখানে একটু নাম করতি আসি তা-ও বন্ধ করতি চাও?

ওর রাগ দেখেও কপালী বাবা হাসছেন। মনোহরের দিকে তাকালেন।—বললাম, ওর আসার সময় হয়েছে, পালা—এখন দোষটা পড়ল আমার ঘাড়ে!

মনোহর একটি কথাও বলল না। উঠে চলে গেল। রাধা সরোষে তাকে যেতে দেখল তারপর বাবার দিকে ফিরল। —ওকে এ-রকম করে আসকরা দিচ্ছ কেন, তোমারও কি ইচ্ছে একটা বছর না যেতে আমি ওকে বিয়ে করে বসি?

একটু চেয়ে থেকে কপালী বাবা বললেন, বছর যেতে আর দেড় মাসও বাকি নেই।—তার পরে বিয়ে করতে রাজি আছিস?

রাধা তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইলো খানিক। তারপর বলে উঠল, তোমাকে কি খুব বেশি বোতলের ওপর রেখেছে ও?

—তা রেখেছে।...আবার আমার একবার হিমালয়ে ঘুরে আসার সাধ দেখে খরচ যা লাগে তাও দেবে বলেছে।

রাধা কি নিজের কান ছুটোকে বিশ্বাস করবে? বাবার হিমালয়ে ঘোরার অনেক দিনের সাধ জানে। আগে অনেক সময়ই রাধাকে বলেছেন, মা যদি যোগাযোগ করে দ্যান, এখানে এসে মায়ের পুজোটা তুই রোজ করে যেতে পারবি না? মন্ত্র-টন্ত্রের দরকার নেই, তোর মতো পুজো আর কেউ করতে পারবে না।

বাবা আবারও গম্ভীর তেমনি।—আমার কথা ছেড়ে দে, ওর মদ না খেলেও আমার দিন চলে যাবে, আর মা না চাইলে হিমালয়ও হবে না—ছোঁড়াটা আমাকে পাগল করে ছাড়ছে তা-ও না। আমার কথা তোর ভাবার দরকার নেই, কিন্তু তুই কি করবি সেটা খুব ভালো করে চিন্তা কর। আমার মাঝে মাঝে খটকা লাগে, মনোহর সেই ছেলেবেলা থেকে যে ভাবে তোকে চেয়ে আছে, বয়েস তিরিশ পার হতে চলল তবু বিয়ে করল না—ওর জন্যেই মা অমন হুট্ করে হারাণকে টেনে নিল কিনা।—ও বলে হারাণকে তুই কেবল জেদ করে বিয়ে করেছিলি। সে যাক, তুই তোর মনের দিকে তাকা, মনটাকে খুব ভালো করে দেখে আর বুঝে নে, এভাবেই জীবনটাকে চালিয়ে দিবি এ-সংকল্পের যদি নড়চড় না হয় তাহলে মনোহরকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে আমার ছুদিনও লাগবে না।

—সেই রাতে নাম-গান করতে গিয়েও রাধা বিমনা হয়ে পড়ছিল। ঘরে ফিরেও অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করেছে। কপালী বাবা যেন ওর অগোচরে একটা পর্দা সামনে থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। নিজের মন দেখতে পাচ্ছে রাধা।—যে একজন এসেছিল, সে তার জীবন বা যৌবনের দোসর হতে পারেনি। পরিপূর্ণ যৌবনের নারী-সত্তা যে

এমন উপোসী, তার হদিস আর কি কখনো পেয়েছে। বাবা তার এ কি সর্বনাশ করে বসল? পরেই মনে হল, বাবা ওর নিজের মন দেখতে আর বুঝতে বলেছে শুধু। ওর ভিতরে রস-কষ নেই, এমনতো নয়, এই উপোসী সত্তাকে চোখ ঠেরে আর কতদিন দাবিয়ে রাখা যেত? এই প্রথম টের পেল তার ভিতরের ওই উপোসী রমণী সত্তা খুব স্থির হয়ে বসে নেই।

—পরের রাতে রাধা জয়নগরের রুমা সেনের বাড়ি থেকে গান গেয়ে ফিরছিল। রাধাভাবে রাধা আবিষ্ট, রুমা সেন চোখের জলে ভেসেছেন।

মানা করি রাই রংগিনী আর যমুনায় যাইও না,
কালো রূপ লাগিলে অঙ্গে হেমাংগী আর রবে না।

রাধা সাইকেল রিকশয় ফিরছে। রাত দশটার কাছাকাছি। তাকে পৌঁছে দেবার জন্য রুমা সেনের ভাগ্নে অজয় গুপ্ত সাইকেলে পাশে পাশে আসছে। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে একবার ঘাড় ফেরাতে রাধার মনে হল অজয় গুপ্তর দেড় দু'হাত তফাতে আরো একজন সাইকেল চালিয়ে আসছে। ভালো করে তাকালো। তাই।

আত্মস্থ হতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল। তারপর বেশ সহজ গলায় রাধা অজয় গুপ্তকে বলল, তোমাকে আর আসতে হবে না বাবু, তোমার পাশে যে আসছে সেই পৌঁছে দেবে।

কথাগুলো মনোহর পাইকেরও কানে গেল। অজয় গুপ্ত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল কে আসছে, তারপর সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

ঘরের সামনে এসে রাধা সাইকেল রিকশ থেকে নামল। সাইকেল থেকে মনোহরও। রিকশ ভাড়া রুমা সেন আগেই দিয়ে... রেখেছিলেন, সে রিকশ নিয়ে চলে গেল।

সরু রাস্তার এদিকে রাধা, ওদিকে মনোহর পাইক। অন্ধকারে কেউ কারো ভালো করে মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু দুজনেই

ত্ব'জনার দিকে চেয়ে আছে।

রাধাই প্রথম ঝাঁঝালো গলায় কথা বলল, ভেতরে আসার ইচ্ছে না ঘরে ফেরার?

সাইকেল নিয়ে মনোহর আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। গম্ভীর গলায় বলল, আমি কেবল শেষবারের মতো ত্ব'চারটে কথা বলার মতো সময় চাইছি।

রাধাও তেমনি গম্ভীর।—তুটো কি চারটে কি তার বেশি আগে হিসেব করি নাও, আমি শুনব।

মনোহর চুপ করে চেয়ে আছে।

—আচ্ছা বলে ফ্যালো।

—ইখেনে দাঁড়িয়ে?

রাধা বলল, ও—মাঝ রাতে ঘরে ঢুকি বলার মতো কথা? আচ্ছা তোমার কথা আমি বুঝি নিছি, আমার জবাব কাল বাবার থেকে শুনি নিও—

খুব ঠাণ্ডা মুখ আর ঠাণ্ডা গলা মনোহরের। যদিও রাধার কথাবার্তার সুর আজ অন্যরকম লাগছে, কিন্তু এটুকু বিশ্লেষণ করার মতো মন নয়।—শোন রাধা, আজই হাঁ-না শেষ কথা বলে দে, কাল বা আর কোনোদিনই হয়তো আর আমার মুখ দেখবি না!

উঠোনে পা দিতে গিয়েও রাধা ঘুরে দাঁড়ালো। আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে মুখখানা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করল।—কেন? গাঁও ছাড়ি বিবাগী হয়ে যাবে?

মনোহর তেমনি ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, গাঁও ছেড়ে না।... একদিন তুই আমাকে শ'য়ে শ'য়ে পিঁপড়ে দিয়ে খাইয়েছিলি, এমন যন্ত্রনার তুলনায় ওটা কিছু না—তা যন্ত্রনা শেষ করতে গাঁও ছাড়ি না, আমি দেহ ছাড়ার শপথ নিছি, তার ব্যবস্থা মজুত আছে, তুই তোর শেষ কথা বল্লি দে।

রাধার বুকের ভিতরটা ভয়ানক ধড়ফড় করে উঠলো। মনে হল দশ বছর আগে শ'য়ে শ'য়ে লাল পিঁপড়েগুলো এক সঙ্গে ওর দেহেই

কামড় বসালো। পরের মুহূর্তে ভয়ংকর রাগ হয়ে গেল। কাল কি শুনতে বাবার কাছে যেতে বলেছে এই গোঁয়ার তা-ও বোঝেনি। অস্ফুট স্বরে বলল, ভিতরে আসি দাঁড়াও—

নিজে আগে হন হন করে চলে এলো। আধা-আধি দরজা আগলে বিলাসী দাওয়ায় শুয়ে আছে, তার মাথার কাছে লণ্ঠন জ্বলছে। নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে। দেখে নিয়ে রাধা তেমনি দ্রুত ফিরল। মনোহর সাইকেলটা বাইরে ঠেস দিয়ে রেখে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাধা তার আধ হাতের মধ্যে এগিয়ে এলো। ফিসফিস গলায় রাগ ঝাড়ল, বীর মরদের মুখখানা ভালো করি দেখতে পেলি হত। খপ করে দু'হাতে তার চুলের মুঠো ধরে মাথাটা নিজের মুখের সামনে টেনে নামালো। একটা চুমু খেয়েই ধাক্কা মেরে ঠেলে সরালো। —শেষ কথা হল ? এখন ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাও গে যাও।

এবারও কপালী বাবাই বিয়ে দেবেন। জংলি কালীকে প্রণাম করার জন্য এগিয়ে যেতেই রাধার ভিতর থেকে কেউ বলে উঠল, ভুল হল, খুব ভুল হল। মজাখানা টের পাবি !

রাধার দুপা মাটির সঙ্গে আটকে গেল। মুখে আর দু'চোখে রক্ত উঠতে লাগল। কালীর মুখের দিকে চেয়ে আছে। দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে রাধার। বিড়বিড় করে বলল, রাক্ষুসী ! আগে বললি না কেন ? ভুল পথে নিজে টেনে নিয়ে গিয়ে কত আর মজা দেখাবি? শেষে তো আমাকে বাঁচানোর দায়ে নিজে এক বুড়ীকে খেয়েছিস! সাধ্য থাকে তো এবার আমাকে খেয়ে মজা দেখার সাধ মেটা !

হঠাৎ ওর চোখ মুখের এই পরিবর্তন দেখে কপালী বাবা অবাক। মনোহরও। কপালী বাবা উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, হঠাৎ হল কি রে তোর, বিড়বিড় করে কি বলছিস ?

আরক্ত চোখে রাধা ঘুরে তার দিকে তাকালো। তারপর মনোহরের দিকে। শেষে আস্তে আস্তে আবার কালীর দিকেই ফিরল।

হাঁটু মুড়ে বসে মাটিতে মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করল। মনে মনে কেবল এক কথাই বার বার বলে গেল। তোর দায় তোর দায় তোর দায়। তুই সব করাচ্ছিস, সব করাচ্ছিস। তোর পরীক্ষায় আমি ভয় পাই না, ভয় দেখাস না, ভয় দেখাস না। রাখলে তুই রাখবি, খেলে তুই খাবি, দেখা কত মজা দেখাবি, তোর পা যেন না ছাড়ি না ছাড়ি, ছাড়লে তোর হার তোর হার তোর হার!

বিয়েটা নিঃশব্দে হয়ে গেল। কিন্তু দুদিন বাদে বউ ভাতের ঘটা দেখালো মনোহর পাইক। তার ঘরের সামনে মস্ত সামিয়ানা খাটিয়ে উৎসব। এ উৎসবে রাধাকে যারা স্নেহ করে, ভালবাসে তাদের কেউ নেই। সকলেই মনোহরের ইয়ারবকশী আর তার ব্যবসার খাতিরের লোক। এদের মধ্যে নিতাই স্যাকরাও আছে। রাধার প্রথম বিয়ের পর থেকেই মনোহরের তার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব।

—এই উৎসবে আরো একজন অতিথির পদার্পণ ঘটতে উপস্থিত সকলে মহাব্যস্ত। মনোহর আর তার সাঙ্গপাঙ্গোরা তাকে কোথা বসাবে, কত ভাবে আপ্যায়ন করবে ভেবে পায় না। রাধা সহজে ভোলে না, দেখামাত্র চিনল। এ-দিকের সমস্ত অঞ্চলের নামজাদা জোতদার শ্রীনাথ পোদ্দার—লক্ষ্মীকান্তপুরে যার নিবাস। আজ আর হাঁটুর নিচে কাপড় তোলা নয়, খুব সাজগোজ করে এসেছে। হাসি হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়ালো, বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখল, তার-পর মন্তব্য করল, বছর পাঁচ ছয় আগেও একবার দেখেছিলাম, এখন তার থেকেও পাঁচ-ছ'গুণ খাসা দেখতে হয়েছে, তোর বিবেচনা আছে দেখছি রে মনা।

মনা অর্থাৎ মনোহর তাব পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ঘটা করে প্রণাম ঠুকল একটা। আহ্লাদে গদগদ, আপনি হলেন গে আমার গার্জেন, আপনার প্রশংসার লাখো টাকা দাম মানি।

শ্রীনাথ পোদ্দার হাতের গয়নার বাক্স খুলে সরু একটা সোনার চেন হার বার করল। মনোহরকে বলল, নে তুই পরিয়ে দে।

জোরালো আপত্তি তুলে মনোহর বলল, বাঃ, আমি কেন,

আপনার আশীর্ব্বাদ আপনি নিজে হাতে পরিয়ে দিন ছিনাথদা, এমন ভাগ্যি আর কি আমাদের হবে!

মোসায়েবরা হৈ-হৈ করে উঠল, এমন ভাগ্যি থেকে বঞ্চিত করবেন না—আপনি নিজে পরিয়ে দিন—নিজে পরিয়ে দিন।

—ছাখো ছোঁড়াদের কাণ্ড! শ্রীনাথ হাসিমুখে হার নিয়ে এগিয়ে এলো। রাধা মাথা নোয়াতে নিজের হাতেই হার পরালো। সকলে হাততালি দিয়ে উঠল। মনোহর চেঁচিয়ে বউকে বলল, লুটিয়ে পেন্নাম কর, তোর সামনে কে দাঁড়িয়ে জানিস না!

ওই হার, সেই সঙ্গে হাতের স্পর্শ মুহূর্তের মধ্যে জল-বিছুটির মতো চিড়বিড় করে উঠল। রাধা সোজা তাকালো। তারপর দু'হাত জোড় করে মাথা নুইয়ে প্রণাম সারল। মনোহর জোরেই ধমকে উঠল, এটা কি রকম গড় করা হল—তোকে কি বললাম?

রাধার ঠাণ্ডা দু'চোখ মনোহরের দিকে ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথ পোদ্দারও একেই খেঁকিয়ে উঠল, ছাখ মনা, তুই একটা গাধা, আজকের দিনে বউয়ের মর্যাদাখানা কি এ ধারণাটুকুও নেই! ধমক খেয়ে রাধা আস্তে আস্তে তার পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, শ্রীনাথ ঝুঁকে সেই হাতটা ধরে ফেলে বলল, থাক, ওইটুকুতেই যথেষ্ট হয়েছে। হাতটা হাতে ধরাই থাকল, চাউনি বুকের দিকে সামান্য নেমে আবার মুখের ওপর স্থির হয়ে উঠল। রাধা চেয়ে আছে, চোখে চোখ। ছদ্ম আক্ষেপের সুরে শ্রীনাথ বলল, তিন ডাকাতের হাত থেকে বেরিয়ে এবারে আরো একটা বড় ডাকাতের হাতে পড়লি রে—!

হাসির হুল্লোড়। এমন রসিকতার কথা আর যেন হয় না। এই লোকের হাতের মধ্যে রাধার হাতটা জ্বলছে, হারের স্পর্শে গলায় ছ্যাকা লাগছে। কথাগুলো গলানো সিসের মতো কানে ঢুকেছে। —ভিতর থেকে ডাক শুনেছিল, ভুল হল, মজা টের পাবি। এই মুহূর্তে মনে হল, এই একজনও ওর জীবনে বিপদের মানুষ। এ সংকেত যেন তার চোখে মুখে লেখা।

রাত্রি। এটা রাধার দ্বিতীয় বাসর। প্রথম বাসরে হারাণ

মণ্ডল তার যৌবনের আঙিনায় ভিখিরির মতো এসে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় বাসরের এই একজন ভোগের সদর্প উল্লাসে অধিকার বিস্তার করেছে। এই ভোগ প্রায় হিংস্র, প্রায় নিষ্ঠুর। না, রাধা দোসর হতে পারেনি।

পরদিনই রাধা নিজের ঘরে চলে এসেছে। এ-রকমই কথা ছিল। নিজের বাড়িতে মনোহর দিনে তার ব্যবসা আর লোকজন নিয়ে থাকবে, রাতের বাস এখানে। তার ব্যবসা বা তার লোকজন সম্পর্কে রাধার কোন ধারণা নেই। মাসখানেকের মধ্যে ধারণা করার সুযোগও হয়নি। কিন্তু সন্ধ্যায় বা রাতে এলে মদের গন্ধ নাকে এসেছে তৃতীয় দিনে সেটা প্রথম পেয়েছে। জিগ্যেস করেছে, তুমি কিছু খেয়েটেয়ে এসেছ নাকি?

মনোহর প্রথমে অবাক একটু। পরে বুঝেও ঢাকতে চেষ্টা করেনি। বলেছে, তোর খাতিরে মদ তো খেয়েছি সেই দুকুরে, তা-ও গন্ধ পাচ্ছিস? তারপরেই হ্যা-হ্যা হাসি, রাতে মদ খেলে তোকে সেভাবে পেতে পারি না, অঙ্গপেত্যঙ্গ ছাড়াছাড়া লাগে, এ জন্যেই দিনে খাচ্ছি, তা কি হয়েছে, তোর কপালী বাবা মওকা পেলে তো দিনেও চালায়, রাত্তিরেও চালায়।

—বাবা এখন রাধার কপালী বাবা হয়েছে। আর দিনে মদ গেলার কারণ, রাতে খেলে ভোগে ঘাটতি পড়ে। একটা মাস ধরে এই ভোগের হিংস্র নিষ্ঠুর উল্লাস দেখে যাচ্ছে রাধা। একদিন কেবল বলেছিল, তুমি আমাকে বে-করা বউ ভাবো না আর কেউ ভাবো—এ কেমনধারা লম্পটের মতো আনন্দ করা তোমার?

জবাবে দাঁত বার করে হেসেছে, যন্ত্রণা স্বীকারই করেছে, মরদ কেমন টের পাচ্ছে। পরে বলেছে, অবাক করলি যে, লম্পট পছন্দ নয় তোর। আরো অর্থপূর্ণ আরো কুৎসিত হাসি। তারপর চাউনি একটু একটু করে ক্রুর হয়ে উঠেছে। বলেছে, শ'য়ে শ'য়ে লাল পিঁপড়ে দিয়ে আমার গায়ের মাংস কুরে খাইয়েছিস, সে-যন্ত্রণা আমি ভুলে গেছি ভেবেছিস?

তপতপে মুখ করে রাধা বলেছে, সে-যন্ত্রণাও কিছু নয় বলে তো ঘরে বিষ মজুত রেখেছিলে!

আবার হি হি হাসি।—বিষ! তোর মতো মেয়ের জন্যি?—তা তোকে দেখাবার জন্যি ঘরে একটা শিশিতে গ্লুকোজের গুঁড়ো কিছু রেখেছিলাম বটে, কিন্তু দেখানোরও দরকার হলনি, শুনেই ঢলে পড়লি!

ঘৃণায় রাগে রাধা স্তব্ধ।—ভুলের বহর তো বুঝতেই পারছে, এরপর কি মজা টের পেতে বাকি?

ওর দিকে চেয়ে উৎকট আনন্দে মনোহর বুক ফুলিয়ে বলল, নিজের বোনাইয়ের সঙ্গে বে তে বসলি যখন, নিতাইয়ের দোকানে বসে বুক ঠুকে পিতিজ্ঞে করেছিলাম তোকে আমি কব্জায় আনব, না যদি পারি আমাকে যেন বে-জন্মার ছেলে বলে—হারাণ মণ্ডল ভালোয় ভালোয় নিজে না মরলে ডাকাত কাকে বলে দেখতে পেতিস—কোথায় তোকে নিয়ে উধাও হতাম কাক-পক্ষী টের পেত না। এই এক বছর ধরে আমি কোন্ জোরের মানুষ তোর ধারণা নেই—আমার মুরুব্বিকে দেখেছিস কিন্তু জানিস না।

রাধা সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছে এক বছর ধরে কে তার মুরুব্বি। লক্ষ্মীকান্তপুরের শ্রীনাথ পোদ্দার।

কপালী বাবা হিমালয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মনে মনে অনেক বছর ধরেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এবারে চট করেই সুযোগ হয়ে গেল। মনোহর পাইক রাধার মারফৎ দরাজ হাতেই তাকে টাকা দিয়েছে। রাধার মুখ দেখে বাবার কিছু খটকা লেগে থাকবে, মনোহরের অগোচরে অনেকবারই ওকে জিগ্যেস করেছেন, কেমন বুঝছিস ছোঁড়াটাকে—বল্ না?

কঠিন গলায় রাধা একই জবাব দিয়েছে, তুমি এ নিয়ে মাথা ঘামিও না বাবা, তুমিও এ বিয়ে চেয়েছিলে বলে তোমাকে একটুও দুষব না—বোঝাপড়া যদি কিছু হয় তো মায়ের সঙ্গেই হবে।

কপালী বাবা কত মাস বাদে ফিরবেন সেটা তিনিও জানেন না।

জংলি কালীর পুজোর ভার মনোহরের সামনেই তিনি রাধাকে দিয়ে' গেছেন। রাতের এই সময়টুকুই কেবল রাধার শান্তি। সন্ধ্যার মধ্যে আসে, কিন্তু ঘণ্টা দুই আড়াইয়ের মধ্যে ফিরতেই হয়। এরই মধ্যে শাসানো হয়ে গেছে, আমার দরকারে সময় না পেলে তোমার পুজোটুজো বন্ধ করে দেব। রাধা মনে মনে জবাব দিয়েছে, তোমার মতো তিন পাষণ্ড এলেও ক্ষমতায় কুলোবে না, কিন্তু ঝগড়া এড়াবার জন্য জবাব দেয়নি। বিয়ের পর থেকে বিলাসীর আবার ঠাঁই বদল হয়েছে, এখানকার ডেরার দাওয়ায় পড়ে থাকে। ফল-ফুল সরঞ্জাম সে-ই গুছিয়ে রাখে রাধার একপ্রস্থ ধোয়া জামা-কাপড় এখন মায়ের ঘরেই দড়িতে ঝোলানো থাকে। পরা-কাপড় বদলে রাধা পুজোয় বসে। পুজোয় বসা মানে আকুল হয়ে মা-কে ডাকা।

মাস দুই আড়াইয়ের মধ্যেই মনোহরের রাধা-নেশা কমে এসেছে। মদের নেশায় মত্ত হয়ে ঘরে ফেরে। তখন বাদশাই মেজাজ। অকথ্য গালাগাল করে, কথায় কথায় মারতে আসে, বিয়ে না করেও ওর থেকে কত সুন্দরী মেয়ে ভোগে এসেছে বড়াই করে বলে। মদ গিলতে গিলতে মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে থাকে, সব কথাই জড়িয়ে যায়, রাতে ঘরে ঢোকারও সামর্থ্য থাকে না। দাওয়ায় যে চটাই বিছিয়ে বসে মদ গেলে, তার ওপরেই ঢলে পড়ে। সকালের রোদে গা পুড়তে থাকলে তবে ঘুম ভাঙে। তারপরেও গুম হয়ে বসে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর চান-টান করে খেয়ে বা না খেয়ে সেই যে বেরোয়, ফেরে রাত দশটা এগারোটায়। ঘরে ফিরে আবার দেদার মদ গেলে। কবে-কবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এ নেশা চলে সেটা রাধা মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারে। বাড়িতে মদ গেলার ব্যাপারে আপত্তি করতে সে শাসিয়েছে, ফের একথা বললে ইয়ারবকশীদের নিয়ে এখানে মদের আসর বসাবে। —তাদের কেউ কেউ দিনের বেলাতেও মাঝে-সাঝে দাদার অর্থাৎ মনোহরের খোঁজ নিতে আসে। দরকার পড়লে তো আসেই। তাদের কুৎসিত লুব্ধ চোখ রাধার গায়ের মাংস খুবলে নিতে চায়। রাধার রাগ আর ঘেন্না মনোহর অনায়াসে বুঝতে পারে।

চলে গেলে হি-হি করে হাসে। বলে বেশি দেমাক দেখাসনি, ওদের লেলিয়ে দিলে তোকে ছিঁড়ে খাবে। রাধা ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে। কারণ, মজা টের পাওয়ার ব্যাপারে মা ওকে অনেক দূর টেনে নিয়ে যাবে এটা সে বুঝতে পারছে। মন বলছে, এ-তো সবে শুরু।

কিন্তু এরপর যে অশান্তির শুরু রাধা সেটা সহজে বরদাস্ত করতে পারল না। একদিন দেখা করতে গেল পিছনের চালাঘরটা মনোহর লোক লাগিয়ে পরিষ্কার করাচ্ছে। কি হবে জিগ্যেস করতে গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে, দরকার আছে।

দরকারটা তুদিনের মধ্যেই বোঝা গেছে। এরপর তু'চাকা লাগানো একটা ঠেলাও এসেছে ওই ঘরে। সন্ধ্যায় এক-একদিন লোক এসে ঠেলাটা নিয়ে যায়, আর রাতের অন্ধকারে ওতে বোঝাই করে কি সব আসে। চালের বস্তা হলে রাধা তক্ষুনি বুঝতে পারে। কিন্তু ঠেলা-নিয়ে বোঝাই ছোট বড় টিনের কৌটো আসে রাবারের থলে বোঝাই হয়ে কি-সব আসে, আবার এক-আধ দিনের মধ্যে রাতের অন্ধকারে পাচার হয়ে যায়।

সেই তুপুরে মনোহর খেতে বসেছে। তার আধ-হাতের মধ্যে রাধা গালে হাত দিয়ে উপুড় হয়ে বসে। দিনের বেলাতেই মদ গিলেছে। ভক ভক গন্ধ আসছে। রাধা জিগ্যেস করল, তোমার নিজের তুটো ঘর আর অত জায়গা খালি থাকতে পিছনের চালা ঘরে কি এনে রাখছ ?

মনোহর থমকে তাকালো। কঠিন গলায় জবাব দিল, তোর জানার দরকার নেই।

ঠাণ্ডা গলায় রাধা বলল, আমার ঘরে রাখতি হলে আমার জানার দরকার আছে।

খাওয়া থামিয়ে দিয়ে চেয়ে রইলো একটু। পরের মুহূর্তে রাধা বসা থেকে তিন হাত দূরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চোখে অন্ধকার দেখছে। গাল কান বেড়িয়ে সমস্ত শক্তি দিয়েই চড়টা মেরেছে। আস্তে আস্তে উঠে বসতে দাঁতে দাঁত ঘষে মনোহর বলল, তোর

সরকারের জবাব পেলি ?

রাধা স্থির চেয়ে রইলো খানিক। গালের একদিক তপতপে লাল, ফর্সা হলে রক্ত ফেটে পড়ছে মনে হত। বলল, তোমার এত সাহস ? থানার বড়বাবু আর তার বউ এখানে আসত তুমি খবর রাখো ? বড়বাবুকে খবর দেব তুমি কি জিনিস রাখো, এসে দেখে যেতে ?

পরের মুহূর্তে পৈশাচিক কাণ্ড। খাওয়া ফেলে উঠেছে। তারপর রাধাকে আবার মাটি নিতে হয়েছে। পাগলের মতো কিল চড় ঘুষি। সঙ্গে সঙ্গে হুংকার।—ভয় দেখাচ্ছিস তুই আমাকে, বড়বাবু দেখাচ্ছিস! জোঁকের মুখে নুন দেবার মতো তোর বড়বাবুর বাবা আছে আমার হাতে সে খপর রাখিস ? তার একটা কলমের আঁচড়ে তার চাকরি চলে যাবে—তাকে ডেকে আনবি বলে তড়পাচ্ছিস ?

রাধা মুখ বুজে অমানুষিক মার সহ্য করেছে। লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে নিজেই থামল। মদের নেশা ছুটে গেছে। খানিক বাদে জামা-প্যান্ট পরে বেরুনোর জন্য প্রস্তুত হল। রাধা মেঝেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। বার কয়েক আড়চোখে তাকে দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

খুব কষ্ট হলেও রাধা জংলি কালীর পুজোয় এসেছে। এক-দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে। মুখে কিছু বলছে না, মনে বলছে।—মজা টের পাওয়াচ্ছিস, না ? আমি তোরই মেয়ে···ঠিক আছে।

পুজো শেষ হবার আগেই, মানে মা-কে মন ভরে ডাকা শেষ হবার আগে বিলাসীর সঙ্গে আর একজনের গলা পেল। না, রাধার মন আর স্থির হবে না। উঠে পড়ল। ঘরের আড়ালে গিয়ে পুজোর বেশবাস বদলে বেরিয়ে এলো।

মনোহর টর্চ হাতে পাশে পাশে চলেছে। মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দিচ্ছে। বলল, আন্ধারে কিছুতে একটা টর্চ হাতে না নিয়ে বেরুবি না, তোর বড় গোঁ।

রাধা নির্বাক।

একটু বাদে আবার আপোসের গলা।—সকালেই মদের ওপর

তুই দিলি তাতিয়ে—বিচ্ছিরি ব্যাপারটা হয়ে গেল, জানিস তো মদ খেলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।

রাধা পথ ভাঙছে। মুখ তুলে তাকাচ্ছেও না।

হাসির চেষ্টা একটু —ইয়ে, লক্ষ্মীকান্তপুরে ছিনাথদার ওখানে গেছলাম, তোর গায়ে হাত তুলেছি শুনে রাগের চোটে আমার হাত ভেঙে দিতে আসে আর কি। আরে ব্বাপ! তার এমন রাগ শিগ্‌গীর দেখিনি।—তোকে একদিন দেখতি আসবে বলেছে।

রাধার মুখে রা নেই।

ঘরে পৌঁছুলো। মনোহর এবার আপোসের শেষ তাসটা ছাড়ল। আচ্ছা, তোর অপছন্দের জিনিস আর ওই চালাঘরে থাকবে না।—কেবল চাল ডাল থাকলে তো আপত্তি নেই?

রাধা এর পরেও স্থির নির্বাক। তবে সোজা চোখে চোখ রেখেছে।

রাতে মদ খায়নি। কাছে এসে আদর করতে চেষ্টা করেছে। বলেছে, তুই সত্যি কি সুন্দর, আমি একটা পাষণ্ড।

রাধা মুখ খুলেছে।—আমার শরীলে যন্তন্ন' হচ্ছে, সরে যাও।

পরের দুদিন বা দু'রাতেও মদ খায়নি। তার সোহাগের নিষ্ঠুরতা রাধা মুখ বুজে সহ্য করেছে।

দিনের পর দিন এরপর ওই চালাঘরে মাঝেসাজে কেবল চালের বস্তা আসতে দেখেছে। অন্য কিছু না। বেশির ভাগ দিন ফাঁকা। চালাঘরে দু-চাকার ঠেলাটা পড়ে থাকে। রাধা বোঝে এ শুধু ভয়ে, আর কোনো কারণে নয়। তার গুরু শ্রীনাথ পোদ্দার এই লোকের থেকে ঢের চালাক।

তারপর আবার যে-কে সেই। দেদার মদ গেলে। সত্যি না মারলেও কথায় কথায় তেড়ে মারতে আসে। অশ্রাব্য গালাগাল দেয়। রাধা যতটা পারে চুপ করে থাকে। মদ গিললে কথা বলা ছেড়ে ধারে কাছেও ঘেঁষে না। মদে বেহুঁশ হয়ে বেশির ভাগ রাতই ওই লোক দাওয়ায় পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। দাওয়ার ওপর ঢালু টালির ছাদ থাকায় রোদ-জলেও ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।

কপালী বাবা ফিরেছেন আট মাস বাদে। রাধা নিজে কিছু না বললেও অশান্তি আঁচ করেছেন। বলেছেন, তোকে তো একটুও ভালো দেখছি না, ছোঁড়াটা বেয়াড়া হয়ে উঠেছে?

রাধা বলেছে, ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, তোমার মায়ের পুজো যেমন করছি তেমনি করে যেতে অনুমতি দাও।

—ঠিক আছে ঠিক আছে, আমার মা কি রকম, তোর নয় নাকি?

রাধা জবাব দেয়নি। এতদিন বাদে ফিরে কপালী বাবা মনোহরের সম্পর্কে যেটুকু খবর সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাতেই বিচলিত। শুধু মুখে নয়, পুজোর কাপড় জামা বদলাবার সময় রাধার গায়ে পিঠেও বিচ্ছিরি মারের দাগ দেখেছে বিলাসী তা-ও বলেছে। তিনি ফেরার পর মনোহর দেখা করতে আসেনি, পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। স্তম্ভিত হয়ে পরে তিনি রাধাকে বলেছেন, ছোঁড়াটার তো পাখা গজিয়েছে দেখছি—ও তো মরবে! আমি তোর কথা বলে ধমক লাগাতেই মুখের ওপর জবাব দিল, তোমার উপকার ছাড়া কখনো অপকার করিনি, আমার ব্যাপারে আর নাক গলাতে এসো না!

—সত্যি এসো না বাবা, কঠিন গলায় রাধা বলেছে, মায়ের হাতে ছেড়ে দাও, দেখি কোন্ পর্যন্ত টানে।

এত অশান্তি আর যন্ত্রণার মধ্যেও রাধা গান ছাড়েনি। আগের থেকে কম যদিও, তবু ডাক এলেই গাইতে যায়। গান যখন করে সব ভুলে যায়। দোতারাবাবু রুমা সেন বিন্দুবাসিনী দেবী এবং আরো কেউ কেউ নিয়মিত টাকা-কাপড় দ্যান। ঘরের বউ তার টাকার মুখাপেক্ষী নয়, মনোহর এ-ও বরদাস্ত করতে চায় না। প্রায়ই হুমকি দেয়, ভিক্ষে নিতে লজ্জা করে না, এরপর আমি তোর গানই বন্ধ করে দেব!

রাধা জংলি কালীর পুজো সেরে বা কোথাও থেকে গান গেয়ে রাতে যখন ফেরে, সময়ের বা টাকার হিসেব নেবার জন্য ইদানীং মনোহর কোনদিনই সজাগ থাকে না। তার নেশার মাত্রা অতিরিক্ত

বেড়ে চলেছে। টালির ছাদের নিচে দাওয়ার ওপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে থাকে। দাওয়া থেকে কেউ তাকে ঠেলে উঠোনে ফেলে দিলে টের পাবে না বোধহয়।

মানুষটাকে সামনে দেখা মাত্র রাধার বুকটা ধক্ করে উঠল। মন বলে উঠল, এবার বিপদের দিন এলো।

মনোহরের গুরু নামজাদা জোতদার লক্ষ্মীকান্তপুরের শ্রীনাথ পোদ্দার উঠোনে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। এমন ভাগ্যের জোয়ারে বিহ্বল মনোহর পাইক সটান উপুড় হয়ে শুয়ে তার জুতোয় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে গা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালো। ডেরার বাইরে থেকে শ্রীনাথের জনা ছয় জোয়ান বয়সের সঙ্গী উঁকি দিচ্ছে।

রাধা উঠোনের তারে শাড়ি মেলছিল, তাকে দেখে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেছে।

আনন্দে আত্মহারা মনোহর বলে উঠল, হাঁ করে আছিস কি, ছিনাথদাকে এরই মধ্যে ভুলে গেলি? পেন্নাম কর, পেন্নাম কর— আজ আমাদের ভাগ্যি সুয্যি কোন্ দিকে উঠেছেল—অ্যাঁ?

শ্রীনাথ পোদ্দারের ফর্সা মুখে টিপটিপ হাসি। হাসি-ছোঁয়া চাউনি রাধার মুখের ওপর। দেড়বছর আগে সেই বিয়ের সময় দেখেছিল। বধূবেশে তখনো বেশ ভালোই লেগেছিল। কিন্তু আটপৌরে বেশের এই রূপ যেন আবিষ্কারের জিনিস।

রাধা শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। চোখ দুটো একবার শুধু পরম সম্মানের অতিথির চোখের সঙ্গে মিলেছে। কাছে এসে প্রণাম করার জন্য ঝুঁকতে অতিপরিচিত আত্মজনের মতো শ্রীনাথ দু-হাতে তার দুই বাহু ধরে টেনে সোজা

করে দাঁড় করিয়ে দিল। বাহু ধরাই আছে, চপল নিবিষ্টতায় মুখখানা দেখল একটু। বলল, অত পেয়ারের ঘটা আমার ভালো লাগে না। মনোহরের দিকে ফিরল, তোর মিষ্টি বউয়ের গানের প্রশংসা আমি লক্ষ্মীকান্তপুরে বসেও শুনেছি—কিন্তু তোর মতো রাসকেলের হাতে পড়েও এরই মধ্যে আরো এত মিষ্টি হয়ে গেল কি করে!

রাধার বয়েস এখন সাতাশ শুরু হয়েছে। এত অশান্তি আর যন্ত্রণা সত্ত্বেও মা যেন আক্কেল দেবার জন্যেই ওর যৌবনে স্থির জোয়ার নামিয়ে রেখেছে—চলতে ফিরতে উছলে ওঠে।

দুই বাহুর চামড়া শাড়ি জামা সত্ত্বেও চিড়বিড় করছে। হাত দুটো এখনো নামেনি।

মুরুব্বির রসিকতার কথায় মনোহরের মুখে হাসি আর ধরে না। —চলো চলো, ভিতরে বসবে চলো, আজ এসে গেছ যখন সহজে ছাড়ছি না—খেয়ে যেতে হবে।

শ্রীনাথের হাসিতে স্নেহ ঝরল, আজ হঠাৎ এসে গেছি, ও-সব হাঙ্গামায় দরকার নেই, আর একদিন হবে'খন, সঙ্গে দু'জন লোক আছে—

ও-সব কোনো ওজর আমি শুনব না, যারা আছে তাদের ব্যবস্থা আমি যেভাবে পারি করছি, আমার বউ রান্নায়ও দ্রৌপদী এটা জেনে রাখো—

বাহুর অস্বস্তি ভুলে এবার রাধার চোখে মুখে অন্য সংকট। এই বেলা সাড়ে দশটায় মাছ দূরের কথা আনাজ পর্যন্ত যোগাড় করা যাবে কিনা সন্দেহ। এই লোক বলে কি!

অতিথির ঘনিষ্ঠ দু'চোখ আবার তার মুখের ওপর।—গাধাটার কথা শুনলে, এই অবেলায় এসে এখন আমি তোমাকে বাড়তি সাত-জনের হাঁড়ি ঠেলতে পাঠাব! বাহু থেকে হাত নামালো। বাইরের দিকে চেয়ে হাঁক দিল, এই বিশে, এদিকে আয়।

জোয়ান চেহারার একজন ছুটে এলো। সিল্কের পাঞ্জাবির পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে একটা একশ টাকার নোট তার

হাতে দিল।—আমাকে এখন এরা ছাড়বে না, তোরা তিনজন তিনজন করে জয়নগর থেকে খেয়ে আয়, এক ব্যাচ এলে অন্য ব্যাচ যাবে—

মাথা ঝাঁকিয়ে বিশে চলে গেল। এই ফাঁকে রাধা আস্তে আস্তে চুপা সরে এসেছে। শ্রীনাথ এগিয়ে গিয়ে অন্তরঙ্গজনের মতো এক হাতে আবার ওর কাঁধে বেষ্টন করে বলল, মনা ছাড়বে না আগেই জানতাম, চলো, কিন্তু শুধু খাওয়ালে চলবে না, গান শোনাতে হবে—

—নিশ্চয় শোনাবে, এসো এসো—। ব্যস্ততা মনোহরের।

রাধার সর্ব অঙ্গ অবশ অবশ লাগছে। আবার জ্বালাও, গায়ে পিঠে যেন বিছে দংশাচ্ছে।

জুতো জোড়া দাওয়ায় রেখেই ভিতরে ঢুকল। দেব-দেবীর সারি সারি ফোটো দেখে বলে উঠল, বা-ব্বা, কেউ যে বাকি নেই দেখছি!

হ্যা হ্যা করে হেসে মনোহর যোগ দিল, আর বলো কেন দাদা, ভক্তির ঠেলায় অস্থির হয়ে গেলাম—

সঙ্গে সঙ্গে অতিথি ধমকে উঠল, তুই থাম! চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যে এমন বউ পেয়েছিস!

—ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে—এবার ঠাণ্ডা হয়ে বোসো।

রাধার বরাবর মেঝেতে শুয়ে অভ্যেস, কিন্তু বিয়ের পরেই এ-ঘরে পালঙ্ক এসেছে। তার ওপর শৌখিন বেড-কভার পাতা। এ-ব্যবস্থা যার, মাসের মধ্যে ইদানিং প্রায় তিরিশ দিনই নেশার ঘোরে তার বাইরের দাওয়ার ওপর শয়ন।

টান করে পাতা বেড-কভারটা দু-তিনবার হাতের চাপড়ে ঝেড়ে মনোহর বলল, বোসো দাদা, বোসো—এমন ঘরে তোমাকে বসাতেও লজ্জা।

অতিথির ভ্রূকুটি।—ফের!

—আর বলব না, আর বলব না, রাধা দাদাকে আগে বেশ ভালো করে এক গেলাস নেবুর সরবত এনে দে—

এতক্ষণে রাধার মুক্তি। কপালে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। দাওয়ার ডান দিকে বিচ্ছিন্ন হেঁসেল। সেখানে এসে শাড়ির আঁচলে

মুখ মুছল।

তক্ষুনি হন্তদন্ত হয়ে সামনে মনোহর। ঝুঁকে মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, মাছ কি আছে ?

—চার পাঁচ টুকরো হবে।

—ওতেই হবে, আনাজ ?

—আছে।

—বেশ, তুই সরবত নিয়ে যা আমি চট করে মাংসটা আর কিছু মিষ্টি নিয়ে আসছি।

—এত বেলায় মাংস কোথায় পাবে ?

—কি বলিস ঠিক নেই, মোছলমানদের ঘরে ঘরে মুরগী, আর মাংস পাবনি ?

এবারে রাধা আস্তে আস্তে ঘাড় উঁচিয়ে তাকালো। —এই হেঁসেলে কখনো মুরগী ঢোকেনি—

—যতো সব ! যেমন অসহিষ্ণু তেমনি বিতৃষ্ণা।—যে মানুষ এসেছে তার জন্যি দরকার হলে গোরুর মাংস ঢুকবে ! বুঝলি ? ঠিক আছে, রাঁধব তো আমি আর খাওয়া হবে দাওয়ায় বসে—হেঁসেলের পিছনে কাঠ জ্বেলে যদি রাঁধি তাতে তো আর কিছু অশুদ্ধ হবে না ! এখন সরবত নিয়ে তাড়াতাড়ি যা—একলা বসে আছেন, পরে তোর ছুঁচিবাই আমি ছাড়াচ্ছি—

ছুটে বেরিয়ে গেল।

একটু বাদে শাড়ির আঁচল বেশ করে বুকে পিঠে জড়িয়ে রাধা সরবত নিয়ে ঢুকল। শ্রীনাথ খুশি মুখে হাত বাড়িয়ে সরবত নিল। হাতে আঙুলের স্পর্শ ইচ্ছাকৃত মনে হল। খাটের পাশটা দেখিয়ে বলল, বোস্—।

রাধা মৃদু সুরে বলল, রান্নাঘরে যাব—

—তোরা এত ব্যস্ত হলে আমি না খেয়েই চলে যাব—বোস্।

অগত্যা রাধা যতটা সম্ভব পালঙ্কের এ-দিক ঘেঁষে বসল। হাসি হাসি মুখে সরবত খাচ্ছে। চোখ দুটো রাধার মুখে বুকে সর্বাঙ্গে

বিঁধছে।

—মনা কোথা গেল?

—কি আনতে টানতে—

—ছাখ্ তো অসময়ে এসে কি হুজ্জোতে ফেললাম তোদের। ...গানে তো তোর বেশ নাম শুনি, তুই-একবার আমাদের লক্ষ্মীকান্ত-পুরেও গেছলি শুনলাম?

—অনেক আগে—

—কেবল ভক্তির গানই করিস বুঝি?

চুপ করে থাকাটুকুই জবাব। সোজা না তাকিয়েও দু'চোখের ওঠা-নামা টের পাচ্ছে।

—বিয়েতে তোকে হার দিয়েছিলাম, পরিস না?

—তোলা আছে।

—হাতেও তো কেবল লোহা ছাড়া কিছু দেখছি না, মনা টাকা তো আমার থেকে কম পায় না, গড়িয়ে দেয় না কেন? ওকে আমি আচ্ছা করে বকব—

এবারে রাধা স্পষ্ট করেই বলল, আমি গয়না পরি না।

চেয়ে রইলো। তারপর হেসে রসিকতা করল, গয়না না পরলেও তুই কম সুন্দর না, তবু মনার তো তোকে সাধ করে পরানো উচিত।

মনোহর ফিরতে রাধা উঠে গেল। রাধার রান্না মোটামুটি হয়েই গেছল। আর যেটুকু করল তাতে আধ-ঘণ্টাও লাগল না। মনোহর হেঁসেলের পিছনেই মুরগীর মাংস চড়িয়ে তাকে তাগিদ দিল, তুই ছিনাথদার কাছে গিয়ে বোস্—তুই একটা গান-টান শোনা, এদিক আমি দেখছি।

তবু ওর গড়িমসি ভাব দেখে মনোহরই এক-রকম ঠেলে নিয়ে এলো। —নে দাদাকে তুই একখানা গান শোনা।

রাধা সোজা তার দিকে তাকালো। —এখন গান আসবে না।

অবাধ্যতার জন্য আর মুখে সেই থেকে হাসি নেই লক্ষ্য করে মনোহর হাড়ে হাড়ে চটছিল। রাগ আর চাপতে না পেরে

খেঁকিয়ে উঠল, কার সামনে বলছিস জানিস না—এত দেমাক তোর!
গানের বাবা আসবে—

—মনোহর! চাপা গর্জনই করে উঠল শ্রীনাথ, ফের ওর সঙ্গে এভাবে কথা বলবি তো আমার হাতে থাপ্পড় খাবি! রাধার দিকে চেয়ে খুব কোমল গলায় বলল, এত দূর থেকে এলাম, একটা গানও হবে না? খুব কষ্ট হলে অবশ্য থাক—

রাধার চোখে জড়তা নেই, লোকটার দিকে সোজা তাকালো। তারপর ঘরের কোণের কাপড়ে ঢাকা হারমোনিয়ামটার দিকে। বুঝে নিয়ে মনোহর ব্যস্ত হয়ে হারমোনিয়ামটা তুলে খাটের ওপর রাখতে গেল।

—ওখানে নয়।

দু'হাতে হারমোনিয়াম নিয়ে মনোহর দাঁড়িয়ে গেল। কোণ থেকে গোটানো মাদুরটা এনে রাধা মেঝেতে পাতলো। মনোহর হার-মোনিয়াম রাখতে পিছনে পা মুড়ে রাধা নিজের ঢঙে বসল। যা মনে এলো সেটা ফকির সাহেবের শেখানো গান।

'রাম-রহিম না জুদা করো, দিল্‌কো সাচ্চা রাখো জী,
হাঁ-জী হাঁ-জী করতে রহো, দুনিয়াদারি দেখো জী।
যব য্যায়সা তব ত্যায়সা হোয়ে সদা মগন্‌মে রহেনা জী,
মাটিমে ইয়া বদন্‌ বনি হ্যায় ইযাদ সদা রাখ্‌না জী।
তব্‌ যব সেকো ফরক্‌ রহো ভাই,
যিস যিস্‌ কামমে মানা জী,
ক্যা জানে কব দম্‌ ছুটেগা, উসকো নেঁহি ঠিকানাজী।'

সমঝদার শ্রোতার আড়ালে দুটো হাঙরের চোখ তার মুখে বুকে ওঠা-নামা করছে। রাধা এক-একবার সোজা তাকিয়ে দেখছে, চোখে চোখ রেখেই শেষ করল। তারপর উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে মনোহরের আরক্ত চক্ষু। আরো গাইবার জন্য ধমকে উঠতে যাচ্ছিল, হাত তুলে শ্রীনাথ তাকেই থামালো। —আবার কেন, এই একটাই হজম হয়েছে? গানের ভিতর দিয়েও কি উপদেশখানা ঝাড়ল মগজে

ঢুকেছে? হাসি-মাখা চাউনি রাধার দিকে, বলল, দু-কান ভরে গেল, এমন নিটোল মিষ্টি গলা কমই শুনেছি।

খেয়ে দেয়ে আধ-ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করে মানী অতিথি চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মারমুখো মূর্তি মনোহরের, এমন একটা লোক সেধে ঘরে এলো, আমার সব ভবিষ্যত ওর হাতে—আর তুই কিনা সবক্ষণ বোবা হয়ে থাকলি! ছ'ছটা বডি-গার্ড নিয়ে ঘোরে, সক্কলের কাছে লুকনো অস্ত্র থাকে, বাড়ি পর্যন্ত প্লেন ড্রেসের পুলিশের লোক পাহারা দেয়, আর তুই কিনা তার সঙ্গে হেঁজি-পেঁজি লোকের মতো ব্যাভার করলি?

রাধা তার দিকে অপলক চেয়ে রইলো খানিক। তারপর বলল, ও-জন্য চিন্তা রেখোনি, যতটা আশা করেছিলে তোমার মানী অতিথি তার থেকে ঢের বেশি মুগ্ধ হয়ে এখেন থেকে বেরিয়েছে।

মনোহর থমকালো একটু। কথাগুলো মগজে ঢুকতে একটু হেসে উঠেই আবার খেঁকিয়ে উঠল, রসের কথা তো কম জানিস না, ছিনাথদার সামনে মুখ সেলাই করে থাকলি কেন?

•

বর্ষা কাল। মাঝে মাঝে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। সেই বৃষ্টি মাথায় করে দোতারাবাবু অংশুমানের কোয়ার্টার্সএ এসে উপস্থিত। দুর্যোগে সন্ধ্যা না হতে রাত্তির। রিকশয় এসেছেন, গায়ে বর্ষাতি আর সঙ্গে ছাতাও আছে। ভেজেননি। তবু এ-সময়ে তাঁকে দেখে অংশুমান জিগ্যেস করলেন, কি ব্যাপার, এই জলের মধ্যে?

—এসে গেলাম রে ভাই, ক'দিন ধরে মনটা উতলা হয়ে আছে, ভাবলাম তোমার কানে কথাটা তুলে দিই। সুচারু দেবীকে বললেন, আগে এক কাপ চা দাও।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা আসতে দোতারাবাবু মন কেন উতলা সেটা একটু বিস্তৃত করেই বললেন।

—দেড় মাস যাবত রাধার ওপর ভয়ানক অত্যাচার শুরু হয়েছে। অত্যাচার করছে তার স্বামী মনোহর পাইক। ভীষণ মার-ধর করছে।

লক্ষ্মীকান্তপুরের নাম-করা জোতদার শ্রীনাথ পোদ্দারের রাধার ওপর চোখ পড়েছে। একদিন এসে দু-তিন ঘণ্টা থেকে রাধার গান শুনে খেয়ে দেয়ে গেছে। সাত দিন না যেতে শ্রীনাথ রাধাকে নিয়ে যাবার জন্য বার বার নেমন্তন্ন করেছে। তার কাছে মনোহরের টিকি বাঁধা, সে ওকে দিয়ে অনেক রকমের কাজ করায়, টাকাও দেয়। দোতারা-বাবুও যতটুকু জানেন, মনোহর লোকটা পাজির পা-ঝাড়া, বছর তেত্রিশ মাত্র বয়েস, নেশায় চুর হয়েথাকে। নিতাই সেকরা তার প্রাণের বন্ধু, রাধাকে বিয়ে করাব জন্য একসময় সে-ও ক্ষেপে উঠেছিল। মদ খেয়ে তার কাছে গলগল করে সব কথা বলে। দোতারাবাবুর বাজার সবকারের সঙ্গে আবার নিতাই সেকরার খাতির। রাধার বিপদ আঁচ করে সে-ই বাজার সরকারকে চুপিচুপি বলেছে দোতারাবাবুকে জানাতে, সে জানে বাবু রাধাকে খুব স্নেহ করে।—রাধা নিজের বিপদ বুঝেই বার বার গোঁ ধরে শ্রীনাথের নেমন্তন্ন বাতিল করছে, আর মনোহব ক্ষেপে গিয়ে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। নিতাই সেকরা নাকি বলেছে, বউকে এনে দেবার টোপ ফেলেও নাকি মনোহর পাইক তার কাছ থেকে থোকে থোকে টাকা লুটেছে, কিন্তু বউকে আনতে পারছে না বলে এখন তারও মেজাজ গরম। গত রাতেও নাকি নেশা করে মনোহর নিতাইয়ের কাছে বুক ঠুকে বলেছে, ও না যায় তো ওর আধমরা লাশ যাবে শ্রীনাথ পোদ্দারের কাছে, আরো বলেছে, তিন-তিনটে ডাকাতের হাত দিয়ে ঘুরে এসে এখন সতীপনা দেখাচ্ছে, শ্রীনাথের কাছ থেকে ছিবড়ে হয়ে ফিরে এলে আর যাদের লোভ আছে ওর ওপর তাদের কাউকেই বঞ্চিত করবে না—তবে ওকে পিঁপড়ে দিয়ে খাওয়ানোর পুরনো হিসেব মিটবে। কবে নাকি রাধা ওকে পিঁপড়ের ডাঁইয়ের ওপর শুইয়ে দিয়ে শেষ করে এনেছিল।

সুচারু দেবী আঁতকে উঠেছেন।—এ কি সব্বোনেশে লোক গো—এমন আবার হতে পারে নাকি? রাধার মুখে তো কখনো এতটুকু বিকার দেখিনি, তবে মেয়েটা অনেক দিন আসে না অবশ্য—কিন্তু সত্যি হলে কি হবে?

একটু ভেবে অংশুমান বললেন, নকশালদের হুমকি খেয়ে শ্রীনাথ পোদ্দার নিজেই তো এখন চুপসে আছে। নকশালদের ওপর অংশুমান তখন দারুণ ক্রুদ্ধ। ওদের হাঙ্গামার জন্যেই তাঁর বদলী প্রমোশন সব আটকে আছে। বললেন, তবে শ্রীনাথ পোদ্দারের এই দোষের কথা অনেক শোনা আছে, কিন্তু ওই নিতাই সেকরা আবার নিজের লোভে মনোহরকে ঘায়েল করতে চায় না তো?

দোতারাবাবু মাথা নাড়লেন, মনে হয় না, লোকটাও পাজি তবে ভীতু, কিছু সত্যি না হলে বাজার সরকারকে আমার কানে তোলার জন্য বলত না।

বৃষ্টি একটু ধরতে অংশুমান উঠলেন, চলুন, আগে রাধার সঙ্গে একবার দেখা করে আপনাকে বাড়িতে ছেড়ে আসছি।

জিপ থেকে নেমে মিনিট দুই জংলা পথ ভাঙলে কপালীবাবার ডেরা। উনি বাইরের দাওয়ায় বসেছিলেন। দোতারাবাবু চেনা লোক, সাদা পোশাক সত্ত্বেও থানার ও-সিকেও চিনলেন। প্রায় আট বছর আগে সেই একবার জিপে করে রাধাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেছলেন। ডাকলেন, রাধা তোর কাছে কারা এলেন দ্যাখ, লণ্ঠনটা নিয়ে আয়—

লণ্ঠন হাতে রাধা বেরিয়ে এলো। জঙ্গলের ডেরায় এ আর কতটুকু আলো, তবু চিনতে অসুবিধে হল না। ভালো করে দেখার জন্য দুজনেই একটু এগিয়ে এলেন, কিন্তু আবছা আলোয় এই ঠাণ্ডা গম্ভীর মুখ দেখে কতটুকু আর বুঝবেন। একটু ইতস্তত করে অংশুমান বললেন, তোর সঙ্গে দুই-একটা কথা ছিল—

রাধা চেয়ে আছে। কি কথা বোঝার চেষ্টা। বলল, বাবার সামনে সব কথাই হতে পারে, কিছু এনে পেতে দেব—বসবে?

—না ঠিক আছে। ইয়ে—তোর সম্পর্কে কি সব শুনছি, তোর স্বামী নাকি খুব অত্যাচার করছে?

—তোমাদের কে বললে?

অংশুমান দোতারাবাবুর দিকে তাকাতে তিনি বললেন, নিতাই সেকরা আমার বাজার সরকার শম্ভুকে বলেছে, তোকে ডেকে

পাঠালাম, এলি না, এখন বড়বাবুকে খোলাখুলি বল্ না কি হয়েছে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কপালী বাবা ধীর গম্ভীর মুখে সকলকে দেখছেন, রাধাকেও। অংশুমান বললেন, যা শুনলাম তার কিছু সত্যি হলেও বল্, থানায় নিয়ে গিয়ে দু'চারটে ঝাঁকুনি দিলেই ঠিক হয়ে যাবে—

রাধা তবু জবাব দিতে সময় নিল একটু। তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, শোনো বড়বাবু, তোমাদের কিছুই জেনে দরকার নাই, শুধু জানি রাখো যা হতেছে সেটা কেবল মায়ের সঙ্গে আমার মামলা, তোমাকে কাউকে ধরি নে যেতে হবে না, শাসাতে হবে না, মা শেষ পর্যন্ত কি করে আমি তাই দেখার অপেক্ষায় আছি, আমার জন্য তোমরা মনে কিছু ভাবনা রেখো না।

এবারে কপালী বাবা অধীর গলায় বলে উঠলেন, ভয়ংকর রকমের কিছু হয়ে যাচ্ছে আমিও বুঝতে পারছি, বিলাসীও বলছে—কিন্তু ওর কেবল এই এক কথা—এটা মায়ের সঙ্গে ওর মামলা কাউকে কিছু ভাবতে হবে না—আরে ভেবে ভেবে যে আমি অস্থির হয়ে গেলাম!

তার দিকে চেয়ে রাধা ওই এক কথাই বলল, ভেবে লাভ নেই, ভেব না।

কিন্তু সকলের অগোচরে সকলের কল্পনার বাইরে প্রায় প্রত্যহ রাতে ভীষণ কিছুই ঘটে যাচ্ছে। রাগে আর মত্ত নেশায় তার কিছু আভাস কেবল নিতাই সেকরা পেয়েছে।

যেটুকু পেয়েছে ঘটছে তার থেকে ঢের বেশি।

দেড় মাস আগের সেই দুপুরে শ্রীনাথ পোদ্দার ওই গান শুনে

খেয়েদেয়ে চলে যাবার দিন সাতেক বাদে রাতের দিকে মনোহর পাইক খোশমেজাজে ঘরে ফিরেছে। মদও গিলে আসেনি। বলেছে, ছিনাথদা দারুণ খুশি তোর ওপর, আবার আমার ওপর তেমনি রাগ—এমন সুন্দর বউটার অঙ্গে একটা গয়নার টুকরোও নেই কেন? আমি যত বলি রাধা গয়না পরতেই চায় না, শুনতেই চায় না। বলল, দেখি পরতে চায় কিনা, আমি পরাব। আজ বেস্পতিবার, এই রোববার তার বারুইপুরের বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন, দিন কয়েক থেকে আনন্দ করে আসব।

রাধা তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠেছে, তার লক্ষ্মীকান্তপুরের বাড়িতে নয় কেন—সেখানে তার বউ ছেলেমেয়ে আছে তাই আনন্দ করতে অসুবিধে হবে বলে?

মনোহর থমকেছে একটু। তারপরেই বিরক্ত।—তুই কি থেকে কি বুঝিস ঠিক নেই—আরে নিজের এলাকায় থাকলে দু'দণ্ড ফুরসত মেলে তার! দিন-রাত লোক আনা-গোনা ভ্যাজর ভ্যাজর লেগেই আছে, দুদিন ভালো করে বিশ্রাম নিতে হলেও ছিনাথদা ঘর ছেড়ে পালায়। বাজে রাগ করিসনি—এর মধ্যে আমি তোকে খান দুই ভালো শাড়ি আর জামাটামাও কিনে দেব।

এমনি একটা সময় আসছে রাধা জানতই, তবু রাগে ঘৃণায় বিবর্ণ। শুরুতেই প্রচণ্ড ঘা না বসালেই নয়। বলে উঠল, আমি কোথাও যাবনি তুমি চুলোয় যাও, এত নিচ এত হীন তুমি?

মনোহরের মাথায় রক্ত ওঠার মতো এ-ই যথেষ্ট। এগিয়ে এলো। গলা টিপে ধরল। সজোরে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিল। দম বন্ধ হয়ে রাধার দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম—যাবি না? ছিনাথদা ডেকেছে আর তুই যাবি না? আমি তার খাই পরি, সে আমাকে রাজার হালে রেখেছে—দুদিনের জন্য আদর করে ডেকেছে আর তুই যাবি না? মাটিতে আছড়ে ফেলল। কিল চড় লাথি। রাধা নিস্তেজ। এতেই টিট হয়েছে ধরে নিয়ে মনোহর নিশ্চিন্ত। মদ নিয়ে দাওয়ায় বসার আগে ট্রাঙ্ক খুলে তাকে এক পাঁজা একশ টাকার নোট

রাখতে দেখল রাধা। এত টাকা কোথা থেকে এসেছে কেন এসেছে বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগল না।

পরদিন। রাধা রোজই সন্ধ্যার আগে রাতের রান্না সেরে রাখে। সন্ধ্যার পর কপালী বাবার ওখানে যায়। রাধা হেঁসেলে। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। একটা বড় একটা ছোট মোড়ক হাতে হাসি হাসি মুখে মনোহর সেখানে এসে দাঁড়ালো। গত রাত থেকে এ পর্যন্ত এই প্রথম কথা।—কাল খামোখা এমন রাগিয়ে দিলি—ধর, দুখানা খুব সুন্দর শাড়ি এনেছি, জামা দুটোও দামী—তোর পছন্দ হবে।

রাধা ঘুরে তাকালো। উঠল। মোড়ক দুটো হাত থেকে নিল। হেঁসেলের জানালা দিয়ে ও দুটো জল-কাদার আঁস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার উনুনের কাছে বসল।

একটু পরেই অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হাতে নয়, চেলা-কাঠ তুলে এনে এক ঘায়ে পিঠের চামড়া দু ফাঁক করে দিয়েছে মনোহর। সেখানেই থামল না। চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে ওকে জল-কাদার উঠোনে ফেলে ঘুষি লাথি চড়। মুখে আঘাত করল না, জানে আঘাতে বিকৃত হলে শ্রীনাথ পোদ্দারের চোখের রঙ ছুটে যাবে। মারতে মারতে নিজেই হাঁপিয়ে উঠল, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে যাবে বলাতে পারল না। মারের সঙ্গে অশ্রাব্য সব কথা।—যাবি না? তিন ডাকাত তোকে খুবলে খেয়েছে, পেট হবার ভয়ে সাত তাড়াতাড়ি হাবড়া বোনাইয়ের সঙ্গে বে-তে বসেছিস, গান শেষ করেও বিন্দুবাসিনী আর রুমা সেনের বাড়ি থেকে বেরুতে তোর তিনপো ঘণ্টা এক ঘণ্টা দেরি হত কেন আমি বুঝি না—অতবড় বাড়ি থেকে এক তলায় নামলেই নিচিন্তি—ওই নিখিল রায় আর অজয় গুপ্তও তোকে ছেড়েছে বলতে চাস? আমাকে নিয়ে সাত-সাতটা মরদকে ঠাঁই দিয়েছিস, আর ছিনাথদার বেলাতেই তুই মস্ত সতী হয়ে গেলি? আমার হিল্লে হয়ে যাবে সেটা কিছু নয়?

রাত্রিতে দাওয়ায় মদ নিয়ে বসেছে। রাধা ঘরে। বিলাসী খবর

নিতে এসেছে রাধা পুজো করতে গেল না কেন। রাধা দেহটা দরজার সামনে হিঁচড়ে টেনে বলল, বাবাকেই পুজো করে নিতে বলো, শরীলটা ভালো না, বোলো কাল যাব

মদের নেশায় মনোহর তখন বসেও থাকতে পারছিল না, তবু চিৎকার আর গর্জন করে উঠেছে, খব-দ্দার! ব-ই-লে দিস রা-আধা আল-কো-না-দি-ন যাবে নি—গেলে ওর আ-মি জা-আ-ন্ নেব!

বিলাসী ভয়ে পালিয়েছে।

পরদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দফায় দফায় মারধর করেও রাধাকে হ্যাঁ যাবে বলাতে চেষ্টা করেছে। না পেরে বিকেলের দিকে তাকেই লক্ষ্মীকান্তপুর ছুটতে হয়েছে। আগামী কাল অন্তত বউকে নিয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতে পারবে না বুঝতে পেরেছে। শ্রীনাথ পোদ্দারকে যা-হোক বলে বুঝ দিতে হবে।

অত মার খেয়েও সেই রাতে রাধা কপালী বাবার ডেরায় গেছে। জংলি কালীর পুজো করেছে। কি হয়েছে দশবার করে জিগ্যেস করেও কপালী বাবা জবাব পাননি। কেবল এক কথা, আমার মা-কালীর সঙ্গে মামলা, জানতে চেও না।

রাতে ফিরে আবার মার। শ্রীনাথের কাছে ব্যঙ্গের চাবুক খেয়ে নিতাই সেকরার ডেরায় বসে প্রচুর মদ গিলে মনোহর ঘরে ফিরেছে। ওই চাবুক যে-কোনো সময় হিংস্র ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে মনোহর জানে। মত্ত অবস্থায় মারতে মারতে রাধাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে। সেই সঙ্গে গর্জন, কি দেখেছে ছিনাথদা তোর মধ্যে, তাই মেরে ফেলতি পারছি না, না হলে তোকে আমি খুন করে ভুঁয়ে পুঁতে ফেলতাম!

—দোতারাবাবুর সঙ্গে ও-সি অংশুমান ঘোষ এসে কপালী বাবার ডেরায় রাধার সঙ্গে দেখা করতে আসার আগে এই এক মাসের মধ্যে মনোহর আরো তিনবার রাধাকে শ্রীনাথ পোদ্দারের বারুইপুরের বাগানবাড়িতে নিয়ে যাবার দিন ঠিক করে তিনবারই ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবারের নৃশংস মার রাধা মুখ বুজে সহ্য করেছে, তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, তবু তার মুখ দিয়ে মনোহর 'যাবে' কথাটা বার করতে

পারেনি। ওই মার খেয়ে প্রত্যেক রাতেই রাধার বেদম জ্বর আসছে। কিন্তু সন্ধ্যার পর মাথায় কাপড় দিয়ে শাড়িতে সর্বাঙ্গ ভালো করে ঢাকাঢুকি দিয়ে জংলি কালীর পুজো করতে গেছে। সেখানে শাড়ি বদলাবার সময় বিলাসীকেও কাছে থাকতে দেয়নি। মারের দাগ দেখলে আর্তনাদ করে উঠবে মাঝে মাঝে পুজো শেষ করে আর ফিরতে পারে না ওই ঘরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কপালী বাবা বরাবরই দাওয়ায় শোন। বিলাসী দাওয়ার আর এক কোণে পড়ে থাকে। রাধা করে ফিরল করে ফিরল না মনোহর টেরও পায় না। বউকে বশে আনার তাড়নায় তার নেশা আরো দ্বিগুণ বেড়ে গেছে, এমন নেশার জের কাটতে বেলা আটটা ন'টা বেজে যায়।

এবারে শেষ বারের মতো দিন ঠিক করে রাত আটটা নাগাদ মনোহর ঘরে ফিরেছে বিকেল থেকে আকাশ কালীবর্ণ, মেঘ গজরাচ্ছে, বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। সন্ধ্যায় আরো বেড়েচে। বৃষ্টি একবার নেমে গেলে আর বেরুতে পারবে না, তাই রাধা সন্ধ্যায় গিয়ে খানিক আগে পুজো সেরে চলে এসেছে। ঘরের ঠাকুর দেবতার ছবিগুলোর সামনে বসেছিল। পিছন থেকে এসে মনোহর দু-হাতে চুলের মুঠি ধরে বসা থেকে রাধাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল, হিড হিড় করে চার-পাঁচ হাত তফাতে টেনে নিয়ে এলো।—খুব বেশি মদ খায়নি, টলছে না, নৃশংস মূর্তি।

হিসহিস করে বলল, এবারে তোর একদিন কি আমার একদিন, কাল তোকে নিয়ে যাব আমি ছিনাথদাকে শেষ কথা দিয়ে এসেছি, কাল ভোর-ভোর তোকে নিয়ে বারুইপুর যাব। আমি সঙ্গে থাকব, তবু তোকে নিয়ে যাবার জন্য ভোর রাতে ছিনাথ পোদ্দারের তিনজন বাছাই করা লোক আসবে—

কথার ফাঁকে রাধা দেখল তার বুক পকেটে এক থোকা একশ টাকার নোট উঁচিয়ে আছে।

—দেখছিস কি, ছিনাথদার সঙ্গে শেষ ফয়সলা করে এসেছি, টাকাও নিয়ে এসেছি। সকালে তুই মুখ বুজে সুড়সুড় করে না গেলে

যারা আসছে তারা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তারপর তারা তোর গায়ে হাত দেবে, আমিই সেই ব্যবস্থা করে এসেছি। সকালে না পারলে ওদের সাহায্যে রাতের আন্ধারে তোকে আমি নিয়ে যাবই হলপ করে এসেছি, এবার তোর বাপের সাধ্যি নেই আমাকে ঠেকায়।—যাবি কি যাবি না?

রাধা চেয়ে আছে।

প্রচণ্ড চড়ে মাথা ঘুরে খাটের কাছে মাটিতে পড়ল। মনোহর আবার দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল।—যাবি কি যাবি না?

—যাব—। যাব! যাব!

শেষের দুবার এত জোরে বলল যে হিংস্র মূর্তি মনোহরও থমকালো।

কিন্তু পরের মুহূর্তে রাধা নিজেই দিশেহারা। হ্যাঁ, নিজের কানে নিজের গলা স্পষ্ট শুনেছে! কিন্তু ও তো বলতে চায়নি! মেরে ফেললেও যাবে না এ সঙ্কল্প তো স্থিরই ছিল। তবু বলল কেন? কে বলালো? কে? কে? কে? উদভ্রান্তের মতো রাধা ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল।

মনোহরের চোখে মুখে চাপা উল্লাস। মারে মারে সব ধৈর্য আর গো নিঃশেষ ভেবেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কথার আর নড়চড় যেন না হয়, রাতে আমার সুটকেসে কিছু শাড়ি জামা গোছগাছ করে রাখবি, লোক তিনটে রাত থাকতে আসবে, আমার ঘুম না ভাঙলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিবি। উঠোনের দরজা খোলাই থাক—

ঘোরালো ধারালো দু'চোখ একবার মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে আলনার কাছে চলে গেল। ওটার পিছনে মাটির দেয়াল—তাতে রসদ মজুত থাকে, আস্ত বড় একটা মদের বোতল বার করে ওটা খুলে কাঁচাই গলায় ঢালল খানিকটা। বোতল নিয়ে হেঁসেলের দিকে গেল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে কি খেল সে-ই জানে। বোতল গেলাস আর জলের ঘটি নিয়ে দাওয়ায় বসল। দেড় মাস ধরে তার স্নায়ুর ওপর দিয়েও কম ধকল যায়নি। আজ সব ধুয়ে মুছে যাবে।

রাধার তখনো দিশেহারা মূর্তি। না, সে যাবে কক্ষনো বলতে

চায়নি, কক্ষনো না! কিন্তু নিজের কানে নিজের গলা শুনছে! কে—কে বলালো তাকে দিয়ে!

ঘণ্টা দেড়েক হবে হয়তো। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তেমনি ঝড়ো বাতাস। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, থেকে থেকে বজ্রপাত হচ্ছে।

ঘরে রাধা স্থাণুর মতো বসে। বিড়বিড় করে বলেই চলছে, কে বলালে—কে বলালে!

দাওয়ায় মনোহর পাইক বেহুঁশ ঘুমে। এত খেয়েছে যে মুখ দিয়ে গ্যাজা বেরুচ্ছে। জল ঝড়ের তাণ্ডবে তার নাসিকা গর্জন শোনা যাচ্ছে না। খালি বোতলটা বাতাসে হোক বা পায়ের ধাক্কায় হোক, দাওয়ায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঘটিটাও এক কোণে উপুড় হয়ে আছে।

—কে? কে বলালে? কে বলালে?

আরো আধঘণ্টা বাদে রাধা উঠল। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকটা মরার মতো পড়ে আছে। যত ঝড়-জলই হোক, সমস্ত রাত এভাবেই কাটবে। ঘর থেকে লণ্ঠনটা এনে দরজায় দাঁড়িয়েই মুখের কাছে ধরল। রাধা শিউরে উঠল। বীভৎস! এমন বীভৎস আর কখনো মনে হয়নি। রাধা লণ্ঠনটা আবার জায়গায় রাখল। শাড়িটা গাছকোমর করে শক্ত করে এঁটে নিল। ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ার এ মাথায় এসে উঠোনে নামল। মুষল বৃষ্টি গায়ে ছুঁচের মতো বিঁধতে থাকল। পেছনের চালাঘরের পাশ দিয়ে পুকুর ধারে এলো। জংলা পথ ধরে অন্ধকার দুর্যোগে কপালী বাবার ডেরার দিকে চলল। খালি পা পিছলে পিছলে যাচ্ছে, এটা ওটা পায়ে ফুটছে, ঝড়ের ঝাপটায় টাল খেয়ে পড়ছে, রাধার ভ্রূক্ষেপ নেই।

পৌঁছুলো। দাওয়ার এক কোণে বিলাসী কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে অনেক রাত পর্যন্ত কপালী বাবা মায়ের ধ্যানে বসেন। মন অস্থির হলে বেশি বসেন। ক'দিন ধরেই মন খুব অস্থির। আজও বসেছেন।

—বাবা!

কপালী বাবা বিষম চমকে ফিরলেন। আসন ছেড়ে দ্রুত কাছে

এলেন। —এত ঝড়ে জলে তুই। এঃ, ভিজে যে শেষ হয়ে গেছিস! এত রাতে—

কথা থেমে গেল। মুখের দিকে চেয়ে বিমূঢ়। রাধার দুচোখ ধক্-ধক্ করে জ্বলছে। এই মূর্তি এমন জ্বলন্ত চোখ কপালী বাবা আর দেখেননি।

দাওয়া থেকেই কালীর দিকে খানিক ওই চোখের আগুন ঠিকরলো। বিড়বিড় করে রাধা বলল, আজ মামলার শেষ রাত, আমার জামা-কাপড় এনে দাও, ভিজে কাপড়ে ঢুকব না।

কপালী বাবা হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে গিয়ে ওর কাপড় জামা গামছা এনে দিলেন। তারপর ঘরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে ভেজা শাড়ি জামা বদলে রাধা ভিতরে এলো। ভিজে চুলের বোঝা পিঠ ছড়ানো। মায়ের মূর্তির খুব কাছে এসে চেয়ে রইল খানিক। তেমনি আগুনের গোলার মতো চোখ।

মেঝেতেই বসল। দু'চোখ মায়ের মুখের পর অপলক।

কপালী বাবা দাওয়ায় চলে এলেন। চারদিকে গাছ-গাছালির দরুন জলের ছাঁট আসে না। বাতাসের তাণ্ডবে ওগুলোর শাঁ-শাঁ আর্তনাদ। রাধার ভেজা জামাকাপড় গামছা মেঝেতে পড়ে আছে। একে একে তুলে নিঙড়ে, টাঙানো দড়িতে ঝুলিয়ে দিলেন।

দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।—মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রাধা অস্ফুট স্বরে বলছে, কেন বলালি? কেন বলালি?

খানিক পায়চারি করে আবার এসে দাঁড়ালেন।

—কেন বলালি? কেন বলালি?

অনেকক্ষণ বাদে পা টিপে ঘরে এসে দাঁড়ালেন। শব্দ না করে চাটাইটা কোণ থেকে তুলে নিয়ে আবার বাইরে এলেন।

—কেন বলালি? কেন বলালি?

কপালী বাবা দাওয়ায় চাটাইটা পেতে বসলেন। চোখ বুজে তিনিও ধ্যানে বসতে চেষ্টা করলেন। অনেকক্ষণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু ধ্যানে মন বসলই না। চোখ তাকিয়ে ঝুঁকে ঘরের ভিতরে তাকালেন।

রাধা মেঝেতে ও-পাশ ফিরে মায়ের পায়ের সামনে ঘুমোচ্ছে। কপালী বাবা আস্তে আস্তে উঠলেন। হাতঘড়ি দেখলেন। রাত বারোটার কাছাকাছি। ঝড়ো বাতাস কমেছে কিন্তু প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। পায়ে পায়ে রাধার কাছে এসে দাঁড়ালেন। যে বাহু কোমরের ওপর তাতে বীভৎস দাগরা দাগরা দাগ। চামড়া ফেটেও গেছে। ঘাড়ের পাশেও আঘাতের চিহ্ন। নিষ্ফল আক্রোশে কপালী বাবা ফুঁসছেন। পিঠের অবস্থা দেখতে পেলে কি করতেন কে জানে!

এই রাতে এমনিতে আর ঘুম আসবে না। দেয়ালের খোপ থেকে ছোট বোতলটা আর নিঃশব্দে এক গেলাস জল গাড়িয়ে নিয়ে আবার বাইরে এসে বসলেন।

ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙলো। বিলাসী ঠেলছে। দাওয়ার সামনে দুজন লোক দাঁড়িয়ে, তাদের চোখ খুব স্বাভাবিক নয়। উঠে চোখ মুছতে মুছতে কপালী বাবা ঘড়ি দেখলেন। সকাল সাতটা বাজে। বৃষ্টি পড়ছে না, কিন্তু আকাশ মেঘলা বলেই মনে হচ্ছে খুব সকাল।

লোক দুটো উত্তেজিত মুখে যে-খবর শোনালো, কপালী বাবার সর্ব শরীর নিস্পন্দ, স্থির একেবারে।—সকালে জংলা পথে পাড়ার দুজন লোক হাটমুখে যাচ্ছিল রাধার ঘরের পিছনের পুকুরে একটা লাশ চোখে পড়তে চিৎকার করে লোকজন ডেকেছে। লাশের চারভাগের তিন ভাগ পুকুরে কাদাজলে, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত কেবল দেখা যাচ্ছে। ঘাড় কাত করা, তাই দেখেই চিনতে পারেনি, তাছাড়া মুখ জল-কাদায় ভরা। সাহস করে দেহ কেউ ছোঁয়নি, কিন্তু লোকজন এসে ভালো করে দেখেই চিনেছে লোকটা কে। মনোহর পাইক। তার ঘাড় দুটো আর কানের নিচে একটা আঘাতের চিহ্ন—ভারি ধারালো কিছু দিয়ে খুন করা হয়েছে। অত বৃষ্টি সত্ত্বেও গায়ের জামার ওপরের দিক রক্তে লাল। ...দুজন লোক সাইকেল নিয়ে থানায় খবর দিতে গেছে, আর রাধার ঘরে রাধাকে না পেয়ে এই দুজন এখানে এসেছে। রাধার উঠোনে ছোট একটা কুড়ুল পড়ে ছিল।

খানিক স্তব্ধ হয়ে থেকে কপালী বাবা ঝুঁকে ঘরের ভিতরে তাকালেন। রাধা অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। কপালী বাবা উঠে ঘরে এলেন। তপতপে মুখের দিকে তাকিয়ে কি-রকম খটকা লাগল। কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠলেন, তাঁর হাতে যেন তপ্ত ছেঁকা লাগল। ঘুমে নয়, জ্বরে বেহুঁশ।

বিলাসীকে কপালে জলপটি দিতে বলে কপালী বাবা লোক ছুটোর সঙ্গে রাধার ঘরের দিকে চললেন। অনেকেই সেদিকে ছুটছে। খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে।

রাধার স্বামী মনোহর পাইক খুন হয়েছে আর রাধাও ঘরে নেই শোনামাত্র দুজন সাব-ইন্সপেক্টর আর জনাকয়েক কন্স্টেবল নিয়ে অংশুমান ভ্যানে করে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ি থেকে ডাক্তার বিজন চৌধুরীকেও তুলে নিলেন, তিনি মৃত ঘোষণা করলে বডি সরানো হবে।

জিপ থেকে নেমে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে সদলে সোজা পিছনের পুকুর ধারে এলেন। সেখানে তখন বহু লোক। তাদের ধমকে সরিয়ে পথ করতে হল। কি অবস্থায় লাশ পড়েছিল আগেই শুনেছেন। অংশুমান দেখলেন একটু। ডাক্তারকে ইশারা করতে তিনি দু মিনিটের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সারলেন। বডি জলকাদা থেকে টেনে তোলা হল। জলে ধুয়ে ক্ষত তিনটে আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করা হল। মনোহরের পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে টেরিকটের জামা। বুক পকেট উঁচু মনে হতে অংশুমান হাত ঢুকিয়ে জলে চুপসানো একতাড়া একশ টাকার নোট বার করলেন। এত ভেজা নোট গোনা সম্ভব নয়, তবু হাজার আড়াই তিন হতে পারে। তাহলে যে বা যারা ওকে খুন করেছে, টাকার লোভে করেনি।

ভিড়ের একদিক থেকে কপালী বাবা এগিয়ে এলেন।—পুলিশ সাহেব ওই নিতাই বলছে কাল সন্ধ্যায় মনোহরের পকেটে সে ওই নোটের পাঁজা দেখেছিল।

অংশুমান তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর দিকে তাকালেন।—রাধা কোথায়?

—আমার ঘরে।

—আপনার ঘরে কখন থেকে ?

—রাত তখন সাড়ে দশটা হবে, প্রচণ্ড জলঝড় হচ্ছিল।

—সমস্ত রাত সে আপনার ওখানেই ছিল ?

—হ্যাঁ, সকালে এই খবরটা শুনে ওকে তুলতে গিয়ে দেখি জ্বরে বেহুঁশ।

অংশুমান ডাক্তারের দিকে তাকালেন একবার। তারপর এদিক ফিরে আবার জিগ্যেস করলেন, রাধা এর আগে আর কখনো রাতে আপনার ওখানে থেকেছে ?

—ইদানিং মাঝে মাঝে থাকত·· ওর ওপর অত্যাচারের মাত্রা খুব বেশি মাত্রায় বেড়ে গেছল মনে হয়।

—ঠিক আছে, নিতাইকে অপেক্ষা করতে বলুন, আপনিও থাকুন।

মনোহরের দেহ কন্‌স্টেবলরা ধরাধরি করে তুলে এনে ঘরের সামনের দাওয়ায় শুইয়ে দিল। অংশুমান সাব-ইন্সপেক্টর দুজনকে নিয়ে রাধার ঘর রান্নাঘর, পিছনের চালাঘর দেখলেন। রান্না জিনিসের সবই প্রায় পড়ে আছে, চালাঘরে দুচাকা লাগানো একটা ঠেলা শুধু পড়ে আছে। চেলা-কাঠের স্তূপ দাওয়ার ও-পাশে, সেখানে আর কোনো কুড়ুল নেই। কুড়ুল দাওয়ার সামনে উঠোনে পড়ে আছে। দাওয়ার ওপর শূন্য মদের বোতল আর ঘটি।

উঠোনে বা দাওয়ায় কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই। উঠোনে টেনে এনে খুন করা হয়ে থাকলে রাতের অত বৃষ্টিতে চিহ্ন থাকার কথাও নয়।

নিতাই সেকরার ডাক পড়ল। উত্তেজনার মাথায় বাবাকে ওই টাকার কথা বলে ফেলে সে এখন জেরার ভয়ে চুপসে আছে। অংশুমানের সামনে এসে জোড় হাতে নমস্কার ঠুকল।

—মনোহরের পকেটে কাল তুমি টাকা দেখেছ না সে তোমাকে দেখিয়েছে ?

—টাকা সে বরাবর বুকের পকেটে রাখত হুজুর, ওই পাতলা জামার ওপর দিয়েই টাকা দেখা যেত—

—ও কিসের টাকা মনে হয় তোমার ?

—জানি না হুজুর, ও ছিনাথ পোদ্দারের অনেক রকম কাজ করত, মোটা মোটা টাকাও পেত।

—সে কাল কখন তোমার ওখানে গেছল ?

—সাঁঝের মুখে।

—কতক্ষণ ছিল ?

—এক ঘণ্টাটাক হবে।

—কেন গেছল ?

ইতস্তত করতে লাগল।

—কেন গেছল ? কঠিন গলা।

—আজ্ঞে হুজুর আমাকে দোস্ত ভাবত, গলা ভেজাতে মাঝে মাঝে আসত।

—একটি বাজে কথা বলবে না, তোমার সঙ্গে কি কথা হয়েছে সব ঠিক ঠিক বলো।

—আজ্ঞে হুজুব, বলেছেল ছিনাথ পোদ্দারের কাছ থেকে আসছে. রাধা তিন-চার বার তার নেমন্তন্ন বরবাদ করেছে বলে মনোহরের মেজাজ খুব বিগড়েছেল, বলেছেল, এবার ওর লাশ গেলেও যাবে—ছিনাথদার বাছাই করা তিনজন লোক ভোর রাতে ওদের নেতে আসবে, তখনো যদি রাধা বাদ সাধে তাহলে অন্য ব্যবস্থা হবে।

—এসব কথা সে তোমাকে বলতে গেল কেন ?

নিতাই সেকরা থতমত খেল একটু। —আজ্ঞে হুজুর ও জিনিস পেটে পড়লেই ও গলগল করে কথা বলত—আর একটু চেষ্টা করলেই ওর ভেতর থেকে সব কথা টানি বার করা যেত।

—তাহলে তুমি বলতে চাও, ভোর রাতে যাদের আসার কথা ছিল রাধাকে ঘরে না পেয়ে তারাই মনোহরকে খুন করে পুকুর ধারে ফেলে রেখে গেছে ?

নিতাই আবার দু'হাত জোড় করে ফেলল, আমি কি-ছু বলতে চাই না হুজুর—কিছুটি না।

সেখান থেকে ভ্যানে কপালী বাবার ডেরায় চললেন। কপালী বাবাকেও তুলে নেওয়া হয়েছে। অংশুমান তাঁকে কেবল জিগ্যেস করলেন, রাধা তাহলে এখন পর্যন্ত কিছু জানে না?

বিলাসীকে ওর কাছে রেখে এসেছি, সে শুনেছে—এতক্ষণে বলেছে কিনা জানি না।

অংশুমান ভাবছেন, কোনো একজনের পক্ষে এতবড় মানুষটাকে খুন করে পুকুর ধারে টেনে এনে ফেলা সম্ভব নয়। একাধিক লোকই ছিল। অত ঝড় জলের দরুন জুতো বা পায়ের ছাপ ধুয়ে গেছে।

একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে কুড়ুলটা আনতে বলে সঙ্গে ডাক্তার চৌধুরীকে নিয়ে অংশুমান কপালী বাবার ডেরায় এলেন। বাবাও সঙ্গে। রাধা তখনো জ্বর-ঘুমে আচ্ছন্ন। বিলাসী তখনো জলপটি লাগিয়ে হাত-পাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করছে। লোকজনের সঙ্গে বাবাকে দেখে ও পাখা হাতে নিয়েই ছুটে এলো।—মেয়েটাকে মেরে মেরে আধ-মরা করেছে গো বাবা, দুই হাতে আর ঘাড়ে কোমরে মারের দাগ দেখে সন্দ হতে আমি বেলাউস টানি তুলি পিঠ দেখলাম, দেখে যাও কি অবস্থা।

পায়ের জুতো খুলে সকলে ঘরে ঢুকলেন। রাধা ও-পাশ ফিরে অচেতনের মতো শোয়া। বিলাসী প্রথম একদিকের বাহুর আর ঘাড়ের দাগ দেখালো। তারপর সন্তর্পণে ঢিলে ব্লাউসটা অনেকটাই টেনে তুলে পিঠ দেখালো। বিজন ডাক্তার আঁতকে উঠলেন, সর্বনাশ এতো টিটেনাস হয়ে যেতে পারে।

কপালী বাবা রাগের চোটে হুংকার দিয়ে উঠলেন, মনোহরের এ-দশা যে করেছে আমি তাকে আশীর্বাদ করছি—আশীর্বাদ করছি।

অংশুমান চাপা ধমক লাগালেন, থামুন।

অস্ফুট একটু যন্ত্রণার শব্দ করে রাধা আস্তে আস্তে চিত হয়ে শুলো। কিছু অনুভব করল কিনা সে-ই জানে। চোখ মেলে তাকালো। রক্তবর্ণ চোখ, কিন্তু ঘরের লোক দেখে ফ্যালফেলে চাউনি। নিজের অগোচরে বুকের কাপড় টেনে দিল। আস্তে আস্তে

উঠে বসে শাড়ির আঁচলটা পিঠ বেড়িয়ে জড়িয়ে নিল।

বিজন ডাক্তার এগিয়ে এসে কপালে হাত দিয়েই ভুরু কোঁচকালেন। ব্যাগ খুলে থার্মোমিটার লাগিয়ে মুখে দিলেন। রাধা সকলকে দেখছে, তখনো আত্মস্থ নয়। থার্মোমিটার মুখেই মুখ উঁচিয়ে একবার জংলি কালীকে দেখে নিল। ও কোথায় এতক্ষণে স্পষ্ট হল যেন।

জ্বর মুখে একশ পাঁচের কাছে। ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করে ব্যাগ খুলে তখনকার মতো তুটো বড়ি শুধু খাওয়াতে পারলেন। একটা প্রেসক্রপশন লিখে বাবার হাতে দিয়ে বললেন, এ ওষুধগুলো আনিয়ে এই-এইভাবে খাওয়াতে থাকুন, আমি বিকেলে এসে আবার দেখে যাব এখন নাড়াচড়া চলবে না।

রাধা স্থির চোখে সকলকে দেখছে। বলল, অমন জ্বর প্রায় রোজই হতেছে, ভেবনি—তোমরা এখেনে কেন? লাল তুচোখ বড়বাবুর মুখের ওপর ঘুরল।

রাধার শরীরের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন অংশুমান, তবু সুযোগ পেলে পুলিশের কর্তব্য আগে। জিগ্যেস করলেন, তুই অত রাতে ঝড়-জল মাথায় করে এখেনে এসেছিলি কেন?

চোখে চোখ রেখে রাধা জবাব দিল, মা-কে শেষ দেখা দেখি যেতে এয়েছিলাম।

—শেষ দেখা কেন?

তেমনি চেয়ে থেকে রাধা থেমে থেমে জবাব দিল, খুব ভোর ভোর ছিনাথ পোদ্দারের তিনজন লোক আসি আমাকে তার বারুইপুর বাগানবাড়িতে নে যাবার কথা ছেল, সেখেন থেকে ফিরে আর মায়ের মুখ দেখা হত না—

বক্তব্য বুঝলেন অংশুমান। —তিনজন লোক আসার কথা ছিল কেন, মনোহরই তো নিয়ে যেতে পারত?

—এবারে না গেলে তারা আমাকে রাতের অন্ধকারে মুখ বাঁধি নে যেত।

—তার মানে মনোহর আগেও তোকে অনেকবার নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে?

—দেড় মাস ধরে—।

—এবারে তুই যেতে রাজি হয়েছিলি?

—হাঁ, যাব বলেছিলাম।

—অমন ঝড় জলে তোকে বেরুতে দেখে মনোহর কিছু বলেনি?

—সে তখন এক বোতল মদ খেয়ে দাওয়ায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, ধাক্কা মেরে বিষ্টির মধ্যে উঠোনে ফেলে দিলেও ঘুম ভাঙত না।

অংশুমান ঘুরে সাব-ইন্সপেক্টরকে ইশারা করতে সে কুড়ুল হাতে সামনে এগিয়ে এলো। ওটা নিয়ে অংশুমান সামনে ধরলেন।—এটা তোদের কুড়ুল?

রাধা দেখল। আস্তে আস্তে তার মেরুদণ্ড সোজা হল। তারপর কেবল মাথা নাড়ল। তাদেরই।

—এটা কোথায় থাকে?

—চেলা-কাঠের ঢিপির ওপর।

দোতারাবাবুর মুখে যে-কারণে যে অত্যাচারের কথা শুনেছিলেন অংশুমান, তা মিলছে। আর নিতাই সেকরার আজকের কথাও মিলছে, শ্রীনাথ পোদ্দারের তিনজন লোক এসে রাধাকে নিতে আসার কথা ছিল, মনোহর একা নিজের ওপর ভরসা রাখতে পারেনি।

এবারে যা ঘটেছে অংশুমান আস্তে আস্তে রাধাকে বললেন। রাধা শোনার আগেও যেমন পরেও তেমনি। অত জ্বরের জন্য নয়, ওর সবেতে এই অবিচলিত ভাব দেখে অভ্যস্ত। তাঁর মুখের ওপর সোজা চোখ রেখেই শুনল।

অংশুমানের এবার ফেরার তাড়া। সামনে এখন গুরুতর কাজ। আবার আসবেন বলে উঠলেন, দু-পা এগিয়েও ফিরলেন। কপালী বাবাকে জিগ্যেস করলেন, দাওয়ার দড়িতে ভেজা শাড়ি জামা-টামা দেখছি—রাধার?

কপালী বাবা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জবাব দিলেন, মায়ের পুজো

আজকাল রাধাই করে, বলে ওর একপ্রস্থ ধোয়া জামা-কাপড় মায়ের ঘরেই থাকে। কাল রাতে ভিজে চুপসে আসতে এগুলো ছেড়ে ওগুলো পরেছিল।

রাধার ওখানে দুজন কনস্টেবলকে প্রহরায় রেখে অংশুমান থানায় ফিরলেন। বারুইপুর থানার ও. সির সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিলেন। তারপর প্রথমে মনোহরের বডি আনার ব্যবস্থা করে নিজে কিছু লোক নিয়ে ভ্যানে বারুইপুর ছুটলেন। আর ক'জনকে নির্দেশ দিয়ে লক্ষ্মীকান্তপুরে পাঠালেন।

ভ্যানে বারুইপুর খুব দূরের পথ নয়। লোকজনকে জিগ্যেস করে শ্রীনাথ পোদ্দারের বাগানবাড়ির হদিস পেতে সময় লাগল না। বারুইপুর থানার ও-সি সদলে আগেই পৌঁছে গেছে। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা অনেক জমি আর গাছপালার মাঝে বাগানবাড়ি। খুব কাছা-কাছির মধ্যে আর কোনো ঘরবাড়ি নেই।

সামনের মস্ত গেট দুটো হাঁ-করা খোলা। অংশুমান দল-বল সমেত ভ্যান নিয়ে ঢুকলেন। নেমে ডাকাডাকি করতেও বাড়ি থেকে কেউ সাড়া দিল না। মস্ত একতলা দালান, সারি সারি অনেক ঘর। একটা ঘরের কেবল সামনের দরজা খোলা। সদলে ঢুকলেন। আবার হাঁকডাক করলেন। কিন্তু বাড়িতে জনপ্রাণী আছে বলে মনে হল না। এ-ঘর ও-ঘর করে যে-ঘরে এলেন, দেখেই বোঝা গেল মালিকের বিলাস কক্ষ। মস্ত জোড়া খাট পাতা, কাচের আলমারিতে সারি সারি বিলিতি মদের বোতল। টেবিলের ওপরেও আধ-খাওয়া মদের বোতল, মদের গেলাস, খাবারের প্যাকেট। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিক আগে দেখে নিচ্ছিলেন অংশুমান, জোড়া পালঙ্কের দিকে চোখ পড়তে রঙিন বেড-কভারটা কেমন এলোমেলো মনে হল, বাচ্চা-ছেলেরা ধস্তাধস্তি করলে যেমন হয়।

এগিয়ে এলেন। তারপরেই চক্ষু স্থির। রঙিন বেড কভারে চাপচাপ রক্ত। ভালো করে নজর করে দেখেন গোলাপী কার্পেটেরও জায়গায় জায়গায় রক্তে ভেজা।

অংশুমান পকেট থেকে রিভলভার বার করলেন, সঙ্গের দুজনও। কনস্টেবলদেরও অস্ত্র তাদের হাতে। একসঙ্গে এ-ঘর ও-ঘর খোঁজ হতে লাগল। কোনো ঘরে কেউ নেই। পিছনের দিকের একটা ছোট মতো ঘরের শেকল তোলা। শিকল নামিয়ে দরজা খুলতেই মনে হল চাকর বাকরের ঘর হবে। পরের মুহূর্তে আবার চক্ষু কপালে সকলের।

খাটিয়ার ও-ধারে মেঝের ওপর একটা নয়, দু-দুটো গুলিবিদ্ধ দেহ। তাদের একজন নিঃসন্দেহে শ্রীনাথ পোদ্দার। তার কপালে আর গলায় গুলি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় জোয়ান গোছের লোকটা অচেনা। সে যুঝেছিল কিনা বলা যায় না, তার দেহে অনেকগুলো গুলির চিহ্ন।

—শ্রীনাথ পোদ্দারের রক্তে ভেজা জামার পকেটে একটা কাগজ উঁচিয়ে আছে। অংশুমান সন্তর্পণে সেটা টেনে নিয়ে ভাঁজ খুললেন।

অস্ত্রের বিশেষ রকমের ছাপ দেওয়া এক বিশেষ রকমের নক্সা কাটা কাগজ। এই ছাপ এই নক্সা খুব ভালোই চেনেন অংশুমান। নকশালদের এক বিশেষ গোষ্ঠীর খতমের চিহ্ন এটা। এই কাগজ পাঠিয়ে তারা হুমকি দেয়, আবার খতমের পর এই চিহ্ন রেখে গিয়ে তারা তাদের জয় ঘোষণা করে।

বাগান বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আর কিছুই চোখে পড়ল না। কোনো গাড়ি বা চাকার দাগের চিহ্নমাত্র নেই।

চারজন সশস্ত্র লোককে প্রহরায় রেখে অংশুমান অন্যদের নিয়ে সেখান থেকেই লক্ষ্মীকান্তপুরের দিকে ছুটলেন।

ভেবে চলেছেন। চেষ্টা করেও ঘটনা মেলাতে পারছেন না।...গাড়ি বা চাকার দাগ নেই যখন প্রবল ঝড়-জলের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটেছে। অবশ্য চাকার দাগ আছে কিনা জল শুকোলে বোঝা যেতে পারে, গেট থেকে ও-বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত এখনো জলে জলাকার।...অত ঝড় জলে অনেক কাছ থেকেও কারো গুলির শব্দ শুনতে পাবার কথা নয়। কিন্তু বাকি তিনটে লোক যাদের ভোর-ভোর রাধাকে নিতে আসার কথা ছিল, তারা গেল কোথায়? হতে পারে তাদের

লক্ষ্মীকান্তপুর থেকেই আসার কথা ছিল। তাহলে ধরে নিতে হয় শ্রীনাথ পোদ্দার কেবল একজনকে নিয়েই রাতে ওই বাগানবাড়িতে ছিল। কিন্তু অত চতুর আর সাবধানী লোকটার এত সাহস হবার কথা নয়।...অথচ বড়সড় মাত্র দুটোই খাবার প্যাকেট ছিল, আরো তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। টেবিলে মদের গেলাসও দুটোই ছিল।

শ্রীনাথ পোদ্দারের খুব বিশ্বস্ত চেলার সংখ্যা ষাট জনের ওপর। অংশুমান আগে যাদের পাঠিয়েছিলেন তারা জেরা করেও হদিস পায়নি কোন্ তিনজনের ভোর রাতে মনোহর পাইকের কাছে আসার কথা ছিল। এখান থেকে বেরুবার সময় সঙ্গে কারা ছিল সেই জেরা করতে গিয়ে তারা শুনেছে, শ্রীনাথ পোদ্দার এখন কলকাতায়, যাবার সময় তার অন্তরঙ্গ বন্ধু তার সর্বদার সঙ্গী সূর্যকান্ত হালদার ছিল, তিনজন বডি-গার্ড ছিল আর মনোহর পাইক ছিল। সকাল দশটা নাগাত তিনি নিজের বড় গাড়িতে সকলকে নিয়ে কলকাতা রওনা হয়েছেন। হ্যাঁ, তাঁর ড্রাইভার মুকুন্দই গাড়ি চালাচ্ছিল। শ্রীনাথ পোদ্দারের ওমুক বন্ধুর বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে কেবল সূর্যকান্ত ছাড়া আর সকলে বিকেলের মধ্যে লক্ষ্মীকান্তপুরে ফিরে এসেছে। কলকাতাতেই তাঁর তিন চার দিন থাকার কথা। হ্যাঁ, ওই গাড়িতে তাদের সঙ্গেই মনোহর পাইকও ছিল, সে জয়নগরে নেমে গেছল, তার সঙ্গে শ্রীনাথ পোদ্দারের কি কথা হয়েছে তারা জানে না।

অংশুমানের আরো জোরালো জেরার ফলও একই। আধ-বুড়ো মুকুন্দ ড্রাইভার বার বার দিব্যি কেটে বলল, এই-এই কজন আর মনোহর পাইককে নিয়ে সে বিকেলের মধ্যে ফিরে এসেছে। তাঁর জেরায় জানা গেল, সূর্যকান্ত হালদার সুপটু ড্রাইভার, অনেক সময়েই শ্রীনাথ পোদ্দার ড্রাইভারকে না নিয়ে তাকে নিতেন।

বলা বাহুল্য বাগানবাড়িতে নিহত দ্বিতীয় মানুষটার সঙ্গে সূর্যকান্ত হালদারের চেহারার বর্ণনা নিঃসংশয়ে মিলছে।

এরপর সেই দিনই অংশুমান কলকাতায় ছুটেছেন। কলকাতার শ্রীনাথ পোদ্দারের সেই বন্ধুর বাড়িতে হানা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য,

শ্রীনাথ তার গাড়িটা সেই দিনের মতো ধার নিয়ে গতকাল বিকেলের মধ্যেই চলে গেছে। না ড্রাইভার নেয়নি, তার সঙ্গী সূর্যকান্ত এক্স-পার্ট ড্রাইভার। কথা ছিল সূর্যকান্ত আজ বিকেলের মধ্যেই গাড়িটা ফেরত দিয়ে যাবে। এতক্ষণে গাড়িটা ফিরে আসা উচিত ছিল।...ঘটনা শুনে ভদ্রলোক হতবাক।

এবারে অংশুমানের হিসেবের অনেকটাই মিলছে। ...এটাই শ্রীনাথের বড় চাল ছিল। অন্যের গাড়িতে সূর্যকান্তকে নিয়ে সে সন্ধ্যার অন্ধকারে বারুইপুরের বাগানবাড়িতে আসবে। কেউ জানবে না কেউ সন্দেহ করবে না। পরদিন সকালে বা রাতে মনোহর আর তার তিনজন লোক রাধাকে নিয়ে আসবে। সাফ প্ল্যান।...লক্ষ্মী-কান্তপুরের ওই চেলাদের মধ্যেই তারা তিনজন ছিল, রাধাকে না পেয়ে তারা মনোহরকে ওভাবে খুন করে গেছে। তারা কারা, অংশুমানের তা নিয়ে আর খুব মাথা ব্যথা নেই। কারণ ওই একটা, একটা কেন শ্রীনাথ পোদ্দারের মৃত্যুর জন্যও তাঁর মনে কোনো আক্ষেপ নেই। তিনি কেবল আনুষ্ঠানিক কর্তব্য করে গেছেন। শ্রীনাথ পোদ্দারের বন্ধুর গাড়ির হদিস আজও মেলেনি।

কেস মোটামুটি ধামাচাপা। অংশুমান তাঁর বদলি আর প্রমো-শনের জন্য আবার জোর তদবির শুরু করেছেন। আট-আটটা বছর হতে চলল, একই জায়গায় একই পোস্টে পড়ে আছেন।

বড় কর্তাদের কাছে আশ্বাস পেয়েছেন, শিগগীরই তাঁর সম্পর্কে সুবিবেচনা করা হবে।

মাস দুই পরের এক সন্ধ্যায় রাধার মূর্তি দেখে অংশুমান তাঁর স্ত্রী সুচারু দেবী হতভম্ব। মাতন থেকে থানা পর্যন্ত আড়াই মাইল পথ

হেঁটে এসেছে। সাদা-মাটা বেশবাস পরিচ্ছন্ন নয়, আধ ময়লা শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে, মাথায় তেল চিরুনি না পড়ে এক পিঠ চুলে জট বেঁধে গেছে। এ-যেন সেই ঢলঢলে মিষ্টি মুখ কালো মেয়েটাই নয়। অনেক অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করার পরেও রাধার এমন মূর্তি দেখেননি অংশুমান। চোখে মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, চোখ দুটো অস্বাভাবিক ঝকঝক করছে।

সুচারু দেবী তাড়াতাড়ি তাকে ঘরে এনে বসালেন।—কি হয়েছে? এমন দেখাচ্ছে কেন তোকে?

রাধার উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি অংশুমানের মুখের ওপর। ঠোঁট দুটো আরো বেশি কাঁপছে। জবাব দিল, বড়বাবু দয়া না করলে আরো খারাপ দেখবে, রাধার শেষ দেখবে।

অংশুমান কাছে এগিয়ে এলেন, এসব কি বলছিস তুই,কি হয়েছে?

বসা থেকে উঠে রাধা মাটিতে আছাড় খেয়ে তাঁর দু-পা আঁকড়ে ধরল, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে বড়বাবু, এক তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

পা ছাড়িয়ে দু'হাতে ওকে টেনে তুললেন। সুচারু দেবী আবার ওকে ধরে জোর করে বসালেন। অংশুমানও অধীর, কি হয়েছে বলবি তো?

—মা আমার গান কেড়ে নেছে, তাকে ডাকতে পারি না, পুজো করতি পারি না, তার নাম শোনাতে পারি না। এমন হলে বাঁচব কি করে বড়বাবু?

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বিমূঢ়। অংশুমান জিগ্যেস করলেন, গান করতে পুজো করতে নাম করতে পারিস না কেন?

—গলায় কে কুলুপ আঁটে, আর ভেতর থেকে কে ধমকায়, কবুল করলি না কেন, কবুল করলি না কেন—এত ভয় বুকে নিয়ে, সত্যের মুখ চাপা দিয়ে গান হয় পুজো হয় নাম হয়? যা দূর হ—দূর হ!

অংশুমানই দিশেহারা।—কি কবুল করিসনি? কোন্ সত্যের মুখ চাপা দিলি?

চাউনি বদলাতে লাগল, টান টান হয়ে বসল। ঝকঝকে চোখ দুটো বড়বাবুর মুখের ওপর এঁটে বসতে লাগল। গলার স্বরও বদলে গেল।—ওই ঝড়জলের রাতে মনোহর পাইককে আমি খুন করেছি, আমিই তাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে মেরেছি।

সুচারু দেবীর গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে আসছিল, হাতে করে নিজের মুখ চাপা দিলেন। অংশুমান একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দরজা দুটো বন্ধ করে দিলেন। কাছে এসে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলেন খানিক।—তোর সঙ্গে আর কে ছিল—কপালী বাবা?

—না না না! আমি একা করেছি, কেউ আমার সঙ্গে ছেল না!

—এতবড় শরীরটাকে একলা তুই টেনে এনে পুকুরে ফেললি কি করে?

—কিছু কঠিন হয়নি, সব ব্যবস্থা সাজানো ছেল, আগে শোনো, আর তো তোমার কাছে মিছা বলব না, সব কবুল করে আমি সাজা নেতে এয়েছি, ফাঁসী যেতে হলেও ক'টা দিন বুক ভরে মায়ের পুজো মায়ের গান করতি পাব—যাবজ্জেবন জেল হলে তা পাবই।

এরপর অভিভূত হয়ে ঘটনা শুনলেন দুজনে।

…না রাধা অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শ্রীকান্ত পোদ্দারের কাছে যাবে বলেনি। মেরে ফেললেও বলার কথা নয়। কিন্তু কেউ তাকে দিয়ে আচমকা বলিয়েছে যাবে। রাধা নিজেকে ভস্ম করতে চেয়েছে আর যে বলিয়েছে তাকেও।…মনোহর তখন বেহুঁশ ঘুমে। ঝড় জল মাথায় করে রাধা পিছনের জংলা পথে কপালী বাবার ডেরায় জংলি কালীর কাছে এসেছে। ভেজা জামা-কাপড় বদলে মায়ের কাছে বসেছে। আর অসহ্য যন্ত্রণায় পাগলের মতো জানতে চেয়েছে মা কেন ওর মুখ দিয়ে যাবে বলালো।

হঠাৎ ঝিমুনি এসে গেছল। শুয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ জানে না, রাত কত জানে না। ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে বসেছে।…তাকে যেতে হবে। নিয়ে যেতে ভোর-ভোর লোক আসবে। ও বলেছে যাবো। তখনো

প্রবল বৃষ্টি। কপালী বাবা দাওয়ায় ঘুমোচ্ছেন। তাঁর মাথার কাছে ছোট মদের বোতল আর গেলাস। তিনি গাঢ় ঘুমে। দড়ি থেকে ভেজা জামা-কাপড় নিয়ে রাধা ঘরে এসে পরে নিল। শুকনো জামা-কাপড় যেখানে থাকে রেখে দিল। মা-কে শেষবারের মতো দেখে নিয়ে নেমে এলো।

...নিজেরই তখন মনে হচ্ছিল, যে-রাধা যন্ত্রণায় পাগল হয়ে ছুটে এসেছিল সেই রাধা ঘরে ফিরছে না। এত বৃষ্টিতে পথ ভাঙতে কষ্ট হচ্ছে না, যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই, কোথায় যেতে হবে জেনেও উদবেগ নেই। এমন হল কি করে, ওই রাক্ষুশী কি তবে ওকে ত্যাগ করল ?

ঘরে ফিরল। হারিকেনটা তেমনি জ্বলছে। ওটা তুলে নিয়ে দাওয়ায় এলো। মনোহর পাইক তখন উঠোনমুখে হয়ে ঘাড় ঝুলিয়ে ঘুমোচ্ছে। তারপরেই কি হল জানে না। ভিতর থেকে কেউ যেন ওকে বলে দিল কি করতে হবে। ও মায়ের মেয়ে, লম্পট ছিনাথ পোদ্দারের কাছে যাবে এ কখনো হতে পারে ? হারিকেন হাতে দাওয়ার এদিক ওদিক দেখল। কি খুঁজছে জানে না। চেলা কাঠের ওপর কুড়ুলটা চোখে পড়ল। ওটা নিয়ে ঘরের চৌকাঠের এ-ধারে দুই হাঁটুর ওপর বসল।

ক'বার কুড়ুল চালিয়েছে, রাধা জানে না। হারিকেন তুলে এগিয়ে এসে দেখল, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। হাতের কুড়ুল ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দিল। তোড়ের বৃষ্টিতে রক্তের দাগ থাকবে না। লণ্ঠন নিয়ে ঘরে এসে পরনের ভেজা জামা-কাপড় দেখে নিল। না, কুড়ুল বলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটেনি বা ওর জামা কাপড়ে লাগেনি।

এখন কি করতে হবে সেটা খুব সহজে মনে এসে গেল। পিছনের চালাঘরে এসে দু-চাকার ঠেলাটা টেনে এনে দাওয়ায় লাগিয়ে দিল। ঘরে এসে পরনের জবজবে ভেজা জামা-কাপড় খুলে ফেলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হল। খুব সহজে ঠেলে ঠেলে নিথর রক্তাক্ত দেহটা ঠেলার ওপর ফেলল। অনায়াসে দেহসুদ্ধু ঠেলাটা টেনে এনে পুকুর ধারে এলো। তারপর ঠেলার পিছন দিকটা উঁচিয়ে তুলতে দেহটা আপনি পুকুরে পড়ল। রাধা ঠেলা নিয়ে আবার উঠোনে ফিরল। ঠেলা রক্তে মাখা-

মাখি, কিন্তু এই মুষল বৃষ্টিতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধুয়ে যাবে, আর চাকার দাগের চিহ্নও থাকবে না। হারিকেন হাতে দাওয়াটা খুব ভালো করে দেখল। জায়গায় জায়গায় রক্ত থুবড়ে আছে। এক বালতি জল আর শলা ঝাঁটা নিয়ে এলো। মাটির দাওয়া দু' মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার, আর উঠোনে তো বৃষ্টির জলের স্রোত। তবু ঘর থেকে মনোহরের টর্চ এনে আর এক দফা ভালো করে দেখে নিল। রক্তের চিহ্নমাত্র নেই, ঠেলাটাও পরিষ্কার। টর্চ রেখে ঠেলাটা আবার চালার নিচে রাখল। জলে ভেজা, চাকায়ও কাদা মাটি লেগে আছে। একটা ছালা এনে আগে ওপরটা পরে চাকা দুটো ভালো করে ঘসে ঘসে মুছল। হারিকেনের আলোয় দেখল। এতেই হবে।

ঘরে এসে ওই ভেজা জামা-কাপড় পরে নিয়ে হারিকেনের আলো কমিয়ে ঘরের কোণে রেখে রাধা আবার জংলা পথে মায়ের কাছে ফিরে চলল। সব মিলিয়ে এক ঘণ্টারও সময় লাগেনি বোধহয়।

কপালী বাবা তেমনি ঘুমোচ্ছেন। অন্য কোণে বিলাসী। এবার জবজবে ভেজা কাপড়েই ঘরে ঢুকতে হল। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে মনে হল মা হাসছেন। শুকনো জামা-কাপড় পরে ভেজাগুলো নিঙরে আবার দাওয়ার দড়িতে যেমন ছিল তেমন মেলে দিল। ন্যাতা দিয়ে ঘরটা মুছে শুয়ে পড়ামাত্র আর জ্ঞান নেই।

অংশুমান পাথরের মতো মুখ করে ঘরে পায়চারি করছেন। সুচারু দেবী নিস্পন্দের মতো বসে। রাধা আকুল হয়ে বলল, আর কিছু ভেবনি বড়বাবু, তুমি আমার শাস্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে দয়া করে আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে বাঁচাও—আমাকে মুক্ত করো।

অংশুমান সামনে এসে দাঁড়ালেন।—এ ব্যাপারটা তুই আর কাউকে বলেছিস—কপালী বাবাকে বলেছিস?

—বাবাকেই শুধু বলেছি, কিন্তু সে-তো আর কবুল করা হল না, হলে আমার এই দুর্দশা হবে কেন! বাবা তো মেয়ের সব দোষ চাপা দিয়ে মেয়েকে আগলাবেই।

—তুই আমার কাছে এসেছিস তিনি জানেন?

—জানলে মুখ হাত-পা বেঁধে আমাকে ফেলে রাখত, এমনিতেই তরাসে আছে।

—তোর ভিতর যে এত যন্ত্রণা দিচ্ছে সে তোকে শাস্তি নিতে বলছে না, কবুল করতে বলছে ?

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো একটু।—একই কথা হল···কবুল করতেই বলছে।

—বেশ। কবুল করা হয়ে গেছে। এরপর সব ভাবনা আমার। কিন্তু এ কথা যদি আর তুই কোনো লোককে বলেছিস তাহলে আমিই তোর সব থেকে বড় শত্রু হব মনে রাখিস। তোর কি হবে জানি না। কিন্তু তোর সঙ্গে কপালী বাবাকেও আমি আসামী সাজিয়ে ফাঁসীতে ঝোলাবই !

রাধা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। —এ কি বলছ বড়বাবু, বাবা তো ফুলের মতো নিষ্পাপ !

—ওসব আমি জানি না, তুইও ফুলের মতো নিষ্পাপ। যা হয়েছে তা আর ভবিষ্যতে কেউ কোনদিন জানবে না। তোর কবুল করার কথা, কবুল করা হয়েছে, এখন ছাখ তোর পুজো আর গান হয় কিনা।

একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে দিয়ে জিপে করে ওকে কপালী বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু অংশুমান বা তাঁর স্ত্রী কেউই নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন নি। পরের সন্ধ্যায় জিপে দুজনেই কপালী বাবার ডেরার দিকে রওনা হয়েছেন। পৌঁছুতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। একটু দূরে থেকে রাধার খুব পরিচিত গলার গান কানে এলো। নিঃশব্দে তাঁরা দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালেন। কপালী বাবা হাত তালি দিয়ে দিয়ে তাল রাখছেন, রাধা ঠিক আগের মতোই দু'চোখ বুজে ভাবে বিভোর হয়ে দুলে দুলে গাইছে।

'কালী-নামের গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে।
শোন্ রে শমন তোরে কই

আমি তো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে ?
এ-তো ছেলের হাতের মোয়া নয় যে,
খাবি হুমকি দিয়ে।
বলবি সাজা পাবি
মা-কে দিব কয়ে,
সে-যে কৃতান্তদলনী শ্যামা বড় ক্ষ্যাপা মেয়ে।

সুচারু দেবীর দুই গাল বেয়ে ধারা নেমেছে। অংশুমানের চোখও শুকনো নয়।

আরো মাস দুই বাদে অংশুমানের প্রমোশনসহ বদলির হুকুম এসেছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই এখন এজন্যেই আবার খুব মন খারাপ। বাকি দিনগুলো এখানে এভাবে কেটে গেলেই যেন বড় সুখের হত। সুচারু দেবী স্বামীর আসকারা পেয়ে রাধাকে জোর করেই কোয়ারর্টারসএ ধরে নিয়ে আসেন, তিন-চার দিনও আটকে রাখেন। কপালী বাবা একটুও আপত্তি করেন না। তিনি আবার একটা মজার গান বেঁধেছেন, মোটা ভাঙা-ভাঙা গলায় বাউল সুরে সকলকে সে গান শোনান। এরা স্বামী-স্ত্রীও তাঁর ওখানে গিয়ে চেলাদের সঙ্গে বসে এ গান শুনেছেন।

ওরে ও মাতনের মানুষ—
রাধার বুকে কতই তোরা
ভক্তি দেখলি পুজা দেখলি
মায়ের সঙ্গে লড়াই দেখলি না।

ওরে ও মাতনের মানুষ—
রাধার চোখে কতই তোরা

প্রেম দেখলি জল দেখলি
রাধার চোখে আগুন দেখলি না।

শুনে সকলে না বুঝেও হাসে। অংশুমান হাসেন সুচারু দেবী হাসেন। গম্ভীর হতে গিয়ে রাধাও এক-একসময় হেসেই ফেলে। কখনো দু'হাত জোড় করে বাবাকে নিষেধ করে মিনতি জানায়।

না, সে-লড়াই আমি দেখিনি। সেই আগুনও না। কিন্তু সেদিন অংশুমানের ঘরে বসে রাধার কালো টানা চোখে কয়েক পলকের জন্য আগুন আমি দেখেছি।···দেওয়ালে টাঙানো মায়ের বড় ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ধীর টনটনে গলায় বলেছিল, আমিও দেখব তোর মুরোদ কত, হেরে হাসিস না জিতে কাঁদিস!

এই লড়াই বা তার হার-জিত হাসি-কান্না আমার কাছে দূরের জিনিস। এ-পথের কথা শোনা আছে, জানা নেই। এখনো লড়াইয়ের হাতিয়ার তো দেখছি বিজ্ঞানের ওষুধ। রাধার নিজস্ব লড়াই বা তার চোখের আগুনের দাম কি, অংশুমান ঘোষের রোগের ভবিষ্যৎ কি, আমি জানি না। কিন্তু মন আশার দরিয়ায় সাঁতার কাটছে। আশা করতে বড় ভালো লাগছে।